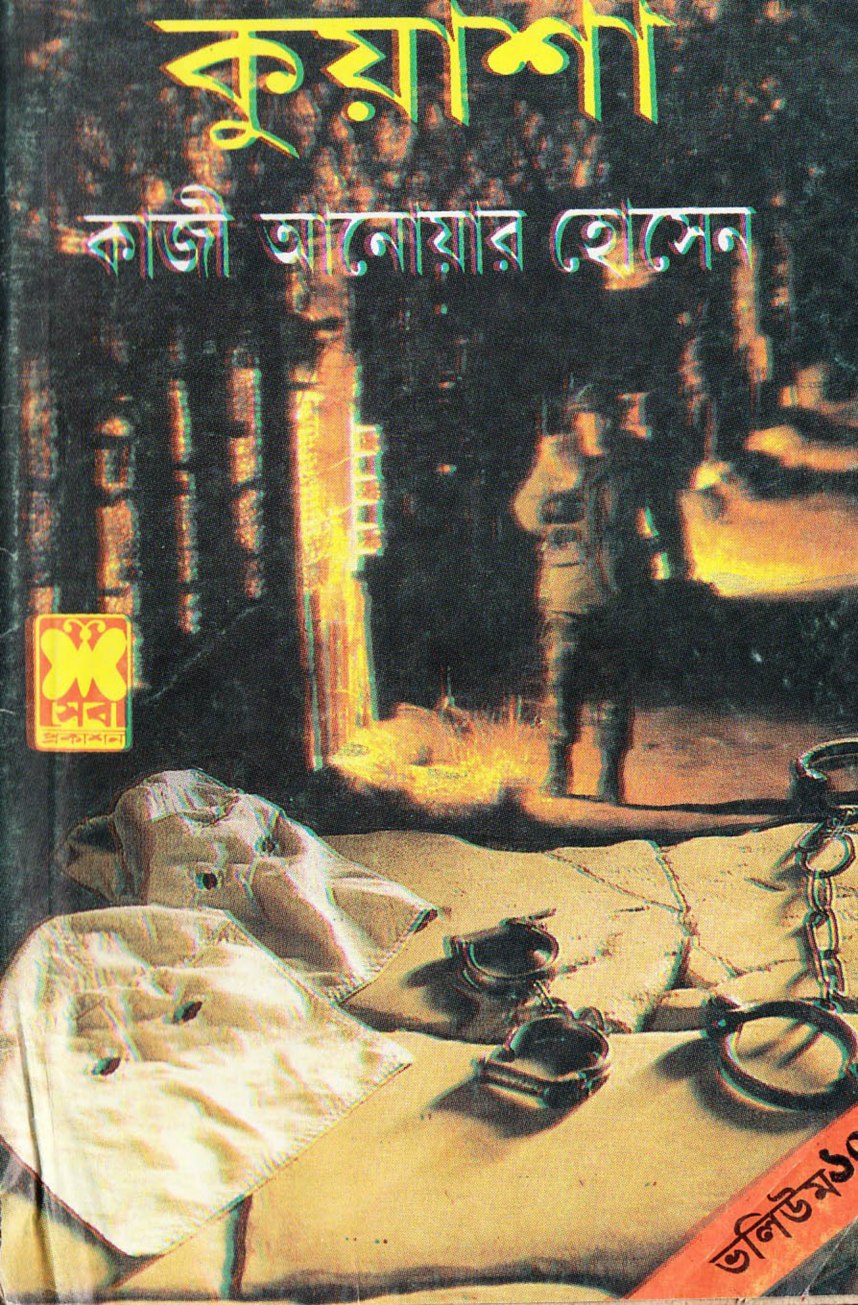
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ভলিউম ১০

ISBN 984-16-1100-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শরাফত খান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 10
KUASHA SERIES: 28, 29, 30
By: Qazi Anwar Husain

সাতাশ টাকা

সূচী

কুয়াশা ২৮ —— ৫
কুয়াশা ২৯ —— ৬০
কুয়াশা ৩০ —— ১২১

কুয়াশা ২৮

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৭০

এক

তখনও সূর্যোদয় হয়নি। পুব-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েনি উষার রক্তরাগ। তবু ভারত মহাসাগরের বুকের উপর থেকে কুটিল অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হবে আকাশ-বাতাস-সমুদ্র।

বছরের এই সময়টায় বড় একটা কুয়াশা জমে না ভারত মহাসাগরে। আজকেও কুয়াশার লেশমাত্র কোথাও ছিল না। সারারাত সামুদ্রিক হাওয়ায় মাতামাতির পর সমুদ্র এখন শান্ত। যেন তন্দ্রা নেমেছে সমুদ্রের বিশাল নীল চোখে।

একটি পাকিস্তানী পণ্যবাহী জাহাজ পুব-উত্তরদিকে ছুটে চলেছে শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে। জাহাজটার নাম এস. এস. তিতাসা। সিডনী থেকে গম নিয়ে আসছে। লক্ষ্য তার চট্টগ্রাম বন্দর। দিন পনেরো আগে সিডনী ত্যাগ করেছে তিতাসা। অন্তত আরও বারোদিন লাগবে চট্টগ্রাম পৌঁছুতে।

ঘুমজড়িত চোখে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়েছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন হাফিজ। চারদিকে একবার চোখ বুলাল সে। কাছে-পিঠে দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোন জাহাজ চোখে পড়ল না।

ব্রিজ ছেড়ে এসে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। দুচোখ বেয়ে ঘুম নামছে তার। সারারাত ডিউটি দিয়েছে। রিলিভার সেকেণ্ড অফিসার রসুলের ডিউটিতে আসতে আরও ঘন্টাখানেক বাকি।

একটা সিগারেট ধরাল ক্যাপ্টেন। কিন্তু দু'একটা টান দিয়েই সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। ঢেউ-এর আর্বতে হারিয়ে গেল সিগারেটের টুকরোটা মুহূর্তের মধ্যে।

মুখের ভিতরটা তেতো লাগছিল ক্যাপ্টেনের। লাগবারই কথা, সারারাত ধরে শুধু একটার পর একটা সিগারেটই টেনেছে সে। মদ্যপানের অভ্যাস তার কখনও ছিল না, তবে চা আর সিগারেট খায় প্রচুর।

সমুদ্রের দিকে আনমনে তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন হাফিজ। আদিগন্ত শুধু জল আর জল। মেজাজ ভাল থাকলে সে এতক্ষণ উর্বশী আবৃত্তি করত।

পদশব্দে পিছনে ফিরে তাকাল ক্যাপ্টেন। হাসিভরা মুখে থার্ড অফিসার গোলাম মৃধা এসে দাঁড়িয়েছে। খুব ভোরে ওঠা ওর অভ্যাস। তাছাড়া একটু পরেই ডিউটি আওয়ার শুরু হবে। একেবারে ধড়াচূড়া পরেই এসেছে।

'হ্যালো মৃধা,' বলল ক্যাপ্টেন হাফিজ।

'হ্যালো বস্। কি ভাবছ? ভাবির কথা বুঝি? হোম সুইট হোম! সত্যি ক্যাপ্টেন, পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। সেই কবে সিডনী ছেড়েছি আর কবে যে চিটাগাং পৌঁছুব।' একটু করুণ হয়ে এল মৃধার কণ্ঠ।

মৃধা সদ্য বিয়ে করেছে। তার ব্যথা অনুভব করতে পারল ক্যাপ্টেন হাফিজ। কিন্তু খোঁচা না দিয়ে ছাড়ল না। সে ঠাট্টা করে বলল, 'তাইত কবি বলেছেন—'

'রেখেছ স্বামীজী করে নাবিক করনি।'

'তোমাদের মত সদ্য বিবাহিত তরুণদের নিয়েই তো সমস্যা। গিন্নীরাও ছাড়তে চায় না, আর তোমাদের তো কথাই নেই। সামুদ্রিক বাতাসের মতই বুকটা তোমাদের শুধু হু-হু করে সর্বক্ষণ। অথচ আমাদের মত সিজন্ড্ সামুদ্রিক প্রাণী···।'

লজ্জা পেল মৃধা। কিন্তু ক্যাপ্টেন হাফিজকে শেষ করতে দিল না কথাটা। সে বলল, 'ইশ, তুমি ভারি বুড়িয়ে গেছ, না? ক'বছর বড় হবে তুমি আমার চাইতে? বড়জোর দুবছর।'

'তা যত দিনেরই বড় হই, আমার আবার চাইল্ডম্যারেজ কিনা। তাই তো বুড়িয়ে গেছি ভাই, অন্তত সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা আর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে। এই দেখ না, তোমার ভাবি তো আমাকে বুড়ো মিয়া বলে ডাকে।'

হো-হো করে হেসে উঠল থার্ড অফিসার।

'হাসছ কেন? অ্যাঁ। এই দুষ্টু ছেলে।'

মৃধা হাসি থামিয়ে বলল, 'অথচ জান, রিটা মানে সিডনীর সেই মেয়েটা সেইলার্স ক্লাবে তোমাকে দেখে বলেছিল, ডোন্ট সে দ্যাট কিড ইজ দ্য স্কিপার অফ ইওর ক্রুজার।'

শঙ্কিত হল ক্যাপ্টেন। একবার যখন রিটার নামটা উচ্চারিত হয়েছে তখন শ্রীমান মৃধা আলোচনাটাকে যে-কোন্ খাতে বইয়ে নেবে সে সম্পর্কে স্পষ্টই ধারণা আছে তার। সুতরাং আলোচনার ধারা পাল্টাবার জন্যে বলল, 'তোমার ডিউটি কি শুরু হল?'

ঘড়ি দেখে মৃধা বলল, 'হ্যাঁ, মিনিট পনেরো পরে শুরু হবে। কেন, তুমি যেতে চাইছ? তা যাও না। আমি ম্যানেজ করতে পারব। রসুল তো আসছেই। বোসান দীপেন বড়ুয়া আছে। যাও তুমি। রিয়েলী, ইউ আর লুকিং ভেরি টায়ারড।'

ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি চললাম। নো স্পেশ্যাল ইনস্ট্রাকশন। সো লং।'

পা বাড়াল ক্যাপ্টেন প্যাসেজের দিকে।

মৃধা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। ক্যাপ্টেন হাফিজ থেমে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

মৃধা আঙুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখাল। তার মুখটা ফ্যাকাসে। ঠোঁট দুটো

কাঁপছে।

'ওটা কি?' উচ্চারণ করল মৃধা।

ক্যাপ্টেন হাফিজও তাকাল সমুদ্রের দিকে এবং বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল।

দূরত্বটা ঠিক অনুমান করা গেল না। দূর সমুদ্র থেকে বিরাট একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশ পাক খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। দেখতে অনেকটা কুয়াশার মতই। কিন্তু কুয়াশা অমন করে পাক খেতে খেতে এগোয় না। সামুদ্রিক ঝড় পাক খেতে খেতে এগিয়ে যায় কিন্তু সেটা খালি চোখে ধরা পড়ে না।

'সর্বনাশ!' ক্যাপ্টেন হাফিজের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ পরে মাত্র একটা শব্দই নির্গত হল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই সংবিৎ ফিরে পেল সে। বুকে ঝোলানো দূরবিনটা তুলে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটার দিকে দেখল সে। তারপর বলল, 'এটা তো কুয়াশাও নয় ঝড়ও নয়!'

'তাহলে কি?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। রাডাররূমে ফোন কর, ওখানে কিছু ধরা পড়েছে কিনা। কুইক।'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।'

রিসিভার তুলল সে ব্রিজে গিয়ে।

'হ্যালো, রাডাররূম? দিস ইজ মৃধা।'

'বলুন?'

'পুবদিকে কুয়াশার মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে ক্রমশ আমাদের পথের দিকে। দেখতে পাচ্ছেন?'

'দেখেছি, স্যার। অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। জাহাজের স্পীড কমাতে হবে, স্যার। একেবারে অর্ধেক পর্যন্ত নামাতে হবে। তাহলে ওটা আমাদের আগেই পথ থেকে সরে যাবে।'

'ঠিক তো?'

'জ্বি, স্যার।'

'কিন্তু কি ওটা?'

'ঠিক বলতে পারছিনে। কুয়াশাও হতে পারে। তবে মনে হচ্ছে, কাছে-পিঠে কোন আইল্যাণ্ডে আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তারই ধোঁয়া আসছে।'

'কিন্তু কাছে তো কোন আইল্যাণ্ড নেই! সবচেয়ে কাছের আইল্যাণ্ড তো ম্যাকি। সে তো প্রায় একশ' মাইল দূরে। তাছাড়া ধোঁয়া এভাবে দিগন্তের দিকে আসবে কেন? উপরের দিকে যাবে।'

'তাই তো, স্যার। তাহলে কাছেই হয়ত সমুদ্রতলে কোথাও ভূমিকম্প হয়েছে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার হচ্ছে।'

'তা হতে পারে। স্যার, জাহাজের গতি কমিয়ে দিতে বলুন। জলদি, স্যার।'

'দিচ্ছি। আপনিও লক্ষ্য রাখবেন।' রিসিভার নামিয়ে রাখল মৃধা।

ক্যাপ্টেন হাফিজ এতক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে মৃধার ফোন শেষ করার অপেক্ষা করছিল।

তাকে রাডার অফিসারের মন্তব্য জানাল মৃধা।

ক্যাপ্টেন হাফিজ সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনরুমকে স্পীড কমাবার নির্দেশ জারি করল। কিন্তু স্পীড কমানোটা ভাল হল কিনা সে সম্পর্কে তার মনে খটকা রয়ে গেল এবং কাজটা যে ভুল হয়েছিল তা পরে সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। রাডার অফিসার সোবহানও পরে তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে বিবেকের দংশন ভোগ করেছে।

ক্যাপ্টেন হাফিজের ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেকেণ্ড অফিসার রসুল আমিন ততক্ষণে এসে গেছে। কিন্তু এই অবস্থায় ক্যাপ্টেন হাফিজ ব্রিজ ছেড়ে যাওয়া সমীচীন বিবেচনা করল না। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে লক্ষ্য রেখে রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইল সে। সেকেণ্ড অফিসার রইল ব্রিজে।

সিগারেট ধরিয়ে পাচয়ারি করতে লাগল মৃধা।

কুয়াশার বা ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল এবং ক্রমেই তা জাহাজটার দিকে এগিয়ে আসছিল।

আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ সেটা যেন ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল। বাতাসে কেমন যেন একটা দম আটকানো ভাব। কেমন যেন পোড়া পোড়া একটা গন্ধ। কাঁদুনে গ্যাস ফাটলে যে রকম গন্ধ বেরোয় অনেকটা সেই রকম গন্ধ।

আর দু'তিন মিনিট পরেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা জাহাজটাকে ঘিরে ধরবে। অস্থির হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন হাফিজ। এই মুহূর্তে ডিসিশন নিতে হবে। তার সিদ্ধান্তের উপর জাহাজের এতগুলো প্রাণীর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিটাও তো নতুন। বারো বছরের সামুদ্রিক জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি সে কোনদিন।

ব্রিজ থেকে সেকেণ্ড অফিসার রসুল বলল, 'ক্যাপ্টেন, উই আর ইন গ্রেড ডেঞ্জার।'

'ইয়েস, বাট···। রসুল, এঞ্জিনরুমকে নির্দেশ দাও ইমার্জেন্সি স্পীড দেবার জন্যে। কুইক।'

পাশেই বোসান দীপেন বড়ুয়া দাঁড়িয়েছিল। সে ক্যাপ্টেনের নির্দেশ নিয়ে ছুটে চলল এঞ্জিনরুমে।

'মৃধা, ফোনে রেডিও-রুমকে বল এস. ও. এস. পাঠাতে।'

মৃধা, ফোনে রেডিও-রুমকে নির্দেশ দিল।

এস. এস. তিতাসার ডিউটিরত কর্মচারী ছাড়া সকলেই তখন এসে দাঁড়িয়েছে ব্রিজের কাছে।

সকলেরই চেহারায় ভয়ের ছায়া পড়েছে। ধোঁয়ার দানবটা মৃত্যুর মত নির্ভুল

বাহু মেলে জাহাজটাকে অক্টোপাশের মত গ্রাস করতে আসছে। অনেকে ভয়ে কাঁপছে। শুধু ওদিকের তিনজন খালাসি সব বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করে ফজরের নামাজ পড়ছে। তাদের তিনজনকে দেখে ক্যাপ্টেন হাফিজ যেন শক্তি ফিরে পেল।

সে ধীরে ধীরে বলল, 'লাইফ-বোটগুলো খুলে ফেল।'

একজন নাবিক হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'আঁই আর বুঝি বাঁইচলাম না। গজব আসি পইছ্ছে।'

সত্যি গজব এসে পড়েছে। লাইফ-বোটগুলো নামানোর সময় পাওয়া গেল না। কুয়াশার কুণ্ডলীটা জাহাজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। খুকখুক করে কাশছে সবাই। শ্বাস নিতে পারছে না কেউ। বিষাক্ত গ্যাস নাকে ঢুকছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

নামাজীদের একজন সেজদা থেকে আর উঠতে পারল না। দুজন কষ্টে সৃষ্টে উঠল। কিন্তু বুক চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

সারেং মালে মোহাম্মদ চোখ-মুখ উল্টে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন হাফিজের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু দম বন্ধ করে সে এগিয়ে গেল ওদের সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু দু'পায়ের বেশি এগোতে পারল না। মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল সে-ও।

মৃধা টলতে টলতে বলল, 'রসুল ভাই, গ্যাস…উহ্, বুকের ভিতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে!'

কিন্তু রসুল তার কথা শুনতে পেল না। সে তখন বুক চেপে ধরে ছটফট করছে।

কিছুক্ষণ পরেই এস. এস. তিতাসার প্রত্যেকটি আরোহী চেতনা হারাল। রেডিও অপারেটর ইসহাক মোল্লা অর্ধসমাপ্ত এস. ও. এস., পাঠিয়ে লুটিয়ে পড়ল রুমের মেঝেতে।

চট্টগ্রাম বন্দরের রেডিও-রুমের অপারেটর দাদ্ আলী চমকে উঠল। হেডফোন খুলে রেখে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার সরিয়ে পাশের রুমে এস. ও. এস. অফিসার আতাউল্লাহর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আতাউল্লাহ মুখ তুলতেই সে বলল, 'এস. ও. এস., স্যার।'

'এস. ও. এস.!' চমকে উঠল আতাউল্লাহ।

'হ্যাঁ, স্যার। এস. এস. তিতাসা থেকে এসেছে। ল্যাটিচ্যুড-লংগিচ্যুড দিয়ে শুধু বিপদটুকুই কোনরকমে উচ্চারণ করতে পেরেছে।'

'লিখে নিয়েছেন, ল্যাটিচ্যুড লংগিচ্যুড?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

আর কোন কথা না বলে আতাউল্লাহ রিসিভার তুলল। ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল।

'এয়ারপোর্ট এক্সচেঞ্জ?'

ইয়েস।'

'পুট মি টু এস. ও. এস. রুম প্লীজ। কুইক।'

এস. ও. এস. রুমের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হতেই খবরটা জানাল আতাউল্লাহ। শেষটায় যোগ দিল, 'আপনারা কি কোন সাহায্য করতে পারবেন?'

'অবশ্যই। আমাদের ইমার্জেন্সি হেলিকপ্টার রেডি আছে! মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রওনা দেবে। আমরাও পেয়েছি এস. ও. এস.।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল আতাউল্লাহ। তারপর অপারেটরকে বলল, 'আপনি যান, অন্য কোন মেসেজ আসে কিনা আমাকে জানান।'

বেরিয়ে গেল রেডিও অপারেটর।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফোন করল এয়ারপোর্ট এস. ও. এস. রুমে। সেখান থেকে জানানো হল, হেলিকপ্টার ইতিমধ্যেই রওয়ানা দিয়েছে।

একটু পরেই রেডিও অপারেটর আতাউল্লাহর রুমে ঢুকে বলল, 'আরও একটা মেসেজ এসেছে স্যার, এস.এস. অলরা নামের একটা জাহাজ থেকে। তারা বলছে, তারা এস. এস. তিতাসার এস. ও. এস. পেয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজটা নাকি তিতাসার দশ মাইলের মধ্যেই ছিল।'

আতাউল্লাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাল হল, তার মানে, ওরা হেলিকপ্টারের আগেই পৌঁছুবে।'

দুই

পাশে রাখা একটা মানচিত্রের দিকে বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম।

পাশে উপবিষ্ট ক্রু সাহেব আলী বলল, 'ফোর্স আমাদের ঠিকই আছে, ক্যাপ্টেন। তবে এস. ও. এস. পজিশনে পৌঁছুতে আমাদের কম করেও দু'ঘন্টা লাগবে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ততক্ষণে কি হয়, কে জানে,' ক্যাপ্টেন মন্তব্য করল।

সাহেব আলী কোন উত্তর দিল না। দেবার কিছু ছিলও না।

হেলিকপ্টার তখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে চলছে। নিচের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম। নিচে অথৈ নীল দরিয়া।

ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম বলল, 'মেসেজ একটা পাঠিয়ে দাও। দেখ, কোন জবাব আসে কিনা।'

ইয়ারফোন অ্যাডজাস্ট করে নব টিপল ক্রু সাহেব আলী।

'রেসকিউ হেলিকপ্টার পি-৩৪৩। রেসকিউ হেলিকপ্টার পি-২৪৩। হ্যালো

এস. এস. তিতাসা। হ্যালো এস. এস. তিতাসা।'

'হ্যালো রেসকিউ হেলিকপ্টার পি-৩৪৩। এ. এস. অলরা ফিলিপিনো লাইনার থেকে বলছি। আমরা এস. ও. এস. পজিশন থেকে বলছি। আবার বলছি। এস. এস. অলরা ফিলিপিনো লাইনার থেকে বলছি। আমরা এস. ও. এস. পজিশন থেকে বলছি। এস. এস. তিতাসা পাকিস্তানী ক্ল্যানশিপের এস. ও. এস. পেয়ে আমরা এসেছিলাম। কিন্তু জাহাজটার কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না।'

'কোন চিহ্ন পাচ্ছেন না!' বিস্ময় প্রকাশ করল সাহেব আলী।

'না।'

'সন্ধান চালিয়ে যান।'

'চালাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

সাহেব আলী নব অফ করে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছিনে, এস. এস. তিতাসার নাকি কোন পাত্তাই নেই। ফিলিপিনো লাইনার অলরা এস. ও. এস. মেসেজ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। সার্চ করছে ওরা।'

'সে কি!' বিস্ময় প্রকাশ করল ক্যাপ্টেন, 'ঝড় নেই, কোন গোলযোগ নেই। অথচ জাহাজটার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এ তো বড় আজব ব্যাপার! অলরাকে বল সার্চ চালিয়ে যেতে।'

'বলেছি।'

আরও একঘন্টা পরে রেসকিউ হেলিকপ্টার এস. ও. এস. পজিশনে পৌঁছুল।

উদ্বিগ্ন সাহেব আলী ও ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম দুজনই দেখল, মহাসাগরের বুকে দুটো নয় মাত্র একটা জাহাজ ভাসছে।

ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে দেখল জাহাজটার গায়ে লেখা আছে 'এস. এস. অলরা'। ফিলিপাইনের একটা পতাকা উড়ছে সামুদ্রিক হাওয়ায়।

জাহাজটার খুব কাছে চলে গেল ক্যাপ্টেন তার রেসকিউ হেলিকপ্টার নিয়ে।

তার চোখে পড়ল অলরার ব্রিজ থেকে সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে। সে ক্রুকে বলল, 'অলরা কি যেন বলতে চাইছে। কনট্যাক্ট কর।'

কনট্যাক্ট করল সাহেব আলী।

অলরা বলল, 'দেড়ঘন্টা ধরে আমরা তিতাসার খোঁজ করে ব্যর্থ হয়েছি। তিতাসার কোন চিহ্নই নেই। এতটুকু ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত কোথাও আমরা দেখতে পাইনি। মনে হচ্ছে পুরো জাহাজটাই ডুবে গেছে।'

'কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি! কোন মৃতদেহ বা কাপড়চোপড়, কাঠের টুকরো বা অন্য কিছু?'

'কিচ্ছু না। তিতাসা নামে এখানে যে একটা জাহাজ ছিল তা-ই মনে হয় না।'

ক্রু ক্যাপ্টেন অলরার কথার পুনরাবৃত্তি করল।

অলরা আবার বলল, 'আমরা কি সার্চ চালিয়ে যাব, না নিজেদের পথে চলে যাব?'

ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম সাহেব আলীকে বলল, 'ওদেরকে যেতে বল। আমরা কিছুক্ষণ বরং খোঁজ করে দেখি।'

ক্যাপ্টেন তার হেলিকপ্টারটা অনেকটা নিচে নামিয়ে এনে ক্রুকে বলল, 'দেখ কোন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় কিনা।'

একটু পরেই অলরায় গতি সঞ্চারিত হল।

আরও ঘন্টাখানেক ব্যর্থ অনুসন্ধান চালিয়ে ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ও সাহেব আলী ফিরে এল।

চব্বিশ ঘন্টা পরে।

মি. সিম্পসন জরুরি তাগাদা দিয়ে ফোন করল শহীদকে।

শহীদ বলল, 'কি ব্যাপার, মি. সিম্পসন?'

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার! জলদি চলে এস।'

'কি, শুনিই না হয় একটু।'

'আরে না, এখুনি চলে এস। এলেই জানতে পারবে।'

'আচ্ছা, আসছি।' রিসিভার রেখে দিল শহীদ।

কামাল সোফায় বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছিল আর দূরালাপনির একপ্রান্তের আলাপ শুনছিল। সে প্রশ্ন করল, 'কি হল আবার মি. সিম্পসনের?'

'কি জানি, বললেন না তো। শুধু তাঁর অফিসে যাবার জন্যে তাড়া দিলেন।'

'এখুনি যাবি?'

'হ্যাঁ। কাপড়টা পাল্টে আসছি। তুই যাবি?'

'চল। মি. সিম্পসন যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তখন কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।'

মিনিট বিশেক পরে শহীদের গাড়ি মি, সিম্পসনের অফিসের সামনে থামল। শহীদ গাড়ি থেকে নেমেই থমকে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি সামনের গাড়িগুলোর দিকে।

কামাল বলল, 'থমকে দাঁড়ালি যে বড়?'

'দেখেছিস গাড়িগুলো? দুটো আম্পালা। একটা বেন্টলি আর দ্যাখ একটা জোডিয়াক। যেন গাড়ি-নক্ষত্রের মেলা বসেছে মি. সিম্পসনের অফিসের সামনে। নিশ্চয়ই অনেক রথী-মহারথী ভদ্রলোককে ঘিরে রয়েছেন।'

'হুঁ। তা এসব সপ্তরথীদের ভিড় ঠেলে পৌঁছুতে পারবি তো মি. সিম্পসনের কাছে?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে, সপ্তরথীদের প্রয়োজনেই ডাকা হয়েছে আমাকে।'

'বেশ তো, বাছা। ওই আনন্দেই এগিয়ে যাও। গাড়ি তো দেখলি, তবু দাঁড়িয়ে আছিস কেন হাঁ করে?'

'হ্যাঁ, চল।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শহীদ বলল, 'কামাল, সামনের আম্পালায় কালো ষণ্ডামার্কা এক ড্রাইভার বসে আছে। তুই মি. সিম্পসনের রূমের ভিতরে না ঢুকে দোতলার বারান্দায় গিয়ে লোকটার চেহারাটা ভাল করে দেখবি। তারপর বেরিয়ে গাড়িটা নিয়ে চলে যাবি। আমি ফেরার পথে সপ্তরথীদেরই কারও ঘাড়ে সওয়ার হব।'

কামাল বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওরকম ষণ্ডাকিসিম লোক তো ডজন ডজন আছে। তাহলে দেখছি সবগুলোর পেছনেই লাগতে হবে।'

'দরকার হলে লাগতে হবে বৈকি? শোন, লোকটা আমাদের দু'জনকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে।'

'আচ্ছা। তাই হবে।'

একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে সালাম ঠুকে বলল, 'মি. সিম্পসন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, শহীদ সাহেব।'

'ওখানে আর কেউ আছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার, পাঁচ-ছয়জন ভদ্রলোক আছেন। তাঁরাও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'চল, যাচ্ছি।'

কনস্টেবলটার পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল শহীদ। কামাল চলে গেল সিঁড়ির দিকে।

দোতলার বারান্দার জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকাল কামাল। সামনের আম্পালার বাইরে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা দু'জন সোফার সিগারেট খেতে খেতে গল্প করছিল। তাদের একজন শহীদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল। লোকটা লম্বা-চওড়া, নিকষকালো। ক্রু-কাট চুল। কপালটা চওড়া। নাকটা থ্যাবড়া। উঁচু চোয়াল। সব মিলিয়ে একটা হিংস্র চেহারা। কামালের মনে হল, তার মত তিনটে লোককে একত্রে ঘায়েল করার মত শক্তি আছে লোকটার দেহে। যে সোফারটার সঙ্গে সে গল্প করছিল তাকে ওই দৈত্যটার তুলনায় বামুন বলে মনে হচ্ছিল।

জানালার কাছ থেকে সরে এল কামাল। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আড়চোখে সে দেখল, ষণ্ডাকার সোফারটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

ওদিকে শহীদ মি. সিম্পসনের রূমে ঢুকতেই মি. সিম্পসন তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আরে এস এস। এঁরা সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' তাঁর টেবিলের চারদিকে উপবিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ

করলেন। 'হ্যাঁ, আগে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মি. শহীদ খান। যার কথা আপনাদের বলেছি। আর এঁরা হলেন, মি. খোদাদাদ চৌধুরী, মি. রহিম বখশ, মি. কমরুদ্দিন থানভী, মি. সাজেদুল হক আর মি. বাহরামভাই লাণ্ডিকোটালওয়ালা।'

নিকটবর্তী চারজনের সঙ্গে করমর্দন করল শহীদ। তারপর এগিয়ে গেল মি. বাহরামভাই লাণ্ডিকোটালওয়ালার দিকে। তার পাশের খালি চেয়ারটাই শহীদের লক্ষ্য। অস্বাভাবিক মোটা। বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। শহীদ তাঁর কষ্টকর প্রয়াস দেখে দ্রুত বলল, 'থাক, বসুন আপনি।' তারপর মনে মনে বলল, ভাগ্যিস কামাল ভিতরে ঢোকেনি। সে ভদ্রলোকের নাম আর বপু দেখে নির্ঘাৎ হেসে ফেলত।

তার পাশের চেয়ারটা অধিকার করল শহীদ। সে দেখল, মি. সিম্পসনের অতিথিরা সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

শহীদ বলল, 'কি ব্যাপার, মি. সিম্পসন?'

মি. সিম্পসন কিছু বলার আগেই থানভী সাহেব স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন শহীদের দিকে। শহীদ একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। আড়চোখে সমবেত ভদ্রলোকদের একবার দেখে নিল। সবচাইতে ইম্প্রেসিভ চেহারা হল থানভী সাহেবের। টকটকে ফর্সা রং। চমৎকার স্বাস্থ্য। মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সব মিলিয়ে অভিজাত ও ইনটেলেকচুয়্যাল চেহারা ভদ্রলোকের।

থানভী সাহেব নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'মি. সিম্পসন, প্লীজ স্টার্ট।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'এঁরা হলেন সবাই পাকিস্তান লাইনার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক। গত দশ দিনের মধ্যে এঁদের দুটো জাহাজ অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে গেছে ভারত মহাসাগরে। এঁরা এ ব্যাপারে একটা তদন্ত চালাতে চান। তাই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছেন।'

থানভী সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'আমাদের বন্ধু খোদাদাদ চৌধুরী আর রহিম বখশ সাহেব বললেন, আপনি নাকি খুব উমদা ডিটেকটিভ আছেন। ওনারা তো এখানকার আদমী। আপনাকে আচ্ছা করকে মালুম আছেন। হামি তো কারাচীতে থাকে। তা আপনার উপর ওনাদের বহুত বিশ্বাস আছে। আপনি যদি হামাদের সাহায্য করেন, আপনার ফিস যা হোয় উসকা ডবল দেয়েগা।'

'ব্যাপারটা সবিস্তারে না জেনে তো কিছুই বলতে পারছিনে, থানভী সাহেব।'

'থানভী ভাইয়া, আপনিই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।' বাহরামভাই লাণ্ডিকোটালওয়ালার বিশাল বপু থেকে মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

শহীদ আবার মনে মনে বলল, 'ভাগ্যিস কামাল শেষপর্যন্ত এখানে ঢোকেনি।'

থানভী সাহেব তাঁর সুটকেস থেকে একটা মানচিত্র বের করলেন। শহীদ

দেখল, ওটা ভারত মহাসাগরের মানচিত্র। সেটা সামনে রেখে থানভী সাহেব বললেন, 'গভর্নমেন্ট বন্যা দুর্গতদের জন্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে কিছু গম কিনেছিলেন। দুটো জাহাজে করে তার কিছু ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। জাহাজ দুটোই ছিল পাকিস্তানী। আমাদের লাইনারের জাহাজ। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, দুটো জাহাজই ভারত মহাসাগরে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। কোন চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি। জাহাজ দুটোরও না, আরোহীদেরও না। ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়নি। মৃতদেহও দেখা যায়নি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার!'

'আশ্চর্য হবার ঘটনা তো ঘটেই। অথচ যে দু'দিনে জাহাজ দুটো ডুবেছে তার একদিনও কোন ঝড় হয়নি, কুয়াশা পর্যন্ত ছিল না।'

'কবে ঘটেছে এই ঘটনা?'

'একটা ঘটেছে গতকাল,' মানচিত্রে লালকালি-চিহ্নিত একটা বৃত্ত দেখিয়ে মি. থানভী বললেন। 'এখান থেকে গায়েব হয়েছে গতকাল এস. এস. তিতাসা।'

'কোন এস. ও. এস. পঠিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, একটা অসমাপ্ত এস. ও. এস. পাঠিয়েছিল তিতাসা। এস. এস. সিলেট, মানে আগের জাহাজটাও একটা অসমাপ্ত এস. ও. এস. পাঠিয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই রেসকিউ হেলিকপ্টার গিয়েছিল। কিন্তু কোনটারই সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিতাসার এস. ও. এস. অলরা নামে ফিলিপাইনের একটা লাইনার পেয়েছিল। জাহাজটা কাছেই ছিল। কিন্তু তারাও তল্লাশি করে ব্যর্থ হয়েছে। আবার সিলেটের এস. ও. এস. পেয়েছিল ডায়মণ্ড নেকলেস নামে তাইওয়ানের একটা জাহাজ। তারাও অনেক খোঁজ করেছে। এস. এস. সিলেটের কোন চিহ্নই তারা পায়নি।'

'এস. এস. সিলেটের দুর্ঘটনা ঘটেছে কবে?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'দিন দশেক আগে।'

'একই জায়গায়?'

'না, দুটো ঘটনা ঘটে প্রায় পঁচাত্তর মাইল দূরে। জাহাজ দুটোর গতিপথ আলাদা ছিল,' থানভী সাহেব মানচিত্রে অন্য একটা লালবৃত্ত দেখিয়ে বললেন। 'এস. এস. সিলেট খোয়া গেছে এই জায়গাটাতে।'

'জায়গাটা চট্টগ্রাম থেকে কতদূর?'

'প্রায় দুশো মাইল হবে। দশ নটে যদি জাহাজ এগোয় তাহলেও চট্টগ্রাম পৌঁছুতে পনেরো ঘন্টা লাগবার কথা।'

'কাছে-পিঠে কোন দ্বীপ আছে?'

'প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে ম্যাকি নামে ছোট একটা দ্বীপ আছে। দুর্গম পাহাড়ী দ্বীপ। এই যে দেখুন। পাঁচ বর্গমাইল হবে বড়জোর দ্বীপটা।' মানচিত্রে দ্বীপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন থানভী সাহেব।

'জাহাজ দুটো কি কারণে গায়েব হল সেটাই আপনারা জানতে চান। প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ে অথবা মানুষের সৃষ্ট কোন বিপর্যয়ে এটা ঘটেছে কিনা তাই তো আপনারা জানতে চাইছেন?'

রহিম বখশ ঢাকার লোক। সে বলল, 'হাঁচা, ছহীদ ছায়েব। এর লাইগ্যাই আপনারে কই আপনে একটু দেহেন ব্যাপারটা কি। টাকার কথা ভাইবেন না। আপনার ছরীল সোনা দিয়া বাইন্দা দিমু।'

শহীদ বলল, 'না, টাকার কথা ভাবছি না। কিভাবে এগুনো যায় তাই ভাবছি।'

রহিম বখশ খুশি হয়ে বলল, 'আরে আগেই কইছি না থানভী ছাব, ছহীদ ছাবই পারব। দেহেন না অহন থাইকাই উনি ভাববার লাগছে।'

থানভী সাহেবের চেহারায় বিরক্তির আভাস দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, 'এদিকে আমাদের আর একটা জাহাজ আগামী সপ্তাহে সিডনী ছাড়বে। আমরা সেটা অনুমোদন করতে পারছিনে। অথচ কি করব ঠিক বুঝে উঠতেও পারছিনে।

শহীদের মুখটা উজ্জ্বল হল। সে বলল, 'আমি এই রকম একটা সুযোগ পাওয়া যায় কিনা তাই ভাবছিলাম। খুব ভাল হল মি. থানভী, ওই জাহাজটা ঠিক সময়েই ছাড়তে হবে। ওই জাহাজে আমার থাকবার ব্যবস্থা করুন। তবে জাহাজের কর্মচারী হিসেবে থাকতে হবে আমাকে। আমার এক বন্ধুও আমার সাথে থাকবেন। বাদবাকি আমার উপর ছেড়ে দিন।'

রহিম বখশ বলল, 'আরে হালায় আপনেরে কাপ্তান বানাইয়া দিমু।'

'না না, ক্যাপ্টেন নয়। অন্য কিছু। খালাসী হলেই ভাল হয়। মি. থানভী, ডু ইউ অ্যাপ্রুভ মাই প্ল্যান?'

থানভী সাহেব একটু চিন্তা করে বললেন, 'আপনার উপর এই দায়িত্ব চাপাবার জন্যেই যখন আমরা মনস্থির করেছি তখন আপনার যে-কোন সিদ্ধান্ত মেনে নেব।'

বাহরামভাই লাণ্ডিকোটালওয়ালা বললেন, 'আরে ভেই, দেখো হামারা সবকুচ বরবাদ না হোয়।'

শহীদ সবিনয়ে বলল, 'উওতো আপকা অদৃষ্ট হ্যায়। হাম তো নিমিত্ত মাত্র। তবে হাম কোশেশ্‌কা ক্রটি নেহি করেগা। মি. থানভী, আপনি তাহলে পরশুর মধ্যে যাতে আমরা সিডনী পৌঁছুতে পারি সে ব্যবস্থা করুন। আর জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে যোগাযোগ করুন। তবে তার কাছে পরিচয় দেবেন না আমাদের। আমার বন্ধুটাকে অ্যাপ্রেন্টিস আর আমাকে খালাসীর চাকরি দেবার ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। আমি আজকেই সমস্ত ব্যবস্থা করছি।'

বাহরামভাই লাণ্ডিকোটাল্লওয়ালা বললেন, 'আরে ভাই থানভী, জাহাজমে মেরা ভি এক আদমী কো ভেজ দেনা।'

থানভী সাহেব বিরক্তি চেপে বললেন, 'আচ্ছা, সে হবে।'

তিন

জাহাজটার নাম এস. এস. মহাযান। এই জাহাজে করেই পাকিস্তানে অস্ট্রেলীয় গমের তৃতীয় চালান পাঠানো হবে। গম বোঝাই যেদিন শেষ হল শহীদ ও কামাল সেইদিনই পৌছুল সিডনী। এর আগেই থানভী সাহেব শহীদ ও কামালের নিয়োগ সম্পর্কিত চিঠিপত্র ক্যাপ্টেনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একসঙ্গে সিডনী পৌছুলেও জাহাজে কামাল গেল আগে। পরের দিন অর্থাৎ জাহাজ ছাড়বার দিন গিয়ে হাজির হল শহীদ।

তোবড়ানো গাল, হাসি হাসি মুখ, বেঁটে, ঈষৎ কুঁজো একজন খালাসী অভ্যর্থনা জানাল শহীদকে। তার হাতে সুটকেস আর একটা বেডরোল দেখেই সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল যে চাকরিতে যোগ দিতে এসেছে লোকটা।

লোকটা খৈনি টিপতে টিপতে বলল, 'নতুন লোক বুঝি?'

শহীদ বলল, 'তা একরকম, ভাই। ক্যাপ্টেন সাহেব কোথায়?'

'চল তোমাকে নিয়ে যাই।'

ক্যাপ্টেন ব্রিজে ছিলেন। সেখানে নিয়ে গেল তাকে লোকটা।

'স্যার, নতুন লোক এসেছে একজন।'

ক্যাপ্টেন মুখ তুলে শহীদকে দেখে বললেন, 'কি নাম? রাজা মিয়া, না কালু মিয়া?'

'কালু মিয়া, স্যার,' সালাম ঠুকে বলল শহীদ।

'দেখি কাগজপত্র?'

শহীদ পকেট থেকে পাসপোর্ট, নিয়োগপত্র, হেলথ সার্টিফিকেট ইত্যাদি বের করে দিল।

ক্যাপ্টেন সেগুলো পরীক্ষা করে বললেন, 'ঠিক আছে।' ব্যাপারী, তুমি কালু মিয়াকে তোমাদের মেস-ডেকে নিয়ে যাও। ওখানে বাঙ্ক খালি আছে না?'

'আছে স্যার, দুটো।'

'ভালই হল। আরও একজন নতুন খালাসী আসবে। তাকেও তোমরা ওখানেই থাকতে দিয়ো হে।'

'আচ্ছা, স্যার।'

কামাল কখন এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করেনি শহীদ। সে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'স্যার, অফিসার্স রেস্ট-ডেকটা একেবারে নোংরা হয়ে রয়েছে। এই লোকটা তো

নতুন। জাহাজের কাজ শেখবার আগে ঝাড়া-মোছাটাই বরং শিখুক। আমাদের গেস্ট ডেকটা ওকে বলুন না পরিষ্কার করে দিয়ে যাক।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আচ্ছা, সে হবে। লোকটা তো সবেমাত্র এল। আগে সেটল্ করতে দিন।'

শহীদ কামালের দিকে একটা কটাক্ষ হানল।

'যাও হে, ব্যাপারী।'

খালাসীদের ডেক-মেসে পৌঁছার আগে আরও একটা ধাক্কা সামলাতে হল শহীদকে। তালগাছের মত লম্বা কুচকুচে কালো কদাকার চেহারার একটা লোক বীরদর্পে এগিয়ে আসছিল। তাকে দেখে শহীদের সঙ্গী মাথা নুইয়ে সালাম করে হাসি হাসি মুখে শহীদকে দেখিয়ে বলল, 'স্যার, আমাদের নতুন খালাসী কালু মিয়া।'

লোকটা শহীদকে আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, 'তা কালু মিয়াই হও আর ধলু মিয়াই হও কাজে ফাঁকি দিলে চলবে না। আমি তোমাদের বোসান আমীরগুল। যা বলব সঙ্গে সঙ্গে করবে। না হলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

শহীদ ঢোক গেলবার ভঙ্গি করে বলল, 'আচ্ছা।'

বোসান আর দাঁড়াল না। জুতোর শব্দ তুলে ব্রিজের দিকে এগিয়ে গেল।

ডেক-মেসে ঢুকে মালপত্র রেখে সস্তা দামের সিগারেট ধরাল শহীদ। সঙ্গীর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল। সে সিগারেট না নিয়ে বলল, 'আমি ভাই খৈনি খাই।'

'তোমার নামটা না কি?'

'মমতাজ ব্যাপারী। ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করেন তো, তাই আমাকে ব্যাপারী বলেন,' হাসি হাসি মুখ করে বলল লোকটা।

শহীদ বলল, 'একটু চা খাওয়া দরকার।'

'তাহলে চল ক্যান্টিনে যাই?'

'চল।'

চা খেয়ে ওরা ডেকে পৌঁছুতেই থমকে দাঁড়াল শহীদ। ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। ঠিক তারই মত একটা সুটকেস আর বেডরোল নিয়ে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছে মি. সিম্পসনের অফিসের সামনে দেখা বাহরামভাই লাণ্ডিকোটালওয়ালার আম্পালার সেই ভয়াল-দর্শন সোফার (আম্পালাটা যে লাণ্ডিকোটালওয়ালার তা পরে জানতে পেরেছিল শহীদ)। তার মনে পড়ল, ভদ্রলোক তারও একজন লোককে এই জাহাজে চাকরি দেবার কথা শহীদের সামনেই বলেছিলেন।

ক্যাপ্টেন তার কাগজ-পত্র দেখে মমতাজ ব্যাপারীকে ডেকে বললেন, 'তুমি না বলেছিলে, তোমাদের মেসে আর একটা বাঙ্ক খালি আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'এই লোকটাকে নিয়ে যাও।'

মমতাজ নবাগত খালাসীকে নিয়ে চলে গেল। লোকটা শহীদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

ক্যাপ্টেন ষণ্ডাকার লোকটার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

শহীদ চলে গেল পুরো জাহাজটা চক্কর মেরে দেখে আসতে।

কামাল এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের পাশে। সে বলল, 'ক্যাপ্টেন সাহেব, ইনিই আমাদের রাজা সাহেব নাকি?'

মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন গোলজার আহমদ বললেন, 'ক্যাণ্ডেলওয়ালার লোক।'

'ক্যাণ্ডেলওয়ালা আবার কে?' কামাল জানতে চাইল।

'কি যেন নাম ঠিক মনে থাকে না। ক্যালেণ্ডারওয়ালাও হতে পারে। মালিকদের একজনের নাম।'

'আমার তো মনে হয়, ভদ্রলোকের নাম লাণ্ডিকোটালওয়ালা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকমই নাম। অতবড় নাম কি মনে থাকে? দেখেছেন বোধ হয় ভদ্রলোককে, যেমন নামের বহর তেমন দেহের। অথচ কথা শুনলে মনে হয় চিঁ চিঁ করছে।' হাসলেন ক্যাপ্টেন।

'আচ্ছা ক্যাপ্টেন সাহেব, আপনাদের মালিকরা লোক কেমন?'

'মানে?'

'মানে, ওরা লোক কেমন?'

'মালিকরা মালিকের মতই। তবে জাহাজের ব্যবসা মোটেও জানে না। জানে শুধু নিজেদের লোক ঢোকাতে, অভিজ্ঞতা থাকুক আর না থাকুক। এই যেমন থানভী পাঠিয়েছে কালু মিয়াকে, ক্যাণ্ডেলওয়ালা পাঠিয়েছে ওই গুণ্ডাটাকে।'

'থানভী তো আমাকেও পাঠিয়েছেন,' কামাল নির্লজ্জের মত বলল।

ক্যাপ্টেন লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আপনি তো অ্যাপ্রেন্টিস। আপনার কথা আলাদা। অ্যাপ্রেন্টিসের প্রভিশন সব জাহাজেই আছে। থাকাও উচিত।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে কামাল বলল, 'আচ্ছা, আগের যে জাহাজ দুটো সমুদ্রে খোয়া গেছে সে দুটো কি এই কোম্পানিরই?'

'একটা আমাদের কোম্পানির। এস. এস. তিতাসা। অন্যটা একটা সিলেটি কোম্পানির।'

'এবারও কি তেমন কোন আশঙ্কা আছে?'

'কি করে বলি, বলুন। ভাবতে গেলে তো হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। সমুদ্রের চাকরি। জানটা হাতে নিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু উপায় কি, বলুন?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আজ হোক কাল হোক, রওনা

তো আমাদের দিতেই হবে। বিপদের আশঙ্কা থাকবেই। তাই বলে তো আর সিডনীতে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে পারি না।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল কামাল।

পুরো জাহাজটা চক্কর দিয়ে দেখে শহীদ তার মেস-ডেকের কাছে পৌঁছুতেই একটা ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল তার। তাদের মেসের দরজার ঠিক সামনেই কয়েকজন খালাসী জটলা পাকাচ্ছে। সেখান থেকেই আসছে ক্রুদ্ধ গর্জন। দ্রুত এগিয়ে গেল শহীদ।

জটলার ফাঁক দিয়ে সে দেখল, বিশালদেহী কদাকার বোসান আমীরগুল আর ষণ্ডাকার নবাগত খালাসী পরস্পরের দিকে হিংস্র দৃষ্টি মেলে গর্জন করছে। বুনো শুয়োরের মত ফুঁসছে ওরা, নাকের বাঁশি দু'জনেরই ফুলে ফুলে উঠছে।

অশ্রাব্য ভাষায় তথা নাবিকসুলভ ভাষায় দু'জনেরই সমান দখল দেখে অবাক হল শহীদ।

আশেপাশে যে খালাসীরা দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই উপভোগ করছে দৃশ্যটা। তাদের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। শহীদ ভিড় ঠেলে দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

শহীদ ষণ্ডাকার লোকটাকে বলল, 'আরে ভাই সাহেব, করছেন কি? উনি যে আমাদের অফিসার!'

শহীদের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপে নবাগত খালাসী যেন আরও খেপে গেল। সে তার রক্ত-রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে বলল, 'আরে এ আবার মামদোবাজি করতে এল কে? ভাগ হিঁয়াসে।' শহীদকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল লোকটা।

কিন্তু একচুলও নড়ল না শহীদ।

ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছিলেন। তিনি দৌড়ে এলেন।

'কি ব্যাপার, কালু মিয়া? নতুন চাকরি নিয়েই ঝগড়া বাধিয়েছ?'

'জ্বি, আমি না, স্যার।'

একজন খালাসীর কাছে ঘটনাটা জানা গেল। নতুন লোকটা—রাজা মিয়া না কি নাম, বোসান তাকে 'তুমি' বলায় চটে গেছে।

ক্যাপ্টেন রাজা মিয়ার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'কি যে অকারণ ঝামেলা বাধছে বারবার! থাকগে, যা হবার হয়েছে। মি. বোসান, জাহাজ এখুনি ছাড়বে। আপনি দয়া করে ব্রিজে যান। রাজা মিয়া, আধঘন্টা পরে আপনার অফিসার্স মেস-ডেকে ডিউটি, এখন যান। খাওয়া-দাওয়া করে নিন।'

বোসান আপত্তি করে বলল, 'কিন্তু?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'এখন জাহাজ ছাড়বার সময়। ওসব পরে হবে।'

রাজা মিয়ার দিকে আর একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল বোসান।

রাজা মিয়াও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল তাকে।

'যাও যে যার কাজে। জাহাজ ছাড়বে এখন,' ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন।

ক্যাপ্টেন চলে যেতেই মমতাজ একটু বিরস গলায় বলল, 'দিলে তো ক্যাপ্টেন মজাটা মাটি করে। আমি আর সোনাউল্লাহ পাঁচ টাকা বাজি ধরেছিলাম। পাঁচটা টাকা পেতাম আমি। মারামারি লাগলে রাজা মিয়া নিশ্চয়ই জিতত।'

সোনাউল্লাহ বলল, 'বোসানও তো জোয়ান কম না। সে-ও তো জিততে পারত?'

শহীদ রাজা মিয়াকে বলল, 'চলুন, এবার খেয়ে নিয়ে ডিউটিতে যাই।'

তাকে আমল না দিয়ে রাজা মিয়া দু'হাতে মমতাজ আর সোনাউল্লার ঘাড় ধরে বলল, 'খুব তো বাজি ধরেছিলে ব্যাটা ছুঁচোরা। আয় লড়বি তোরা? যে জিতবে তাকে পাঁচ টাকা দেব।'

সোনাউল্লাহ ও মমতাজ দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে গেল।

রাজা মিয়া দু'জনকেই গলা ধাক্কা দিয়ে একগাল হেসে শহীদকে বলল, 'তুমি আর ভাই আমাকে "আপনি, আজ্ঞে" কোরো না। তবে হ্যাঁ, অফিসার বলে আমায় অবজ্ঞা করলে সইতে পারব না। তোমরা তো আমাদের লোক। কি বলছ তোমরা?' উপস্থিত খালাসীদের উদ্দেশ্যে বলল সে।

কেউ কোন জবাব দিল না, সম্ভবত রাজা মিয়া কোন্ জবাবে তুষ্ট হবে তা বুঝতে না পারাতেই।

রাজা মিয়া তাদের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুটকেস আর বেডরোলটা তুলে নিল। মমতাজকে বলল, 'চল, কোথায় যেতে হবে?'

মমতাজ ঘাড় ডলতে ডলতে তাকে মেস-ডেকের ভিতরে নিয়ে একটা বাঙ্ক দেখিয়ে বলল, 'এই যে, এই বাঙ্কটা তোমার।'

শহীদও ভিতরে ঢুকল। মমতাজ হাসি হাসি মুখে তার উদ্দেশ্যে বলল, 'রাজা ভাই আমাদের কাছেই থাকবে। ভালই হল।'

ব্যঙ্গ করল রাজা মিয়া, 'ভালটা কি হল? ভালটা টের পাবি যখন তোর ওই হাসি-হাসি মুখটা কাঁদো কাঁদো করে দেব।'

একটা ঢোক গিলল মমতাজ।

রাজা মিয়া বলল, 'এই বাঙ্ক দুটোতে কারা থাকে?'

শহীদ বলল, 'এটাতে আমি আর ওটাতে মমতাজ।'

রাজা মিয়া তার জন্যে নির্ধারিত বাঙ্কটা আর এক নজর দেখে বলল, 'উঁহুঁ। মমতাজ, তুমি এই বাঙ্কটাতে থাক। তোমারটাতে আমি থাকব।'

'বেশ তো।'

'সরাও এখান থেকে তোমার জিনিস-পত্র।'

মমতাজ নীরবে তার বিছানাটা গুটিয়ে সরিয়ে ফেলল। শহীদ ভাবছিল, রাজা

মিয়া বোধ হয় এবার তার বিছানাটাও পেতে দেবার জন্য নির্দেশ দেবে। কিন্তু অতটা বাড়াবাড়ি করল না রাজা মিয়া।

নিজেই নিজের বিছানাটা বাঙ্কে পেতে পকেট থেকে একটা লাল রুমাল বের করে গলায় পেঁচিয়ে সুটকেসের ভিতর থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করল। চোখের সামনে বোতলটা তুলে ধরে সে বলল, 'আর বেশি নেই। থাক, এটুকু পরে খাওয়া যাবে।'

শহীদ একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসে রাজা মিয়ার কাণ্ড দেখছিল। প্যাকেটটা ছিল টেবিলের উপর। রাজা মিয়া ছোঁ মেরে প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বলল, 'ধোঁয়া ছাড়া দুনিয়াটাই ফানা।'

শহীদ কোন কথা বলল না। মমতাজ তখন তার বিছানাটা পেতে রাজা মিয়ার দখল করা বাঙ্কের পাশের দেয়াল থেকে দুটো আণ্ডার-ওয়াটার সুইমিং গিয়ার সরিয়ে নিজের বাঙ্কের দেয়ালে লটকাচ্ছিল।

রাজা মিয়া সিলিণ্ডার দুটো দেখে অবাক হয়ে বলল, 'আরে, শশার মত ও দুটো আবার কি হে?'

রাজা মিয়ার জ্ঞানের বহর দেখে মমতাজ বোধ হয় একটু বিস্মিত হল। সে হেসে বলল, 'ওগুলোর মধ্যে অক্সিজেন আছে। আমার আবার সমুদ্রের নিচে নামবার খুব শখ। তাই মাঝে মাঝে ওগুলো নিয়ে সমুদ্রে নামি। অনেক মজার মজার জিনিস দেখা যায় সমুদ্রের নিচে।'

রাজা মিয়া একটু খোশামোদের সুরে বলল, 'আমায় একদিন নামাবি দোস্ত সমুদ্রের নিচে? আমারও খুব ইচ্ছা সমুদ্রের তলে কি আছে দেখবার।'

মমতাজ বলল, 'এখন তো আর হবে না! একটু পরেই ছেড়ে দেবে জাহাজ। চিটাগাং গিয়েই তোমাকে নিয়ে সমুদ্রের নিচে নামব।'

রাজা মিয়া খুশি হল এবং তার প্রমাণস্বরূপ মমতাজের কাঁধের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারল। মমতাজের দেহটা কুঁকড়ে গেলেও প্রভুভক্ত কুকুরের মত হাসি মুখ থেকে মুছে গেল না।

চার

সিডনী ছাড়বার দু'দিন পরে ক্যাপ্টেন গোলজার ও বোসান আমীরগুল রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে আলাপ করছিলেন। একটু দূরে মমতাজ ও সোনাউল্লাহ ক্যাপস্টান-বারের দড়ি গুছিয়ে রাখছিল। উল্টোদিকের রেলিং-এর ধারে বসে ফিশ খেলছিল রাজা মিয়া ও শহীদ।

ক্যাপ্টেন বোসানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বুঝছ হে? এবারও কোন বিপদ দেখা দেবে বলে মনে হয় নাকি?'

বোসান বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছিনে। তবে নতুন ক্রুটাকে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।'

'কার কথা বলছ? নতুন ক্রু তো বেশ কয়েকজন আছে। ওই গুণ্ডার মত লোকটা, না কালু মিয়া, না…?'

'ওই গুণ্ডাটার কথাই বলছি। ওকে একবার বাজিয়ে দেখা দরকার। তাছাড়া কালুটাও গুণ্ডার সাথে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সেটাও সন্দেহজনক। ওকেও একবার বাজিয়ে দেখা উচিত। দরকার হলে টিজ করে ফাঁদে ফেলতে হবে। যাতে কোন বিপদ না ঘটাতে পারে।'

'কিন্তু দেখ, গুণ্ডাটা আবার ক্যাণ্ডেলওয়ালার পেয়ারের লোক।'

'তার প্রমাণ কি? একটা চিঠি বই-তো নয়? এমনও তো হতে পারে, লোকটা ভুয়া পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছে। ক্যাণ্ডেলওয়ালার আসল লোককে হয়ত গায়েব করে দিয়েছে। ক্যাণ্ডেলওয়ালা একটা গুণ্ডা পাঠাবে এটাও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই না?'

'হ্যাঁ, তা-ও অসম্ভব নয়,' ক্যাপ্টেন চিন্তা করে বলল।

'সুতরাং আমি একটু বাজিয়ে দেখতে চাই।'

একজন খালাসী এসে বলল, 'ক্যাপ্টেন সাহেব, এঞ্জিনিয়ার সাহেব এঞ্জিন-রুমে যেতে বলেছেন।'

ক্যাপ্টেন এঞ্জিনরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বোসান আমিরগুল একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে-সুস্থে রাজা মিয়া ও শহীদের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা একবার চোখ তুলে বোসানের দিকে তাকিয়ে খেলায় মন দিল।

আমীরগুল গম্ভীর মুখে রাজা মিয়াকে বলল, 'রাজা মিয়া, দয়া করে একবার উঠতে হবে। অফিসারদের রেস্ট-ডেকটা পরিষ্কার করতে হবে।'

লাল চোখ দুটো আমীরগুলের মুখের দিকে তুলে রাজা মিয়া বলল, 'আমার এখন ডিউটি নেই।'

আমীরগুল সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'নেই তো কি হয়েছে? আমি যদি বলি তাহলে করতেই হবে। আমার কথাই আইন। উঠে এস।'

ধীরে-সুস্থে তাসগুলো গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল রাজা মিয়া। শহীদ মনে মনে প্রমাদ গুনলেও নির্বিকার ভঙ্গিতে বোসান ও রাজা মিয়ার দিকে তাকাল। দু'জনেরই চোখে-মুখে হিংস্রতার ছাপ।

বোসান বলল, 'চল।'

কঠিন দৃষ্টিতে রাজা মিয়া বোসানের দিকে চেয়ে বলল, 'যদি না যাই?'

বোসান মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'তোর বাবা যাবে, শালা।'

'চোপরাও!' গর্জন করে উঠল রাজা মিয়া।

শহীদ তাসগুলো গুছিয়ে নিয়ে সরে গেল। গোলমাল দেখে আরও কয়েকজন খালাসী এসে ভিড় করে দাঁড়াল। মমতাজ সোনাউল্লাকে বলল, 'এইরে, লাগল বুঝি দুই সেগুন কাঠে লড়াই। ধরবি বাজি?'

সোনাউল্লা বলল, 'বোসান শালাই জিতবে। দেখেছিস কেমন পেটা শরীর?'

'উঁহু, রাজা মিয়া জিতবে। শালার যেন লোহা দিয়ে গড়া শরীর।'

'পাঁচ টাকা বাজি।'

'ঠিক হ্যায়, পাঁচ টাকা।'

ওদিকে তখন বোসান ও রাজা মিয়া গজরাচ্ছে।

বোসান বলল, 'বেয়াদবি করবি তো সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

রাজা মিয়ার বাঁ হাতটা নড়ে উঠল। বোসানের টুপিটা খুলে অবহেলাভরে সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিল রাজা মিয়া। সে বলল, যা যা, আগে টুপি নিয়ে আয়। তারপর কথা বলিস।'

অপমানে রাগে বোসান গর্জন করে উঠল, 'তবে রে···।'

রাজা মিয়ার চোয়াল বরাবর ঘুসি চালাল বোসান। মাথাটা সরিয়ে ফেলল রাজা মিয়া মুহূর্তের মধ্যে। ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল আমীরগুল।

মমতাজ চিৎকার করে উঠল, 'লাগা না একটা, রাজা মিয়া।'

রাজা মিয়ার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা বোসানের চোয়ালের উপর গিয়ে পড়তেই 'আক' করে একটা আর্তনাদ শোনা গেল।

আনন্দে মমতাজের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, সে হাততালি দিয়ে উঠল। আর শুকিয়ে গেল সোনাউল্লার মুখ।

আমীরগুল আঘাতটা সামলে নিয়ে তার বাঁ হাতটা দিয়ে রাজা মিয়ার গলাটা চেপে ধরে ডান হাতটা দিয়ে বার কয়েক ঘুসি চালাল। কিন্তু রাজা মিয়া প্রত্যেকবারই মুখটা এমন দূরত্বে রাখল যে বিশেষ সুবিধা করতে পারল না বোসান।

বোসান একটু অসতর্ক হতেই রাজা মিয়া তার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ধরে মোচড় দিল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল বোসান। এক ঝটকায় রাজা মিয়া বোসানের হাতটা গলা থেকে সরিয়ে তার চিবুকের তলায় হাত দিয়ে ধাক্কা মারল।

এক পা পিছনে সরে গেল আমীরগুল। তারপর মুখ খিঁচিয়ে আবার তেড়ে এল। রাজা মিয়া প্রস্তুত ছিল। সে ক্ষিপ্র গতিতে বাঁ হাতে আমীরগুলের পেটে একটা ঘুসি চালাল।

'আক' করে আর্তনাদ করে উঠল আমীরগুল। চেহারায় ফুটে উঠল যন্ত্রণার ছাপ। কিন্তু নিজেকে সামলাবার সময় পেল না সে। পরমুহূর্তেই তার চোয়ালে প্রচণ্ড

একটা মুষ্ট্যাঘাত পড়ল। চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগল আমীরগুল।

চিত হয়ে পড়ে গেল সে ডেকের উপর।

ক্যাপ্টেন গোলমালের খবর পেয়েছিলেন। তিনি এসে দেখলেন বোসান ডেকের উপর চিত হয়ে পড়ে আছে।

বিস্ময়ে, রাগে ও বিরক্তিতে ক্যাপ্টেন ফেটে পড়লেন। রাজা মিয়া তখনও ফুঁসছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা মিয়া, ব্যাপার কি? আমীরগুল পড়ে আছে কেন? কি হয়েছে ওর?'

মমতাজ জবাব দিল, 'পা পিছলে পড়ে গেছে, স্যার।'

'হুঁ।' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

একটু পরেই উঠে বসল আমীরগুল। চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে সে রাজা মিয়ার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ক্যাপ্টেন উপস্থিত সকলের দিকে একবার তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'রাজা মিয়া, কাজে যান। ডিউটি শুরু হয়েছে আপনার।'

'যাই, স্যার।'

'চল, আমীরগুল।'

'চলুন, স্যার।'

ক্যাপ্টেনের পিছন পিছন অফিসারস রেস্ট-ডেকে চলে গেল আমীরগুল মাথা নত করে।

রাজা মিয়া বলল, 'বোসান সাহেব, আপনার টুপিটা তুলে নিয়ে গেলেন না?'

বোসান ফিরে তাকাল একবার তার দিকে। তার দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলছে।

মমতাজ সোনাউল্লাকে বলল, 'দে টাকা। জিতেছি আমি।'

ব্যাজার মুখে পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে দিল সোনাউল্লা।

মমতাজ হাসিমুখে রাজা মিয়াকে বলল, 'সাবাস! ওস্তাদ, বেড়ে দেখিয়েছ। লড়তে জান বটে।'

খোশামুদীতে তেমন খুশি হল না রাজা মিয়া। সে বলল, 'দেখ না, কেমন লোকটার বাড়াবাড়ি! কয় টাকাই বা বেতন দিবি? কিন্তু যেন একটা খাস চাকর পেয়েছে। সারাক্ষণই খালি কাজ—হ্যানো কর, ত্যানো কর। একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই। বেশি টাকা দিতিস, তাহলে না হয় বুঝতাম। হুকুমের চাকর হয়ে থাকতাম।'

'ঠিক ওস্তাদ, ঠিক কথা বলেছ।'

একটু দূরে কামাল ও শহীদ দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে আলাপ করছিল। কামাল শহীদকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, সন্দেহ করবার মত কাউকে দেখলি?'

শহীদ বলল, 'কাউকেই তো দেখছিনে।'

'আমার কিন্তু রাজা মিয়া আর বোসান দু'জনকেই সন্দেহ হয়।'

'তাহলে ওরা মারামারি করবে কেন?'

'ওটা লোক দেখানো হতে পারে।'

'তা অবশ্য হতে পারে,' শহীদ স্বীকার করল।

মমতাজ ও রাজা মিয়া ওদের দিকে এগিয়ে আসায় ওরা প্রসঙ্গ পাল্টাল। কামাল বলল, 'কি রাজা মিয়া, জাহাজের চাকরি কেমন লাগে?'

রাজা মিয়ার জবাব তৈরি ছিল। সে নীরস কণ্ঠে বলল, 'কেন স্যার, ভাল না লাগলে কি আমাকে অন্য চাকরি দেবেন?'

কামাল এমন জবাব আশা করেনি। সে থতমত খেয়ে বলল, 'না, তা আর কোত্থেকে দেব?'

'তাহলে স্যার, ওসব রসের আলাপ করতে আসবেন না।'

চলে গেল রাজা মিয়া। মমতাজ তাকে অনুসরণ করল।

কামাল বলল, 'লোকটা তো ভীষণ বেয়াড়া।'

শহীদ সায় দিল।

'আস্ত একটা ক্রিমিন্যাল। আমার কিন্তু এই লোকটাকেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয়,' কামাল মন্তব্য করল।

'কিন্তু বেয়াড়াপনা ছাড়া আর কোন সন্দেহজনক আচরণ লোকটা এখনও করেনি,' শহীদ মৃদুকণ্ঠে বলল।

'তবু খেয়াল রাখিস ওর দিকে।'

'আরে সে তো রাখছিই। কিন্তু তুই ওদিকে লক্ষ্য রাখবি।'

'আচ্ছা।'

পাঁচ

দশদিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটল না। রাজা মিয়াকে কেন্দ্র করেও কোন হাঙ্গামা হল না আর।

একাদশ দিন ভোরে হঠাৎ দক্ষিণ-পুবদিকে ঘন একটা বিশাল কুয়াশার কুণ্ডলী দেখা দিল। কামালেরই চোখে পড়ল প্রথম কুণ্ডলীটা। সে দেখল একটা কুয়াশার মেঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পুবদিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। সে দ্রুত ক্যাপ্টেনকে খবর দিল। ক্যাপ্টেন ডেকে ছুটলেন। কামালকে বললেন, 'রাডার-রুমের সাথে কনট্যাক্ট করুন এখুনি।'...সে দৌড়ে গেল রাডাররুমের দিকে। রাডার অফিসার হায়দার কবীর রাডারে কুয়াশার কুণ্ডলীর গতি লক্ষ করছিল।

কামালকে হন্তদন্তভাবে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেই হায়দার কবীর বলল, 'আমি দেখেছি কামাল সাহেব, আমি দেখেছি, ভয়ের কিছু নেই। ওটা কুয়াশার কুণ্ডলী। লোকালি ফর্ম করেছে। এসব বেশিক্ষণ থাকে না। তবে জাহাজের ওর মধ্যে পড়ে

যাওয়া বিচিত্র নয়। স্পীড কমিয়ে দিতে হবে। আমি এঞ্জিনরুমকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন।'

কিন্তু কামালের সন্দেহ দূর হল না। সে চিন্তিত মনে রাডাররুম থেকে বেরিয়ে দ্রুত চলে গেল শহীদের ডেক-মেসে। শহীদ সেখানে ছিল না। মমতাজ কামালকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'স্যার যে!'

'শহী…মানে কালু মিয়া কোথায়!' কামাল রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল।

মমতাজ বলল, 'সে আর রাজা মিয়া তো আপনাদের ডেকেই। ব্যাপার কি, স্যার?'

জবাব না দিয়েই বেরিয়ে এল কামাল। অফিসার্স মেস-ডেকে যাবার সময় তার খেয়াল হল জাহাজের গতি অনেক কমে গেছে।

দক্ষিণ-পুবদিকে তাকাল কামাল। কুয়াশা তখনও বেশ দূরে।

অফিসার্স রেস্ট-ডেকেও শহীদকে দেখতে পেল না কামাল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে ব্রিজে গিয়ে হাজির হল সে। জাহাজের প্রায় অর্ধেক যাত্রীই সেখানে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে কুয়াশার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে আসছে।

বাতাসে একটা পোড়া গন্ধ ভেসে আসছিল। কুয়াশা কুণ্ডলিও ক্রমেই এগিয়ে আসছে জাহাজটার দিকে।

কামাল ভিড়ের মধ্যে শহীদকে দেখতে না পেয়ে এঞ্জিনরুমের দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথাতেই দেখা গেল শহীদ ও রাজা মিয়া হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসছে।

উপরে উঠে এসেই রাজা মিয়া রহস্যভরা কণ্ঠে বলল, 'কি ব্যাপার, কামাল, আমি কি এসে গেছি?'

উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত কামাল থতমত খেয়ে রাজা মিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

শহীদ দ্রুত বলল, 'ওসব পরে হবে, কুয়াশা। এখন চল। অবস্থাটা দেখি।'

'নিশ্চয়ই। এস কামাল।'

স্বপ্নচালিতের মত শহীদ ও কুয়াশার পিছনে পিছনে এগোল কামাল। তখনও তার বিস্ময় কাটেনি।

ডেকের উপর আরোহীদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। সেখানে কেমন যেন দমবন্ধ করা হাওয়া। কেমন যেন পোড়া গন্ধ। ব্রিজের দিকে এগিয়ে গেল শহীদ, কামাল ও কুয়াশা। কুয়াশার কুণ্ডলীটা ততক্ষণে জাহাজের মধ্যে ঢুকে গেছে। খুকখুক করে কাশছে কয়েকজন।

ক্যাপ্টেন যেন কাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এস. ও. এস., পাঠাতে বলা হয়েছে?'

'পাঠানো হয়েছে এস. ও. এস., স্যার,' একজন খালাসী জানাল।

ধীরে ধীরে ডেকের ভিতরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কাশতে কাশতে

বুক চেপে ধরে বসে পড়ল কয়েকজন ক্রু ও অফিসার। দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গেল দুজন। আমীরগুল সঙ্গা হারিয়ে পড়ে গেল ডেকের উপর।

'আল্লা আল্লা' করতে লাগল কয়েকজন ক্রু। কে একজন হাউমাউ করে কাঁদতে গিয়ে কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে হাঁপাতে লাগল। একটু পরে শহীদও কাশতে লাগল। এঞ্জিনিয়ার জসিমুদ্দিন কাশতে কাশতে বুক চেপে ধরে বসে পড়লেন। ক্যাপ্টেনের অবস্থাও তথৈবচ।

রাজা মিয়া কয়েক সেকেণ্ড তাদের অবস্থা দেখে দ্রুত তার ডেক-মেসের দিকে এগিয়ে গেল। তারও শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কুয়াশায় পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অতিকষ্টে নিঃশ্বাস চেপে এগিয়ে গেল সে। মমতাজ ব্যাপারীর আণ্ডার-ওয়াটার সুইমিং গিয়ার খুলে ফেলল সে দেয়াল থেকে।

গিয়ারটা হাতে নিয়ে সে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে নাকের কাছে চেপে ধরল। অক্সিজেনে বুক ভরে শ্বাস নিল সে।

সিলিণ্ডারটা নাকে চেপে ধরে রেখেই সে বেরিয়ে এল। সমস্ত জাহাজে সে ছাড়া আর কোন জনপ্রাণী আছে বলে মনে হল না তার। এখানে-সেখানে চিত হয়ে, উপুড় হয়ে পড়ে আছে খালাসী ও অফিসাররা।

প্রথমেই সে গেল শহীদের কাছে। সে সটান চিত হয়ে পড়ে ছিল। উঁচু হয়ে বসে নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল শ্বাস বইছে শহীদের। একটু দূরেই পড়েছিল কামাল। রাজা মিয়া দেখল তারও শ্বাস-প্রশ্বাস যথারীতি বইছে।

আপন মনে বলল রাজা মিয়া—তাহলে এটা মৃত্যু-ফাঁদ নয়, অজ্ঞান করার একটা কৌশলমাত্র। মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। কিন্তু কুয়াশার আকারে এই ধরনের চেতনা-বিলোপকারী গ্যাস কারা ছাড়ছে? কেন ছাড়ছে? তাদের উদ্দেশ্যটা কি?

কথাটা ভাবতে ভাবতে কুয়াশা নিঃশব্দে ব্রিজের দিকে এগোল। এই বিশাল জাহাজটাতে এখন জীবিত এবং সচেতন বলতে গেলে সে একাই আছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? শত্রুপক্ষের কোন এজেন্ট কি জাহাজে নেই? আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কে? এতদিন ধরে প্রত্যেকটা লোকের গতিবিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছে সে। সন্দেহ করার মত কাউকে পায়নি।

ব্রিজের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। রেডিও-রূমের জানালার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। কে একজন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার মতই বিষাক্ত গ্যাসের কুণ্ডলীকে প্রতারণা করেছে যে লোকটা সে কে? রেডিও-রূমের ভিতরে সে করছেই বা কি?

পা টিপে টিপে কুয়াশা রেডিও-রূমের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটু আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সে দেখল লোকটা আর কেউ নয়, খালাসী মমতাজ। তারও হাতে অক্সিজেন সিলিণ্ডার। আণ্ডার-ওয়াটার সুইমিং গিয়ারের রহস্যটা এতক্ষণে বুঝতে পারল কুয়াশা।

মমতাজ তখন বলে চলেছে, 'দিস ইজ এস. এস. ইয়েলো রিভার…দিস ইজ এস. এস. ইয়েলো রিভার। আমরা এস. এস. জলযানের এস. ও. এস. পেয়েছি। জলযান থেকে আমরা মাত্র দশ মাইলের মধ্যে আছি…এবং জাহাজটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছি পূর্ণ গতিতে,' কয়েকবার বলল সে কথাটা।

কুয়াশা আর দাঁড়াল না। সমস্ত চক্রান্ত এক নিমেষে বোঝা হয়ে গেছে তার। সে নিঃশব্দ দ্রুততায় চলে গেল তার ডেক-মেসে। বিষাক্ত গ্যাস তখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কুয়াশা মমতাজের বাঙ্কের কাছে যথাস্থানে অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা ঝুলিয়ে রেখে একটা রিভলভার পকেটে নিয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখল একটা সাবমেরিন ধীরে ধীরে এস. এস. জলযানের পাশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

সেখানেই শুয়ে পড়ল কুয়াশা। তার কয়েক হাত দূরে দুজন খালাসী আর মেডিকেল অফিসার পড়ে আছে।

পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল কুয়াশা। যেখানে সে শুয়ে আছে সাবমেরিনটা সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। একটা বিরাট হ্যাচ ধীরে ধীরে সাবমেরিন থেকে উঁচু হয়ে এস. এস. জলযানের ডেকের পাশে লাগল।

কে যেন মাইক্রোফোনে বলে উঠল, 'একশন গ্রুপ ফোর। সবাই চলে এস জাহাজে।'

হ্যাচ বেয়ে উদ্যত রিভলভার হাতে একজন লোক ডেকে নামল। শুধু মুখটা আর হাত ছাড়া তার সমস্তটা দেহই কালো পোশাকে মোড়া। আরও একজন তাকে অনুসরণ করল। তারপর আর একজন। কুয়াশা গুনে দেখল মোট দশজন নেমে এল ডেকে। প্রত্যেকের একই পোশাক। হাতে রিভলভার। কোমরের বেল্টে রিভলভারের খাপ।

প্রথমে যে লোকটা নেমেছিল সম্ভবত সে-ই দলপতি। সে নির্দেশ দিল, 'জলদি সার্চ কর। কার কাছে কি অস্ত্র আছে বের করে নাও। কয়েকজন উপরে চলে যাও। মেস-ডেকে যাও দুজন।'

বাকি লোকগুলো নিঃশব্দে নির্দেশ পালন করল।

কুয়াশা অতি সন্তর্পণে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে দড়ির স্তূপের তলায় ঢুকিয়ে দিল।

তন্নতন্ন করে সার্চ করল ওরা প্রত্যেকটা লোককে। দুজন ফিরে এসে বলল, 'সার্চ শেষ।'

দলপতি বলল, 'নামটা বদলে ফেলা হচ্ছে তো? পনেরো মিনিট সময় পাবে।'

'ঠিক আছে। তাতেই হবে।'

রাডাররুম থেকে একজন বেরিয়ে বলল, 'ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে একটা

রেসকিউ হেলিকপ্টার আসছে।'

দলপতি ঘড়ি দেখে বলল, 'অসুবিধে হবে না। এস. এস. জলযানকে এস. এস. ইয়েলো রিভারে পরিণত করতে আর পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না। তুমি যাও, সাবমেরিনটাকে ডুবে যেতে বল।'

লোকটা চলে গেল।

একটু পরেই সাবমেরিনের হ্যাচটা নেমে গেল। কুয়াশার বুঝতে বাকি রইল না যে, সাবমেরিনটা এখন ডুব দেবে এবং রেসকিউ হেলিকপ্টারস এসে এস. এস. জলযানের বদলে এস. এস. ইয়েলো রিভারকে দেখতে পেয়ে ফিরে যাবে।

একটু পরেই হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল। এবং মিনিট পনেরো জাহাজটার চারদিকে ঘোরাঘুরি করে চলে গেল।

তার কাছেই দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তারা নিম্ন স্বরে আলাপ করছিল।

একজন বলল, 'এবারও প্ল্যানটা ঠিক ঠিক লেগে গেল। এতটুকু গোলমাল হয়নি কোথাও। হাঃ হাঃ। লীডার সত্যি বুদ্ধিমান লোক।'

জাহাজের টারবাইনের স্পন্দনে আর কোন কথা শোনা গেল না।

আরও কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। খুব কাছেই পায়ের শব্দ শুনে চোখ বন্ধ করল কুয়াশা। তিন চারজন লোক তাকে পাঁজাকোলা করে টেনে তুলল। অচেতনের ভান করে রইল কুয়াশা।

একজন বলল, 'লোকটা তো ভারি কম না!'

কুয়াশাকে বয়ে নিয়ে তারা কিছুক্ষণ পরে এক জায়গায় ধপাস করে ফেলে দিল। পাছায় প্রচণ্ড আঘাত লাগা সত্ত্বেও তার চোখ-মুখের কোন পরিবর্তন হল না।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।' একটা কণ্ঠস্বর কানে এল কুয়াশার।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সাবধানে চোখ খুলল কুয়াশা। খালাসীদের একটা মেস-ডেকে পড়ে আছে সে। সেখানে আছে শহীদ, আমীরগুল ও ক্যাপ্টেন।

'উহ্।' কে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। একটা পা এসে পড়ল কুয়াশার কোমরের উপর।

কুয়াশা দেখল লোকটা হচ্ছে বোসান আমীরগুল। সে চোখ মেলে বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। চুপ করেই রইল কুয়াশা।

আরও কিছুক্ষণ পরে আমীরগুল ধড়মড় করে উঠে বসল। কপালের রগ দুটো ধরে বসে রইল সে। কুয়াশাও উঠে বসল।

কুয়াশার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমীরগুল।

একটু পরে শহীদ ও ক্যাপ্টেন নড়েচড়ে উঠে বসল। শহীদ মেস-ডেকের রুদ্ধদ্বারের দিকে চেয়ে কুয়াশাকে বলল, 'ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছিনে। আমরা এখানে কেন?'

আমীরগুল তার দিকে একবার তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে রইল।

কুয়াশা বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা সবাই বন্দী।'

'বন্দী?' আমীরগুল এমনভাবে শব্দটা উচ্চারণ করল যেন কথাটার মানে সে বুঝতে পারেনি।

দরজাটা খুলে গেল।

ওরা সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, মমতাজ ও সর্বাঙ্গে কালো পোশাক পরা দুজন লোক ভিতরে ঢুকছে। তাদের হাতে রিভলভার।

আমীরগুল উঠে দাঁড়াল।

'মমতাজ, ব্যাপার কি!' তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'জাহাজ এখন আমাদের দল অর্থাৎ মানবধ্বংসী মহাসভার হাতে চলে গেছে। তোমরা সবাই আমাদের বন্দী। তোমরা যদি কোন গোলমাল না করে আমাদের কথা মত চল তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি অবাধ্য হও, আদেশ পালন না কর···,' মমতাজ থামল।

তার কথা শেষ হল না। কুয়াশা বসে ছিল। সে হঠাৎ একলাফে মমতাজের পিছনের দাঁড়িয়ে তার ঘাড় চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমার অনিচ্ছায় আমি কারও আদেশ মানি না। ওই শয়তান দুটোকে বল রিভলভার নামাতে।'

ঘাড়ে তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও মমতাজের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে লোক দুটোকে রিভলভার নামাবার ইঙ্গিত করে বলল, 'আরে ছাড় ছাড়, করছ কি? তোমাকে তো আমার খুব পছন্দ। সেদিন তোমার বদৌলতে আমি পাঁচ টাকা আয় করেছি। আর তুমিই না বলেছিলে হাজার হাজার টাকা আয় করতে চাও? আমি তোমাকে সে সুযোগ করে দিতে পারি।'

'ঠিক?'

'বিলকুল ঠিক।'

'কথার কোন নড়চড় হবে না তো?'

'মোটেও না। তুমি দেখে নিয়ো। কিন্তু হ্যাঁ, গোলমাল পাকাবে না।'

'বেশ, তাই হবে।' কুয়াশা মমতাজকে ছেড়ে দিল। 'তবে কালু মিয়াকে যদি তোমাদের দলে নাও তাহলে ভালই হবে। রাজি আছ?'

'এ তো খুব ভাল কথা।'

আমীরগুল কুয়াশার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল। তাকে আমল দিল না, কুয়াশা।

মমতাজ বলল, 'তোমরা দুজন তাহলে আমাদের সাথে চলে এস। তোমাদের আর এই শুয়োরগুলোর সাথে থাকা নিরাপদ নয়।'

আমীরগুল ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'তাই নিয়ে যাও। ওই নরক-কীটদের সঙ্গে থাকতে আমারও গা ঘিনঘিন করবে।'

কালো কাপড়-পরা লোক দুটো আমীরগুলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

মমতাজের পিছনে পিছনে ওরা কয়েকজন বেরিয়ে যেতেই কালো পোশাকধারীদের একজন দরজাটা বন্ধ করে দিল।

একটা অফিসার্স কেবিনে ওদের দুজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে মমতাজ বলল, 'আপাতত তোমরা এখানেই নিরাপদ থাকবে। আমাদের বন্দরে পৌঁছুবার আগে এখান থেকে বের হয়ো না। কারণ তোমরা যে আমাদের পক্ষে তা আমাদের দলের সবাই জানে না। আমাদের আস্তানায় পৌঁছুলে তোমাদের পোশাক বদলে দেয়া হবে।'

কুয়াশা বলল, 'আমি কিন্তু তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'এখন বোঝার দরকার নেই,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল মমতাজ।

'আমাদের খাবার দাবার ঠিক মত দিয়ো হে।'

'পাবে।'

দরজাটা বন্ধ করে দিল মমতাজ।

কুয়াশা একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

শহীদ বলল, 'কি বিশ্রী মেকআপ যে নিয়েছ তুমি! আমারও অনেক দিন লেগেছে তোমাকে চিনতে। আর এমন গোলমালইবা কেন করলে আমীরগুলের সাথে?'

কুয়াশা বলল, 'প্রথম প্রশ্নের জবাব হল, এই মানব-ধ্বংসী মহাসভার কয়েকজন কেষ্ট-বিষ্টু আমাকে চেনে। তাই সন্দেহ করার অবকাশটুকু রাখিনি। আর গোলমাল বাধিয়েছিলাম শুধুমাত্র শত্রু এজেন্টদের চোখে পড়বার জন্যে। তাতে তো সফল হয়েছিই।'

'মানব-ধ্বংসী মহাসভার আসল লক্ষ্যটা কি?'

'ধ্বংস-যজ্ঞ চালানো। এবং ধ্বংসের সুযোগ নিয়ে ধনসম্পদ লুট করা। দুনিয়া-জোড়া এদের লোক আছে। পৃথিবী থেকে লোক কমানোও ওদের অন্যতম লক্ষ্য। ওরা মানবতার এক ভয়ঙ্কর শত্রু।'

ছয়

'ভারত মহাসাগরেরই কোন এক দুর্গম দ্বীপে ওদের ঘাঁটি। ওদের দলে আছে কয়েকজন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক। দলপতি নিজেও বিজ্ঞানী। সম্ভবত আমরা এখন ওদের ঘাঁটিতেই যাচ্ছি।'

'জলযানের মালিকদের সাথে এই দলটার কোন যোগাযোগ আছে?' প্রশ্ন করল শহীদ।

'না। বাহরামভাই লাণ্ডিকোটালওয়ালা আমার পুরানো বন্ধু। তার বিশেষ

অনুরোধেই আমি দলটার পেছনে লেগেছি। ওরা অবশ্য আসল রহস্য কেউ জানে না।'

'কিন্তু জাহাজ দিয়ে ওরা কি করবে? বিশেষ করে আগের দুটো জাহাজও নিশ্চয়ই ওদের খপ্পরে পড়েছে।'

'ঠিক বুঝতে পারছিনে। কিছু একটা উদ্দেশ্য তো আছেই। দেখাই যাক না। এখন তো আমাদের কিছু করার নেই। বাইরে বেরুনোও চলবে না। মমতাজ নিশ্চয়ই দরজার কাছে প্রহরী রেখে গেছে। সুতরাং খাও-দাও ঘুমাও।'

তৃতীয় দিনে হঠাৎ মানব-ধ্বংসী মহাসভার একজন লোক এসে বলল, 'চল। গ্রুপ কমাণ্ডার মমতাজউদ্দিন তোমাদেরকে ব্রিজে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

শহীদের খেয়াল হল জাহাজের গতি কমে গেছে। এঞ্জিনের আর্তনাদ অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে।

মমতাজ দাঁড়িয়েছিল ব্রিজে। সে বলল, 'এসে গেছি আমরা। ওই যে দ্বীপটা দেখতে পাচ্ছ ওটাই আমাদের হেড-কোয়ার্টার।

অদূরে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। উঁচু-নিচু পাহাড়ময় দ্বীপ আর দেখা যাচ্ছিল দুটো জাহাজ দ্বীপটার পাশে।

কুয়াশা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। মমতাজের হুঙ্কার শুনে সে থেমে গেল। লোকটা চিৎকার করে সারেঙকে বলল, 'সাবধান, সামনে খাড়ি আছে। পাশ কাটিয়ে যাও। ভুল করলে কিন্তু তোমার এক মাসের মাইনে কাটা যাবে। তাছাড়া আস্ত রাখবে না ডিরেক্টর।'

দ্বীপটার আরও অনেক কাছে এগিয়ে গেল জাহাজ। সমুদ্রের ভিতর থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। তার পাশেই নোঙর করা দুটো জাহাজ ও একটা সাবমেরিন।

মমতাজ সারেঙকে আদেশ দিল, 'আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ডাইনে রাখ। এন্টনী তুমি হেড-কোয়ার্টারে খবর দাও।'

সারেং-এর পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল সে রেডিও-রুমের দিকে চলে গেল।

দ্বীপ থেকে প্রায় একশো গজ দূরে নোঙর ফেলল জাহাজ।

মিনিট পনেরো পরেই সগর্জনে একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসতে লাগল এস. এস. জলযানের দিকে।

মমতাজ বলল, 'এই তো আমাদের ট্রান্সপোর্ট এসে গেছে।'

হেলিকপ্টার থেকে দেখা গেল একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শহীদ বলল, 'ওটা বোধ হয় আগ্নেয়গিরি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু শুধু আগ্নেয়গিরিই নয় ওটা আরও কিছু। পরে দেখতে পাবে। আগে সরদারের সাথে আলাপ হোক। তোমাদের পরীক্ষা হোক,' ককপিট থেকে মমতাজ বলল।

কুয়াশা বিদ্রূপ করে বলল, 'পরীক্ষায় ফেল করলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে আগ্নেয়গিরির মধ্যে ফেলে দিতে কসুর করবে না।'

মমতাজ মুখ ফিরিয়ে একগাল হাসি হেসে বলল, 'তুমি সত্যি রসিক লোক। তোমার রসবোধ আমার মতই। মৃত্যুর সামনেও বেপরোয়া।'

হেলিকপ্টারের ভিতরটা এমনিতেই গরম ছিল। ওরা যত এগোচ্ছিল গরম ততই বাড়ছিল। ঘেমে নেয়ে উঠল ওরা তিনজনই। আগ্নেয়গিরির চারদিক যখন হেলিকপ্টারটা চক্কর দিয়ে এল তখন শহীদের মনে হল যেন আর একটু পরে সেদ্ধ হয়ে যাবে সে।

পাহাড়ের পাদদেশে অসংখ্য বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছিল। হেলিকপ্টারটা নিচের দিকে নামতেই এখানে-সেখানে দুচারজন লোকও দেখা গেল।

মমতাজ বেতারে জানালঃ 'অ্যাকশন গ্রুপ-ফোরের কমাণ্ডার ডিরেক্টর অব অপারেশনের কাছে রিপোর্ট করতে নেমে আসছে,' কয়েকবার বলল সে কথাটা।

ফাঁকা একটা জায়গায় ভূমি স্পর্শ করল হেলিকপ্টারটা। প্রথমে মাটিতে নামল মমতাজের রিভলভারধারী স্যাঙাত। তারপর শহীদ ও কুয়াশা। তার পিছনে মমতাজ। বাইরেও প্রচণ্ড গরম।

সামনে বিরাট একটা দালান দেখিয়ে মমতাজ বলল, 'এইটে হচ্ছে আমাদের হেড-কোয়ার্টার। এখানে গ্রীন-হাউজও আছে।'

শহীদ বলল, 'এখানে যা গরম! গ্রীন-হাউজের মধ্যে গরম কেমন, কে জানে।'

'চীফ তোমাদের অপছন্দ করলে গরম কাকে বলে তা টের পাবে,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল মমতাজ।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেটা আপনা-আপনি খুলে গেল। শহীদ ও কামালকে মমতাজ নিয়ে হাজির করল একটা উঁচু যন্ত্রের সামনে। যন্ত্রটার উপরের দিকে একটা বিরাটাকার টেলিভিশন সেট। একটা নয় পাশাপাশি দুটো পর্দা। দুটো পর্দারই ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা গোলাকার হ্যাণ্ডেল বেরিয়ে আছে। নিচে অসংখ্য নব, বোতাম, মিটার আর ফুটকির মত কাঁচের লাল, নীল ও সবুজ আলো।

মমতাজ বিজ্ঞের মত বলল, 'এইটাই হচ্ছে আমাদের চীফ।'

'এটাই চীফ, মানে? এগুলো তো দুটো ঢাউস টেলিভিশন সেট।'

আবার হাসি ফুটল মমতাজের মুখে। সে বলল, 'তোমরা আস্ত গণ্ডমূর্খ। এটা টেলিভিশন সেট নয়। এটা হল ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতা নির্ণয়ক যন্ত্র। সাহসও নির্ণয় হয় এই যন্ত্রে। লড়াই-এর ক্ষমতাও। অর্থাৎ এটা হচ্ছে মন পরীক্ষার যন্ত্র।'

যন্ত্রটার সামনের একটা ক্রস চিহ্নিত জায়গা দেখিয়ে মমতাজ শহীদ ও কুয়াশাকে বলল, 'ওখানটায় গিয়ে দাঁড়াও দুজন। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও তাহলে

আমাদের সভায় স্থান পাবে, ফেল করলে বুঝতেই পারছ।'

দুজন গিয়ে ক্রশ চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়াল। সঙ্গের গার্ড দাঁড়াল ওদের পিছনে।

কুয়াশা শহীদের কানে কানে বলল, 'কায়মনোবাক্যে ওই যন্ত্রটাকে ঘৃণা কর। ভাবতে থাক যে, ওটা তুমি ভেঙে ফেলতে চাও। যন্ত্রটার প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই যেন তোমার মনে জায়গা না পায়।'

মমতাজ পরপর কয়েকটা বোতাম টিপতেই মন পরীক্ষা যন্ত্রের পর্দা দুটোতে আলো জ্বলে উঠল। মাঝখানের হ্যাণ্ডেল দুটোও একটু একটু করে ঘুরতে লাগল।

শহীদ ও কুয়াশা মনে মনে বলতে লাগল, 'আমি ঘৃণা করি···ঘৃণা করি এই যন্ত্রটাকে। এটাকে আমি ভেঙে ফেলব। চূর্ণ-বিচূর্ণ করব।'

শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল যন্ত্রের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পর ওদের দুজনেরই মনে হতে লাগল, ওদের মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা দানা বেঁধে উঠছে। সূচোল কোন বস্তু যেন ওদের মস্তিষ্কে অবিরাম খোঁচাচ্ছে।

মাথা ঘুরতে লাগল দুজনেরই। কুয়াশা নিজেকে সামলে নিল কিন্তু শহীদ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বলে উঠল, 'উহ্, মাথায় কি যেন হল আমার!'

সুইচ অফ করে মমতাজ বলল, 'ওটা কিছু নয়। এখুনি জানা যাবে কি হয়েছে তোমাদের মাথায়। চীফ এখুনি জানিয়ে দেবে।'

অন্য একটা সুইচ টিপল মমতাজ। লম্বা সরু একটা ফোকরের ভিতর থেকে একখণ্ড টাইপ করা কাগজ বেরিয়ে এল।

কাগজটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল মমতাজ।

কুয়াশা শহীদের কানে কানে বলল, 'চীফ যদি গোলমেলে রিপোর্ট দেয় তাহলে বদমাশটার হাড় ভেঙে দেবে। ওই পাহারাদারটাকে কায়দা করতে আমার বেগ পেতে হবে না। থাকুক না ওর হাতে রিভলভার।'

মমতাজ হাসিতে বিগলিত হয়ে বলল, 'খুব ভাল, মানে চমৎকার খারাপ রিপোর্ট দিয়েছে চীফ। দুজনেরই মনে চমৎকার নিষ্ঠুরতা আছে। লড়াই-এর শক্তিও চমৎকার, আর দরকার হলে দুজনই ধ্বংস-যজ্ঞ সৃষ্টি করতে সক্ষম। মন খুলে তোমাদের দুজনকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি।' দুজনই অসম্মানের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। মানব-ধ্বংসী মহাসভায় দুজনকেই স্বাগতম জানাচ্ছি।'

কিন্তু মুখে যতটাই হাসি লেগে থাকুক না মমতাজের সে চীফের রিপোর্ট পুরোটাই ওদের বলেনি। রিপোর্টটাতে লাল কালিতে ক্যাপিটাল লেটারে যে সতর্কবাণী লেখা ছিল তাতে বলা হয়েছে, 'তাদের অভূতপূর্ব লড়াই-এর ক্ষমতাই শুধু নেই তাদের বুদ্ধিও প্রথম শ্রেণীর। যদি ওদের বুদ্ধি এই সংস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় তাহলে ওরা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও দুজনকে কড়া নজরে রাখতে হবে।'

'তাহলে, তাহলে আমরা দুজনই পাস করেছি, অ্যাঁ মমতাজ মিয়া?' কুয়াশা খুশির ভান করে বলল।

'উঁহুঁ, আমি এখন আর মমতাজ মিয়া নই। তোমাদের কমাণ্ডার। আমাকে কমাণ্ডার বলে ডাকতে হবে।'

'ঠিক আছে, কমাণ্ডার।'

রিপোর্টটা মমতাজ আবার মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে বলল, 'চল এখন।'

'এবারে কোথায়?'

'এখন আমরা ডিরেক্টরের সাথে দেখা করতে যাব।'

রুমটা থেকে বেরিয়ে কয়েকটা দরজা পেরিয়ে আর একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

দরজার উপর একটা সবুজ আলো জ্বলছিল। মমতাজ সেটা দেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমরা ঢুকতে পারি। সবুজ বাতি জ্বলছে। শোন, ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেবে। ডিরেক্টর আবার গরম মোটেও সইতে পারেন না। ভিতরে অবশ্য গরম নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।'

দরজার পাশে দুটো বোতাম দেখা যাচ্ছিল। তার একটা টিপল মমতাজ।

ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এস। আর এসেই দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

মমতাজ দরজাটা আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল। ভিতরে ঢুকল প্রথম সে-ই। তার পিছনে ঢুকল শহীদ ও কুয়াশা। মমতাজ দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ভিতরটা চমৎকার একটা গ্রীন-হাউজ। ছোট বড় টবে অসংখ্য ছোট ছোট গাছ। মাঝারি আকারের দুচারটে আছে। দুজন লোক রয়েছে শুধু। একজন ওদের দিকে পিছন ফিরে উবু হয়ে বসে ফর্ক দিয়ে একটা টবের মাটি খোঁচাচ্ছে। অন্যজন একটা ট্রের উপর নানা আকার ও আকৃতির কয়েকটা কাঁচি, ফর্ক ও কাস্তে নিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চেহারা মঙ্গোলীয় ধাঁচের। বয়স বেশি হলে তিরিশ। মজবুত দেহ। কুটিল দৃষ্টি।

কতকগুলো গাছে ফুল ফুটেছে। মাঝখানে একটা মাঝারি আকারের গাছ। তাতে পাতা নেই একটাও। কিন্তু বটের ঝুড়ির মত অনেকগুলো ঝুড়ি নিচে নেমে এসেছে।

কুয়াশা গাছটা দেখে চমকে উঠল। হাওয়া নেই গ্রীন-হাউজের মধ্যে কিন্তু ঝুড়ির ডগাগুলো লকলক করে নড়ছে।

সে শহীদের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'এখানেও তো বেশ গরম আর আর্দ্র। অনেকটা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলের মত আবহাওয়া।'

মমতাজ গ্রীন-হাউজে ঢুকেই বদলে গেল। কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে আনত হয়ে বলল, 'অ্যাকশন গ্রুপ ফোরের কমাণ্ডার মমতাজ উদ্দিন। আমার অভিযান সফল

হয়েছে, স্যার।'

'বেশ বেশ। আমি খুব খুশি হয়েছি,' লোকটা মুখ না ফিরিয়েই বলল।

মমতাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা নীরবে গাছের পরিচর্যা করে যেতে লাগল।

'আরও কিছু বলবে নাকি?' একটু পরে লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'দেখছ না ব্যস্ত আছি আমি?'

'নতুন দুই রং-রুটকে আপনার সাথে দেখা করাতে এনেছি, স্যার। দুজনেরই চমৎকার খারাপ রিপোর্ট পেয়েছি চীফের কাছ থেকে।'

উঠে ঘুরে দাঁড়াল ডিরেক্টর। শহীদ ও কুয়াশাকে একনজর দেখে নিয়ে সে বলল, 'আমি দেখেছি রিপোর্ট। কি যেন নাম, কালু মিয়া আর রাজা মিয়া।'

চশমা-পরা লোকটা। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেলেও শক্তসমর্থ দেহ। হাস্যময় দেবতাসদৃশ চেহারা। চোখ দুটো দিয়ে স্নেহ ঝরে পড়ছে।

অথচ শহীদ জানে, কুয়াশা জানে দুনিয়ার যত পাষণ্ড জন্মেছে এ লোকটা তাদেরই একজন।

ডিরেক্টর এগিয়ে এসে হাতের ফর্কটা নাচাতে নাচাতে বলল, 'মনে হচ্ছে, রাজা মিয়া বিরল উদ্ভিদে অত্যন্ত উৎসাহী। তোমার কথাই ঠিক। এই উদ্ভিদগুলো সবই এনেছি দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল থেকে। এগুলো আমার অত্যন্ত গর্বের ধন।'

কুয়াশা ডিরেক্টরের কথা শুনছিল। হঠাৎ তার মনে হল তার গলাটা কি যেন পেঁচিয়ে ধরেছে। ঠাণ্ডা কি একটা বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল সে এবং দেখতে পেল একটা লতা তার গলায় ততক্ষণে পাক দিয়ে ফেলেছে। এক সেকেণ্ডও দেরি করল না কুয়াশা। ডিরেক্টরের সহকারীর হাতে ধরা ট্রে-টা থেকে একটা কাস্তে নিয়ে ঘ্যাচ করে কেটে ফেলল সে লতাটা।

ডিরেক্টর অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। হতাশার ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

গলা থেকে সাপের মত লতাটা এক টানে খুলে ফেলল শহীদ। গম্ভীর মুখে ডিরেক্টর সেটা হাতে নিয়ে বলল, 'আহ্, এমন চমৎকার লতাটা তুমি শেষ করে ফেললে! ট্রেনভিলটাতে ফুল দেবার সময় এসেছিল। নষ্ট করে ফেললে তুমি!'

কুয়াশা কাস্তেটা ট্রের উপর রেখে দিয়ে গলাটা ডলতে ডলতে বলল, 'কিন্তু ওটা তো আমায় খুন করতে যাচ্ছিল। ওটা তো মানুষ-খেকো লতা।'

ডিরেক্টরের চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলে উঠল। চেহারায় ফুটে উঠল নিষ্ঠুরতার ছাপ। কঠিন দৃষ্টিতে সে কুয়াশার দিকে তাকাল।

ডিরেক্টরের সহকারী ট্রে নামিয়ে রেখে রিভলভার বের করে কুয়াশার দিকে তাক করে দাঁড়াল।

ভয়ে কাঁপতে লাগল মমতাজ উদ্দিন।

ডিরেক্টর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'মাত্র একটা জিনিসই তোমাকে বাঁচিয়েছে। তোমার বিপদের উপলব্ধি চিন্তার চাইতেও দ্রুত। এমন লোক এর আগে আমি একজনও দেখিনি। মানব-ধ্বংসী-মহাসভার এই রকমই একজন লোক দরকার। আমি মত বদলাবার আগেই আমার সামনে থেকে দূর হও।'

মমতাজ ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, যাই স্যার। এই, জলদি চলে এস তোমরা।'

বাইরে গিয়ে মমতাজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। 'ওফ' জাতীয় একটা শব্দ করে মমতাজ বলল, ওই বদমাশটা, মানে ডিরেক্টরের সেক্রেটারি জাকের আলী তোমাদেরকে খুন করত, আমাকেও করত।'

শহীদ ও কুয়াশা নীরব রইল।

মমতাজ শহীদ ও কুয়াশাকে কম্পিউটার-রূমের ভিতর দিয়ে অন্য একটা রূমে নিয়ে গেল। রূমটা বিরাট। সমস্ত রূম জুড়ে যন্ত্র আর যন্ত্র। খুব উঁচু রূমটা। চারপাশেই ঝুলানো বারান্দা। সেখানেও নানারকম যন্ত্রপাতি। কয়েকজন লোক সেখানেও কাজ করছে। নিচেও কর্মব্যস্ততা, সবাই যেন খুব ব্যস্ত। রূমের প্রত্যেকটা লোকেরই সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। কোমরের বেল্টের খাপে রিভলভার। অনেকগুলো টেলিভিশন সেট রূমের মধ্যে। প্রত্যেকটার সামনে একজন করে বসা।

'এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলরূম।'

'বাহ্! অনেক যন্ত্রপাতি তো।' বোকার ভান করে তারিফ করল কুয়াশা।

'তুমি একটা আস্ত বুরবাক। কন্ট্রোলরূমে যন্ত্রপাতি থাকবে না তো কি থাকবে? এই দ্বীপে কোথায় কি হচ্ছে সব জানা যাচ্ছে এখান থেকে। ওই দেখ না টেলিভিশন সেটগুলো। কোথায় কি ঘটছে সবই ওর পর্দায় ধরা পড়ছে। চল এবার।

'এখন আবার কোথায়।'

'আগ্নেয়গিরিতে। সেখানেই তো আসল জিনিস দেখতে পাবে হে।'

কন্ট্রোলরূম থেকে সরু প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে তারা একটা বিরাট লোহার গেটের সামনে দাঁড়াল।

রিভলভার হাতে একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়িয়ে। তাকে দরজা খোলার ইশারা করে মমতাজ পকেট থেকে দুটো ব্যাজ বের করে কুয়াশা ও শহীদকে দিয়ে বলল, 'তোমাদের তো এখনও ইউনিফর্ম দেয়া হয়নি। তাই আমাদের লোকেরা তোমাদেরকে ক্রীতদাস বলে মনে করতে পারে। এই ব্যাজগুলো পরে নাও। এগুলো হচ্ছে রেডিও অ্যাকটিভ ব্যাজ। তোমরা কোথায় আছ, আর কি অবস্থায় আছ এই ব্যাজ পরা থাকলে তা আমরা বুঝতে পারব। বাহুতে পরে নাও ব্যাজগুলো।'

শহীদ ও কুয়াশা ব্যাজ দুটো পরল। তাতে লেখা আছে 'এম. এম.।' একটার নাম্বার তেরো, একটার চোদ্দ। কুয়াশা তেরো নাম্বারটা পরল।

বিশাল লোহার গেট খুলে ফেলেছিল প্রহরী। শহীদ ও কুয়াশা ভিতরে ঢুকল। গরম সেখানে আরও বেশি।

ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল ওরা। সেখানে এক এলাহী কাণ্ড-কারখানা চলছে। পানির ট্যাঙ্কের মত উঁচু বিরাট একটা টাওয়ার। তার মাথাটা সোজা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বরাবর।

মোটা অত্যন্ত মজবুত লোহা দিয়ে তৈরি টাওয়ারটা। অসংখ্য লোক ভিতরে কাজ করছে। কয়েকজনের পরনে কালো পোশাক, হাতে রিভলভার। অন্য লোকগুলো নোংরা, ছেঁড়া কাপড় পরা। সবাই কর্মব্যস্ত। কুয়াশা একনজর দেখেই বুঝতে পারল এই বিশালকায় যন্ত্রদানবটা হচ্ছে রকেট ও পারমাণবিক বোমা ঠেকাবার জন্য লেসার বীম প্রজেক্টর। আগ্নেয়গিরির তাপ-শক্তির সাহায্যে এটাকে কাজে লাগানো হবে।

উপরের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে প্রজেক্টরটা। সিঁড়ি বেয়ে লোকজন ওঠানামা করছে। লোহা পেটাবার শব্দ হচ্ছে। চিৎকার করে একে অন্যকে নানারকম নির্দেশ দিচ্ছে। অসংখ্য শক্তিশালী বিদ্যুৎ-বাতির আলোয় একদম চূড়া পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য স্থান থেকে সামান্য ধোঁয়া বেরোলেও তা জ্বালামুখের ভিতরটাকে অন্ধকার করে রাখতে পারেনি।

শহীদ অনুমান করল, যন্ত্রের চূড়াটা একশো ফুট উঁচু তো হবেই। চতুষ্কোণ কাঠামোর প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে একটা গোল সিলিণ্ডার। তার নিচের তিনটে সরু সিলিণ্ডার একদম নিচের অন্ধকারে নেমে গেছে। উপরের সিলিণ্ডারের চারদিকে কয়েকটা মোটা গোল চাকা। যন্ত্রের ডগাটা অনেকটা গম্বুজের মত। মোট চারটে স্তর। প্রত্যেকটা স্তরের চারদিকে রেলিং-ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাজ করছে লোকগুলো। রেলিং-এর বাইরেও কাজ করছে কয়েকজন। মোটা তারের কতকগুলো ঝুলন্ত গার্ডারে দাঁড়িয়েও কয়েকজন লোক একমনে কাজ করে চলেছে। কারও হাতে হাতুড়ি, কারও হাতে প্লায়ার্স, কারও হাতে রাঁদা।

নির্বোধের মত চেহারা করে কুয়াশা অনেকক্ষণ ভিতরটার সবকিছুই দেখে নিল। তারপর মমতাজকে বলল, 'কমাণ্ডার, এগুলো কি হচ্ছে এখানে? পানির ট্যাঙ্ক নাকি? এর সাথে আমাদের জাহাজ লুটের সম্পর্কটাই বা কি?'

মমতাজ সমঝদারের মত ভঙ্গি করে বলল, 'সম্পর্কটা একেবারে জলের মত পরিষ্কার। আমরা এই দ্বীপটা দখল করে তার বাসিন্দাদের ক্রীতদাস বানিয়েছি। ওদের সংখ্যা হবে তিন-চার হাজার। ওদেরও তো খেতে দিতে হবে? তাই তো আমরা খাবার-ভর্তি জাহাজ লুটে নিয়ে আসি। তাছাড়া জাহাজের লোকগুলোকেও কাজে লাগাচ্ছি আমরা।'

'হুঁ,' মাথা নেড়ে কুয়াশা বলল। 'এবারে বুঝলাম। কিন্তু আগ্নেয়গিরির মাঝখানে পানির ট্যাঙ্ক কেন?'

'তুমি সত্যি একটা গণ্ডমূর্খ। ওটা ট্যাঙ্ক নয়। অন্য জিনিস। কিন্তু কি ওটা তা বলা নিষেধ আছে। ডিরেক্টর ছাড়া নতুন লোকদের ওকথা বলার অধিকার কারও নেই।'

পিছনে গলার আওয়াজ পেয়ে ওরা তিনজনই ফিরে তাকাল।

শহীদ চমকে উঠল। দুজন সঙ্গীনধারী প্রহরীর সঙ্গে এস. এস. জলযানের কয়েকজন অফিসার ও খালাসী আসছে। সকলের আগে কামাল, তার পিছনে ক্যাপ্টেন গোলজার আহমদ, বোসান আমীরগুল, এঞ্জিনিয়ার শেখ, খালাসী সোনাউল্লাহ, আরও অনেকে।

একগাল হাসি হেসে মমতাজ বলল, 'এই যে, আরও কয়েকজন ক্রীতদাস এসেছে। জলযানের লোক।'

শহীদ ও কুয়াশাকে দেখে কামাল থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। প্রহরী ছিল তার পাশেই, সে কামালের নিতম্বে একটা লাথি মেরে বলল, 'চল, দাঁড়ালি কেন?'

কামাল বোধ হয় আকস্মিক লাথি খাবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়ে গেল। কুয়াশার চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলে উঠল। কিন্তু সে এগোবার আগেই আর একটা লাথি হাঁকাল তাকে প্রহরী।

কুয়াশা ও শহীদ দুজনেই একসঙ্গে নড়ে উঠল। কিন্তু এগোবার আগেই নড়ে উঠল দীর্ঘদেহী কদাকার আমীরগুল। সে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রহরীর চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল এবং নাবিকসুলভ ভাষায় একটা শপথ বাক্য উচ্চারণ করল। প্রহরী এমন আকস্মিক আক্রমণ আশা করেনি। সে 'আক' জাতীয় একটা শব্দ করে পড়ে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরী চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার!'

রিভলভার বাগিয়ে এগিয়ে এল সে।

মমতাজের হাতেও রিভলভার ঝিলিক মারল। পড়ে যাওয়া প্রহরীও উঠে দাঁড়াল। সে-ও রিভলভার উদ্যত করল আমীরগুলের দিকে।

কুয়াশা আর শহীদের মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। কুয়াশা তার ডান পা'টা তুলে গোড়ালি চুলকাতে লাগল। কামাল ওদিকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে। অপাঙ্গে তার দিকে একবার তাকাল শহীদ। কামালের জন্য শহীদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে যে অসুস্থ ছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। চোখ-মুখ বসে গেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

অতগুলো রিভলভারের সামনেও বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমীরগুল।

মমতাজ প্রহরীদের রিভলভার নামাতে ইঙ্গিত করে বলল, 'আবে শালা

মাকরানী, বদমায়েশি করার আর জায়গা পাসনি! তোকে এখুনি শেষ করব।'

শহীদের মনে হল যেন আমীরগুলের কদাকার মুখে জ্যোতির্ময় হাসি ফুটে উঠল।

কুয়াশা আগেই তার পা নামিয়েছিল। মমতাজ তার হাতে নিজের রিভলভারটা দিয়ে বলল, 'গুলি কর ওকে, রাজা মিয়া। এটাই হল তোমার উপর মহাসভার প্রথম নির্দেশ।'

রিভলভারটা হাতে নিয়ে কুয়াশা আমীরগুলের মুখের দিকে তাকাল। তার মুখটা ততক্ষণে ঘৃণায় আরও কদাকার হয়ে উঠেছে। সে বাঁ হাতের তর্জনী কুয়াশার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নরক-কীটের উপযুক্ত কাজই বটে।'

কুয়াশা এক সেকেণ্ড রিভলভারটা হাতের তালুর উপর রেখে ওজনটা অনুভব করে আমীরগুলের দিকে তাক করল।

তারপর ট্রিগার টিপল কুয়াশা।

ক্লিক করে একটা শব্দ হল।

মমতাজের মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, 'চমৎকার, চমৎকার! কিন্তু ভুলটা আমারই। গুলি ভরতে ভুলেই গিয়েছিলাম। যাকগে, আমীরগুলকে পরে গুলি খাওয়া যাবে। এখন থাক। গার্ড, ওদের কাজে নিয়ে যাও?'

আমীরগুল ঠোঁট বাঁকাল।

মমতাজ বলল, 'চল এখন।'

'এখন আবার কোথায়?'

'তোমাদের কোয়ার্টারে। এস আমার সঙ্গে।'

শহীদ কুয়াশার কানে কানে বলল, 'গুলি যে ছিল না তা তুমি জানতে?'

'ওজন নিয়েই বুঝেছিলাম, গুলি নেই। মমতাজ আমাকে পরীক্ষা করছে শুধু। গুলি থাকলে ওটা অবশ্য মমতাজের বুকেই ঢুকত। তারপর দেখা যেত।'

কুয়াশা ও শহীদের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসে দুজনই ঘাম মুছল। কিন্তু বাইরেও প্রচণ্ড গরম।

ঘর্মাক্ত কলেবরে দুজন শতচ্ছিন্ন প্যান্টপরা লোক দুটো লোহার বীম বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কুয়াশা তাদের দেখিয়ে মমতাজকে বলল, 'কমাণ্ডার, এই যে এমন গরমের মধ্যে লোকগুলোকে খাটাচ্ছ ওদের তো চেতনা হারিয়ে ফেলার কথা।'

মমতাজ সায় দিয়ে বলল, 'তা তো বটেই। সেই জন্যেই দুঘন্টার বেশি একনাগাড়ে কাউকে কাজ করানো হয় না,' একটা বন্ধ দরজা খুলে মমতাজ বলল। 'ঢুকে যাও। এটাই গার্ডদের কোয়ার্টার।'

শহীদ ও কুয়াশা ভিতরে ঢুকতেই ঠাণ্ডার একটা ঝলক ওদের গায়ে যেন প্রীতির পরশ বুলিয়ে দিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঝকঝকে তকতকে রূমের মধ্যে

দুপাশে দুটো ডিভান।

মমতাজ বলল, 'বিশ্রাম কর তোমরা। দু'ঘন্টা পরেই তোমাদের গার্ড দিতে যেতে হবে। গার্ডও আমরা দু'ঘন্টা পরপরই বদলাই। না হলে সব ক'টাই মারা যাবে। যাকগে, আমি চললাম। তবে হ্যাঁ, দু'ন্টার মধ্যে বাইরে যেয়ো না কিন্তু। খবরদার! আমরা সবাই এখন খুব ব্যস্ত আছি। কাল দুপুরের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। মধ্যে কোন উটকো ঝামেলা বাধালে ডিরেক্টর ক্ষমা করবে না।'

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মমতাজ।

সাত

মমতাজ বেরিয়ে যেতেই শহীদ বলল, 'কাল দুপুরের মধ্যে বদমাশগুলো কি ঘটাবে কে জানে। ভয়ানক কিছু যে করবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কি যে করি কিছু বুঝে উঠতে পারছিনে।'

কুয়াশা রূমটার চারদিক দেখছিল। পিছনের দরজাটার দিকে তার নজর পড়তেই সে বলল, 'সামনের দরজায় নিশ্চয়ই পাহারা আছে। চল, এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সময় নষ্ট করা চলবে না। দরকার হলে ঝুঁকি নিতে হবে।'

দরজার উপর বড় বড় করে লেখা ছিল 'হুকুম ছাড়া এই দরজা ব্যবহার করা নিষেধ'। শহীদ লেখাটা দেখিয়ে বলল, 'দেখেছ লেখাটা?'

'দেখেছি। তবু একবার চেষ্টা করতে হবে।'

দরজা খুলতেই দেখা গেল পাহাড়ী একটা সুড়ঙ্গ। মাথার উপর কিছুদূর পরপর উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে।

শহীদ বলল, 'মনে হচ্ছে কন্ট্রোলরূমের দিকে গেছে পথটা।'

'চল দেখাই যাক।'

বিশ গজ দূরে সুড়ঙ্গটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ ডাইনে, একটা বাঁয়ে।

দুজন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

শহীদ ফিসফিস করে প্রশ্ন করল, 'কোনদিকে যেতে চাও?'

উবু হয়ে বসে সুড়ঙ্গের ধুলো পরীক্ষা করল কুয়াশা। বলল, 'বাঁয়ের পথটাতেই চলাচলের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কন্ট্রোলরূম থেকে দূরে যেতে পারব আমরা ওই পথেই। চল যাওয়া যাক।'

কিন্তু আর এগোতে পারল না ওরা। ওদের ঠিক তিনদিকে তিন সারি মোটা লোহার শিক ফুঁড়ে উঠল মাটি থেকে।

শহীদ বলল, 'সর্বনাশ! আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি।'

ঘটনার আকস্মিকতায় কুয়াশাও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'তাই তো! এ তো মুস্কিলের ব্যাপার হল! আমার কাছে মিনি আল্ট্রাসোনিক্স বাক্স আছে।

তাতে রড কেটে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু তারজন্যে যে সময় লাগবে তাতে লোকজন এসে পড়বে। তাছাড়া ওরা বুঝে ফেলবে আমাদের অভিসন্ধি।'

'তাহলে উপায়?'

'আমরা লাফ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারি। উঁহুঁ, রডগুলোতে নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। দেখি রাখ।'

কোমরের বেল্ট থেকে সে একটা ছুরি বের করে সেটা খুলে রডের কাছে আস্তে করে ছুঁড়ে দিল। ছুরিটা দুটো রডে সটান লেগে গেল। জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দেখা দিল। একটা পাথর তুলে ছুরিটার উপর ছুঁড়ে মারতেই সেটা মাটিতে পড়ে গেল।

কুয়াশা ছুরিটা বন্ধ করে কোমরের বেল্টে ঢোকাতে ঢোকাতে চিন্তাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'সত্যি, আমরা ধরা পড়ে গেছি। বোধহয় কোনদিকেই যেতে পারব না আর।'

চিন্তা করতে লাগল সে। রডগুলোর উচ্চতা সমান নয়। মাঝখানেরটা সবচেয়ে বড়। সেটার দুপাশেরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে।

কুয়াশা বলল, 'একটা কাজ করা যায়, পারবে? এই একটাই মাত্র পথ আছে মুক্তি লাভের।'

'কি?'

কুয়াশা অনেকটা পিছিয়ে এসে বলল, 'আমি যা করব তাই করবে। খবরদার, শুধু মাঝখানের রডটা ছাড়া আর কোন রডই স্পর্শ করবে না। তাহলে বিদ্যুৎ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'দেখলেই বুঝবে।'

কুয়াশা দৌড়ে গিয়ে মাঝখানটার রডের মাথা চেপে ধরে সমস্ত শরীরটা পাক খাইয়ে বৈদ্যুতিক বেড়াটার ওপারে গিয়ে নেমে পড়ল।

উঠে দাঁড়িয়েই কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু খবরদার, অন্য কোন রড়ে যেন এতটুক স্পর্শ না লাগে।'

'লাগবে না।'

সেন্ট্রাল কন্ট্রোলরুমে তখন অন্য এক দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছিল। মনিটর টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ পর্দার উপর ভেসে উঠল কুয়াশা ও শহীদের ছবি।

মনিটর চমকে উঠল প্রথমে, তারপর বেআইনী অনুপ্রবেশ-কারীদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। শহীদ ও কুয়াশা সুড়ঙ্গ-পথের মোড়ে পৌঁছুতেই একটা

বোতাম টিপে দিল। তিনটে মোটা লোহার শিকের বেড়া মাটি ফুঁড়ে উঠল।

একটা ধূর্ত-হাসি হেসে মনিটর উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে অবস্থিত হটলাইনের বোতাম টিপতেই লাউড-স্পীকারে ডিরেক্টরের কণ্ঠ শোনা গেল, 'ইয়েস।'

'একশো পঁচিশ বলছি কন্ট্রোল থেকে। পাঁচ নাম্বার সেক্টরের ফাঁদে নতুন রং-রুট দু'জন আটকে পড়েছে।'

'ওদের জ্যান্ত ধরে ডেথ-চেম্বারে পাঠিয়ে দিতে বল।'

'দিচ্ছি, স্যার।'

মনিটর হটলাইনের সুইচ অফ করে মাইক্রোফোনে ডিফেন্স স্কোয়াডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। ধীরে-সুস্থে নিজের আসনে ফিরে আসতেই সে ভীষণভাবে চমকে গেল। টেলিভিশনের পর্দায় বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের কোন চিহ্নই নেই। বৈদ্যুতিক বেড়ার ভিতরটা ফাঁকা। তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

তিরিশ সেকেণ্ড পর টেলিভেশনের পর্দায় ডিফেন্স স্কোয়াডকে সুড়ঙ্গ-পথে ফাঁদের দিকে এগোতে দেখা গেল। স্কোয়াডে ছিল পাঁচ-ছয়জন লোক। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। লীডারের হাতে একটা পোর্টেবল রেডিও-ট্রান্সমিটার।

লোহার বেড়ার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ডিফেন্স স্কোয়াড। তাদের বিস্মিত ও বিরক্তিপূর্ণ চেহারা ফুটে উঠল টেলিভিশনের পর্দায়।

পরিণাম বিবেচনা করে শিউরে উঠল মহাসভার একশো পঁচিশ নাম্বার সদস্য। একটু পরে লাউড-স্পীকারে ভেসে এল, 'কন্ট্রোলরুম?'

'হ্যাঁ,' একশো পঁচিশ নাম্বার বলল।

'ফাঁদে তো কেউ নেই! গাঁজা খাচ্ছিলে, না ইয়ার্কি মারছিলে?'

'জ্বি, মানে হ্যাঁ...মানে না, লীডার। ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু সত্যি দুজন ওখানে ঢুকেছিল।'

'চুপ, ইডিয়ট! ছিল তো গেল কোথায়? ওখান থেকে বেরোবার বাপের সাধ্য কারও আছে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, না স্বপ্ন দেখছ? এবারে মাফ করে দিলাম। ফের এমনটি করলে ডেথ-চেম্বারে পাঠিয়ে দেব।'

গার্ড-কোয়ার্টারে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল শহীদ ও কুয়াশা।

শহীদ বলল, 'সুড়ঙ্গে আমাদের উপস্থিতি কি করে টের পেল বুঝতে পারছিনে।'

'আমরা কখন কোথায় আছি তা বোঝবার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছে ওরা। কি করে জানছে, সেটা আমাদের জানতে হবে। তার আগে আমাদের এই কোয়ার্টার থেকে বেরুনো চলবে না। তা বেশিক্ষণ তো আর নেই।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে গেল কুয়াশা।

শহীদ তা লক্ষ করে বলল, 'কি হল?'

'দেখেছ, ঘড়ির কাঁটা আর অঙ্কগুলো কেমন জ্বলছে? তার মানে ঘড়ির কাছেই

কোথাও রেডিও একটিভিটি রয়েছে। এখন বুঝতে পারলাম, আমাদের হাতের ব্যাজে যে রেডিও একটিভিটি রয়েছে তা দেহের গরমে উত্তপ্ত হয়ে তরঙ্গের মত ছড়িয়ে গিয়ে কোন মেশিনে ধড়া পড়ে। সেখান থেকে টিভির পর্দায় দেখা যায় সবকিছু।'

'তাহলে আমাদের উপর নজর রাখবার জন্যেই ব্যাজগুলো দিয়েছে ওরা?'

'হ্যাঁ। আসলে আমরাও ওই ক্রীতদাসগুলোর মতই বন্দী। এখন আমাদের এই ব্যাজগুলোকে প্রতারণা করার কৌশল বের করতে হবে,' কুয়াশা জবাব দিল।

দরজাটা খুলে গেল। দুজন গার্ড ভিতরে ঢুকে বলল, 'যাও, তোমাদের ডিউটি শুরু হয়েছে।'

'কোথায় ডিউটি দিতে হবে?'

'আগ্নেয়গিরির মধ্যে। এই নাও রিভলভার।'

দুজনের হাতে একটা করে রিভলভার দিয়ে বলল, 'যাও, আর দেরি কোরো না।'

পথে শহীদ কুয়াশাকে বলল, 'তাহলে, শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করে ওরা আমাদের রিভলভার দিয়েছে।'

কুয়াশা হেসে বলল, 'কিন্তু বুলেট তো দিয়েছে মাত্র একটা করে মোট দুটো! ও দুটো ফুরিয়ে গেলেই আঙুল চুষতে হবে।'

অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে ওরা চতুর্থ স্তরে উঠে গেল।

শহীদ বলল, 'ব্যাপারটা কি হচ্ছে বলতে পার?'

কুয়াশা বলল, 'এটা হচ্ছে একটা লেসার বীম প্রজেক্টর। সিলিণ্ডারের ভিতরে আছে রকেট অথবা আণবিক বোমা। নিশ্চয়ই ওটা কোথাও নিক্ষেপ করা হবে। যতদূর মনে হচ্ছে কাল দুপুরেই এই ভয়ঙ্কর কাজটা করবে ওরা। তার আগেই ধ্বংস করতে হবে ওদের।'

পাশেই চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল কুয়াশা। রেলিং-এর বাইরে একটা অপ্রশস্ত গার্ডারের উপরে নাজুকভাবে দাঁড়িয়ে এবং একটা ঝুলন্ত গার্ডারে বাঁ হাত রেখে দাঁত-মুখ খিচোচ্ছে আমীরগুল একজন রক্ষীর দিকে লক্ষ করে।

রক্ষীটা আমীরগুলকে কুৎসিত একটা গালি দিয়ে বলল, 'কাজ কর, বেটা।'

'তবে রে…!' স্থানকাল ভুলে শূন্যে একটা লাফ দিল আমীরগুল।

শিউরে উঠে চোখ বুজল শহীদ। এখুনি একশো ফুট নিচে পড়ে গিয়ে আমীরগুলের সর্বাঙ্গ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

অস্ফুট একটা শব্দ শুনে চোখ খুলতেই দেখল কুয়াশা তার ডান হাতের চার আঙুলে গার্ডারটা চেপে ধরেছে সে, আর বাঁ হাতে ধরে আছে আমীরগুলের একটা হাত। কুয়াশার আঙুলগুলো গার্ডার থেকে সরে গেলে দুজনেই মরবে।

শহীদ বলল, 'চেপে ধর ভাল করে। আমি দুজনকেই টেনে তুলছি।'

'না না।' চিৎকার করে উঠল কুয়াশা, 'তাহলে তুমিও মরবে। ওই ঝোলানো গার্ডারটা যতটা সম্ভব নিচে নামাও, তাড়াতাড়ি।'

শহীদ দেরি করল না। সে কপিকল ঘুরিয়ে গার্ডারটা নিচে নামাতে লাগল।

রক্ষীটা বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু শহীদ চোখ গরম করে বলল, 'গোলমাল করলে তোকে সুদ্ধ নিচে ছুঁড়ে দেব। কমাণ্ডার বলেছে, ওই লোকটার বিশেষ দরকার আছে।'

কি মনে করে রক্ষী আর ঝামেলা বাড়াল না। সে অন্যত্র চলে গেল।

মাত্র চার আঙুলের উপর ভর দিয়ে একটা দশাসই লোকের ভার বহন করতে কষ্ট হচ্ছিল কুয়াশার। অবশ হয়ে আসছে তার হাত দুটো। এই বুঝি তার আঙুলগুলো ফস্কে গেল।

শহীদ শ্বাস বন্ধ করে কপিকল ঘুরিয়ে গার্ডারটা নামিয়ে আমীরগুলের কাছে পৌঁছে দিল। আমীরগুল বাঁ হাতে গার্ডার চেপে ধরে বলল, 'ব্যস, ধরেছি আমি।'

তার হাতটা ছেড়ে দিল কুয়াশা। বিস্মিত ও কৃতজ্ঞচিত্ত আমীরগুল সাবধানে গার্ডারের উপরে উঠে পড়ল। তার দেহের ভারে নড়াচড়ার ফলে গার্ডারটা অনেকটা দূরে সরে গিয়ে দুলতে লাগল। শহীদ আবার ধীরে ধীরে সেটা কুয়াশার আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসল। বাঁ হাতটা সাবধানে উপরে তুলে দিল কুয়াশা দোদুল্যমান গার্ডারটা ধরবার জন্য। হাতটা ধরে তাকে টেনে তুলল আমীরগুল।

গার্ডার থেকে সাবধানে মূল কাঠামোর বীমের দিকে এগিয়ে এল কুয়াশা ও আমীরগুল।

আমীরগুলের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। সে ডান হাত দিয়ে গাল চুলকে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি, তুমি আমার জীবন বাঁচালে। কিন্তু কেন?'

কুয়াশা নিচু গলায় বলল, 'শোন বন্ধু, আমি ও কালু মিয়া এই দস্যুদলকে ধ্বংস করতে এসেছি। তুমিও নিশ্চয়ই তাই চাও। আর এ ব্যাপারে তুমি আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। এখন সবটা ব্যাখ্যা করার সময় নেই কিন্তু কাজের সময়ে যেন তোমাকে পাই।'

আমীরগুল সকৃতজ্ঞ নয়নে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু এসব কি কাণ্ড ঘটছে তার তো মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে।'

কুয়াশা বলল, 'সময় যদি আসে, অবশ্যই জানতে পারবে। এখন কাজ করে যাও।'

যে রক্ষীটি শহীদের ধমক খেয়েছিল সে ফিরে এসে বলল, 'ডিউটি শেষ হলে কমাণ্ডার মমতাজের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ো। এটা তার আদেশ।'

ডিউটি শেষে কুয়াশা ও শহীদ যখন নিচে নামল তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

মমতাজ নিচে অপেক্ষা করছিল। সে ওদের দেখেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'তোমরা নাকি আমীরগুলকে বাঁচিয়েছ?'

কুয়াশা মাথা নাড়ল।

'কেন?'

কোন জবাব দিল না কুয়াশা।

'আচ্ছা, চল মজা দেখাচ্ছি।'

কথাবার্তার ফাঁকেই কুয়াশা লক্ষ করল মহাসভার বেশ কয়েকজন রিভলভারধারী সদস্য ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আর পিছনে রিভলভারের নল দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে আমীরগুলকে নিয়ে আসছে একজন।

মমতাজ নির্দেশ দিল, 'সেক্টর নাম্বার নাইন।'

'চল,' ধমকে বলল রিভলভারধারী এক রক্ষী।

কোনরকম প্রতিবাদ নিষ্ফল বিবেচনা করল কুয়াশা। কুয়াশা, শহীদ ও আমীরগুলকে নিয়ে মমতাজ সদলবলে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে গেল। বাইরেও প্রচণ্ড গরম ছিল কিন্তু সুড়ঙ্গের মধ্যে গরমটা যেন আরও বেশি। আরও একটু এগোতেই দেখা গেল অল্প অল্প ধোঁয়া পাক দিয়ে উঠছে।

এঁকেবেঁকে অনেকটা যাবার পর মমতাজের নির্দেশে থামল ওরা। বৈদ্যুতিক আলোকে সুড়ঙ্গের ভিতরটা আলোকিত। সেই আলোয় দেখা গেল একটা চতুষ্কোণ গহ্বরের ওপর মোটা লোহার রডের ঢাকনা। ওই গহ্বরের ভিতর থেকেই অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

মমতাজের এক স্যাঙাৎ এগিয়ে গিয়ে ঢাকনাটার তালা চাবি দিয়ে খুলে গহ্বরের মুখটা হাঁ করে দিল।

মমতাজ বলল, 'আগে ওই বদমাশ আমীরগুলকে নামিয়ে দাও।'

দুজন রিভলভারধারী আমীরগুলকে বলল, 'চল।'

'না, আমি নামব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল আমীরগুল।

মমতাজের নির্দেশে তিনজন গিয়ে চেপে ধরল আমীরগুলকে। সে ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

শহীদ ও কুয়াশা উভয়ের দিকেই কয়েকটা রিভলভার উদ্যত থাকায় তারা অসহায়ের মত দেখতে লাগল। আমীরগুলকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গহ্বরের মধ্যে ছুঁড়ে দিল কয়েকজন।

'দেখবে'ক্ষণি মজা। মৃত্যুর কি চমৎকার ব্যবস্থা! এখন বললে মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। দেখতে পাবে কাল বেলা এগারোটায়,' কুয়াশার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মমতাজ। তারপর স্যাঙাৎদের নির্দেশ দিল, 'এবার কালু মিয়া ওরফে শহীদ খান।'

শহীদ অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল গহ্বরের মধ্যে।

'এবারে রাজা মিয়া ওরফে কুয়াশা সাহেবের পালা। নামিয়ে দাও ওকে।'

কুয়াশা চমকাল না। মানব-ধ্বংসী মহাসভার ডিরেক্টর নূরবক্সকে সে চেনে বই কি এবং নূরবক্স যে তাকে চিনে ফেলেই ট্রেনভিলের লতা দিয়ে শ্বাসরোধ করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছিল তা-ও জানে।

কুয়াশা তাই বিস্মিত হল না কিন্তু অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। সে উবু হয়ে গহ্বরে নামতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে বসে কাঁদো কাঁদো চেহারা করে মমতাজের কাছে করুণা ভিক্ষা করল। আকুল আবেদন জানিয়ে বলল, 'কমাণ্ডার, আমাকে বাঁচাও, তোমরা যা বলবে আমি তাই করব। তোমার একান্ত দাস হয়ে থাকব আমি। মেরো না আমাকে। বাঁচাও। কমাণ্ডার, বাঁচাও। তোমাদের সবকথা শুনব। মেরো না আমায়। দোহাই তোমার।'

মমতাজ মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'এটা দেখবার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। মাটিতে পড়ে করুণা ভিক্ষা চাইছে বীরশ্রেষ্ঠ কুয়াশা। এটা দেখবার আশাতেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম।'

'দয়া কর, দয়া কর আমাকে কমাণ্ডার,' মিনতি ঝরে পড়ল কুয়াশার কণ্ঠ থেকে।

'না, তোমাকে দয়া করা যায় না। তোমাকে কেন, কাউকেই দয়া করি না আমরা। নেমে পড়। না হয় জোর করে নামাবে তোমাকে ওরা। এই, তোমরা হাঁ করে দেখছ কি? জোর করে নামিয়ে দাও ওকে।'

কয়েকজন এগিয়ে এল। কুয়াশা কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করল। তারপর পড়ে গেল নিচে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল মমতাজ। তারপর স্যাঙাৎদের বলল, 'চল, এদিকের কাজ শেষ।'

'উঁহুঁ, শেষ হয়নি এখনও,' রক্ষীদলের নেতা মমতাজের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে ধরে বলল। 'তোমাকেও নামতে হবে ওই গহ্বরে, ডিরেক্টরের নির্দেশ।'

প্রথমে বিস্ময়ে ও পরে ভয়ে ছানাবড়া হয়ে গেল মমতাজের চোখ।

সে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'গার্ড, তুমি কি পাগল হয়েছ?'

'পাগল হইনি। তুমি ওই গোয়েন্দাগুলোকে মহাসভার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এসেছ। আর জানই তো মহাসভা কখনই ভুলকে প্রশ্রয় দেয় না। ওদের সাথে তোমাকেও ডিরেক্টর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।'

'না-না,' প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল মমতাজ। 'আমি ডিরেক্টরের কাছে মাফ চাইব। দয়া ভিক্ষা করব।'

গার্ড হাসল, 'মানব-ধ্বংসী মহাসভা দয়া করে না।'

কাকুতি-মিনতি করতে লাগল মমতাজ, 'আমায় বাঁচিয়ে দাও ভাই এ যাত্রা। আমার অনেক টাকা লুকানো আছে। সবই তোমাকে দেব।'

'দুনিয়ার সমস্ত টাকা-পয়সা এক সাথে এনে আমার সামনে হাজির করলেও তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

হিড়হিড় করে কয়েকজন গার্ড তাকে টেনে নিয়ে গেল গহ্বরের কাছে।

নিচে, গহ্বরের ভিতরে অন্ধকারে কুয়াশা প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। সে প্রশ্ন করল, 'শহীদ, আমীরগুল, কোথায় তোমরা?'

'এই তো, তোমার পিছনে,' আমীরগুল বলল। 'অন্ধকারে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। একটু পরেই দেখতে পাবে আমাদের।'

একটু পরে অন্ধকারটা চোখে সয়ে যেতেই কুয়াশা দেখতে পেল, গহ্বরের দেয়ালে হেলান দিয়ে শহীদ ও আমীরগুল বসে আছে। গহ্বরটা নিচে বেশ প্রশস্ত। একদিকে ছোট ছোট কতকগুলো গর্ত থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অসহ্য গরম গহ্বরটার মধ্যে।

কুয়াশা সরে এসে ওদের পাশে বসতেই ধপাস করে শব্দ হল একটা। কি যেন পড়ল।

ওরা একটু অবাক হয়ে দেখল, যে পদার্থটা উপর থেকে পড়ল সেটা আর কেউ নয় কমাণ্ডার মমতাজ স্বয়ং।

আমীরগুল বিস্ময়ে থ' বনে গেল। তারপর সে-ই প্রথমে কথা বলল, 'দেখেছ, কি পড়ল উপর থেকে? মরার সময়ও কি ছুঁচোর গন্ধ সইতে হবে নাকি? উহ্!'

ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল মমতাজ।

'দাঁড়া ছুঁচো, দেখাচ্ছি তোকে এবারে।' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মমতাজের দিকে পা বাড়াল আমীরগুল।

কুয়াশা দ্রুত মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'আহ্, করছ কি ভাই, আমীরগুল?'

'তুমি একটু সর, ওকে আমি জনমের মত শেষ করে দেব,' ফোঁস ফোঁস করতে লাগল আমীরগুল।

শহীদ আমীরগুলকে সরিয়ে নিয়ে তার পাশে প্রায় জোর করেই বসিয়ে বলল, 'ছুঁচো মেরে কেনই বা হাত গন্ধ করবে, বল? তাছাড়া আমরা সবাই তো একই নৌকার যাত্রী। নৌকা ডুবলে ছুঁচোরও তো বাঁচবার সুযোগ পাওয়া উচিত।'

আমীরগুল বসে বসে গজরাতে লাগল।

শব্দ শুনেই বোঝা গেল উপরের ঢাকনাটা লাগিয়ে তালা বন্ধ করা হল।

কে যেন বলল, 'তোমরা এখানে ডিউটিতে থাক। আগুনের স্রোত যখন বইতে শুরু করবে তখন কন্ট্রোলরূমে খবর দেবে।'

একটু পরে রক্ষীদের একজনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আগুনের ফোয়ারা শুরু হবার আগেই আমি এখান থেকে সরে যাব। এই গরমেই টেকা দায়। তখন তো গরমে বুটের ভিতরই পায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে।'

অন্যজন বলল, 'আমিও চলে যাব। বদমাশগুলো তো আর বেরোতে পারছে

না। মিছেমিছি এখানে থেকে গরমে পায়ে ফোস্কা ফেলবার দরকার কি?'

রক্ষীদের আলাপটা শুনতে পেলেও কুয়াশা, আমীরগুল বা শহীদ ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পারল না। সে মমতাজকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই লাফ দিয়ে উঠে এসে আমীরগুল মমতাজের জামার কলার চেপে ধরল, 'এই ব্যাটা ছুঁচো, এসব আগুনের স্রোত-ট্রোতের ব্যাপার কি?'

মমতাজ চিঁচিঁ করে বলল, 'প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় একবার ওই গর্তগুলো দিয়ে গলিত ধাতু উঠে এসে এই গহ্বরটার অর্ধেকটা পর্যন্ত ভরে দেয়। ওগুলো আসে আগ্নেয়গিরি থেকে। এটা অনেকটা সেফটি ভাল্‌ভের মত। কিছুক্ষণ পরে আবার সেগুলো নেমে যায়। পরের আগুনে স্রোত আসবে কাল বেলা এগারোটায়।'

'এখন সন্ধ্যা সাতটা। তার মানে, আমাদের পরমায়ু আর মাত্র ষোলো ঘন্টা,' কুয়াশা ঘড়ি দেখে হিসাব করে বলল।

আমীরগুল মমতাজের জামার কলার ছেড়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছিনে। এখানে হচ্ছে কি?'

কুয়াশা অত্যন্ত গাম্ভীর্য সহকারে বলল, 'আগ্নেয়গিরির মধ্যে যে বিশাল যন্ত্রটা দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে একটা লেসার-বীম মেশিন। ওটা দিয়ে পারমাণবিক বোমা, রকেট ইত্যাদি নিক্ষেপ এবং ধ্বংস করা যায়। কাল দুপুরে বদমায়েশগুলো পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করবে। তাই না, মমতাজ?'

মমতাজ মাথা নাড়ল।

থ' বনে গেল শহীদ।

আবার মমতাজের জামার কলার চেপে ধরল আমীরগুল।

'কোথায় ফেলবে?'

কোন জবাব দিল না মমতাজ।

'বল, না হলে তোর নাক ভেঙে দেব?' ঘুসি দেখাল আমীরগুল।

'টোকিও, ব্যাংকক, হংকং, সিডনী।'

'উহ্, কি সাংঘাতিক লোক এরা! কোটি কোটি মানুষ যে মারা যাবে এতে!' শিউরে উঠে বলল আমীরগুল।

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

কুয়াশা বলল, 'ওই শহরগুলোতে আছে এই বদমায়েশ দলের লোকেরা। তারা লুঠ করবে ওই শহরগুলোর সমস্ত ধনসম্পদ।'

'অমানুষ, নরক-কীট, কুকুর,' আমীরগুল আপন মনে বলতে লাগল। 'এই কুত্তাগুলোর কবল থেকে কি কোন মতেই কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে রক্ষা করা যাবে না? রাজা মিয়া, বল, কোন উপায় আছে? আমার নিজের জীবন দিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পারতাম…।'

দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে ছিল মমতাজ। 'আর পনেরো ঘন্টা মাত্র বাঁচব

আমরা,' করুণ কণ্ঠে বলল সে।

'তোর আরও আগে মরা উচিত। এখুনি মরা উচিত। ছুঁচো কোথাকার।' আমীরগুল মমতাজের চোয়ালে একটা ঘুসি মারল।

আট

প্রায় পনেরো ঘন্টা পরে।

গর্তগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ একটু একটু করে বাড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছিল উত্তাপ। একসময় উত্তাপ অসহ্য হয়ে উঠল। দেয়াল ও নিচের মাটিও গরম হয়ে উঠেছে। বসে থাকা যাচ্ছে না। ঘেমে নেয়ে উঠেছে গহ্বরের চার প্রাণী। ধোঁয়ায় ওদের চোখ জ্বালা করছে। খুকখুক করে মাঝে মাঝে ওরা কাশছেও।

বার বার ঘড়ি দেখছে কুয়াশা।

এগারোটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল মমতাজ।

'আর তিন মিনিট বাকি আগুনের স্রোত শুরু হবার,' কুয়াশা শান্ত কণ্ঠে বলল।

উপরে প্রহরীদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চল, আর নয়। সেদ্ধ হবার আগেই পালাই। আর টেকা যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, চল।'

আবার ঘড়ি দেখল কুয়াশা। আড়াই মিনিট বাকি।

প্রবল বেগে ধোঁয়া উঠছে গর্তগুলো থেকে। আমীরগুল বলল, 'মৃত্যুর আর আড়াই মিনিট বাকি আছে।'

'শহীদ,' কুয়াশা বলল, 'কুইক, আমার ঘাড়ের উপর উঠে দাঁড়াও।'

শহীদ একটু অবাক হয়ে বলল, 'কি বললে তুমি!'

'আমার ঘাড়ের উপরে উঠে দাঁড়াও। সময় নেই।'

'লাভ কি? তালাবন্ধ লোহার দরজা তো খোলা যাবে না?'

'কথা বাড়িয়ো না, প্লীজ। যা বলছি, শোন।'

শহীদ কথা বাড়াল না। কুয়াশার ঘাড়ের উপর উঠে দাঁড়াল সে।

কুয়াশা আমীরগুলকে বলল, 'আমাদের পেঁচিয়ে ধরে বেয়ে উঠে যাও। পকেট থেকে নাইলনের মজবুত কর্ড বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ কাজে লাগবে।'

'কিন্তু ওদিকে যে তালা বন্ধ?'

'না, বন্ধ নয়। আমি তখন কান্নাকাটির ভান করে তালার গর্তের মধ্যে কাদা ঢুকিয়ে দিয়েছি। ও তালা বন্ধ হয়নি। যাও, আর দেরি কোরো না।'

নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবার ক্ষীণতম সম্ভাবনায় আমীরগুল, কুয়াশা

আর শহীদের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল। রডের ফাঁক দিয়ে তালাটাতে যখন সে টান দিল তখনও তার মন থেকে নৈরাশ্য আর সন্দেহ দূর হয়নি। কিন্তু যখন তালাটা সত্যি খুলে গেল তখন সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

কুয়াশা নিচ থেকে বলল, 'আমীরগুল, কুইক। আর দেড় মিনিট আছে।'

গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আমীরগুল লোহার ঢাকনাটা তুলে উপরে উঠে গেল। ঢাকনাটা উল্টোদিকে তুলে গহ্বরের মুখটা খুলে দিল।

'উঠেছি,' বলল আমীরগুল।

মমতাজ হাঁ করে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কুয়াশা তাকে বলল, 'মমতাজ জলদি। উঠে পড়।'

মমতাজ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। যেন কুয়াশার কথা সে বুঝতে পারছে না। কুয়াশা তাকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবে এই সম্ভাবনা স্বপ্নেও তার মনে ঠাঁই পায়নি। সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'মমতাজ, দেরি কোরো না। উঠে পড় বাঁচতে হলে।'

'অ্যাঁ, আমি উঠব! বলছ তোমরা! অ্যাঁ!'

'আহ্, তাড়াতাড়ি কর। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সবাইকে উঠতে হবে।'

মমতাজ উঠে যাবার পর আমীরগুল শহীদকে টেনে তুলল।

'দড়িটা নামিয়ে দাও।'

আমীরগুল দড়ি খুলে ঠিক করে রেখেছিল। দড়ি নামিয়ে দিল সে।

ততক্ষণে গর্তের মুখে গলিত ধাতু টগবগ করে ফুটছে।

শহীদ আর আমীরগুল কুয়াশাকে যখন টেনে তুলল তখন গহ্বরের নিচের দিকটা উত্তপ্ত গলিত ধাতুতে ভরে গেছে। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলেই কুয়াশার পা দুটো গলিত লাভায় পুড়ে যেত।

আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে আমীরগুল বলল, 'আমি যে বেঁচে আছি তা যেন আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।'

কুয়াশা ঘড়ি দেখে বলল, 'শোন, আমাদের হাতে সময় খুব কম। বারোটায় ওরা বোমা নিক্ষেপ করবে। তার আগে ওদেরকে স্ম্যাশ করতেই হবে। শোন আমীরগুল, তোমার একটা কাজ করতে হবে।'

'বল।'

'বন্দীগুলোকে বিদ্রোহী করে তুলতে হবে। তাতে ওরা সবাই বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সেই অবসরে আমরা লেসার বীম মেশিনটাকে ধ্বংস করব।'

আমীরগুল বলল, 'আমি একজন গার্ডকে বলতে শুনেছি এগারোটার সময় সমস্ত ক্রীতদাসকে পোতাশ্রয়ে নিয়ে যাবে। তার মানে, এখন ওদের ওখানটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

কুয়াশা খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে তো আরও ভাল। সেখানে যত তাড়াতাড়ি

পার গিয়ে হাঙ্গামা বাধাও। জাহাজগুলো দখল কর। সবাই জাহাজে গিয়ে উঠে পড় এবং যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হও।'

'বেশ। চল, বেরুনো যাক। কিন্তু মমতাজ গেল কোথায়?' আমীরগুল বলল।

'তাই তো!'

শহীদ বলল, 'বদমাশটা পালিয়েছে। দেখি কোথায় গেল।'

'দেখবার সময় এখন নেই,' কুয়াশা বলল।

সুড়ঙ্গের প্রবেশ-পথে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ, কুয়াশা ও আমীরগুল। ডাইনে আর একটা সুড়ঙ্গ। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। লেসার বীম মেশিনটা দেখা যাচ্ছে। লোহার কাঠামোটার উপর দিকে যন্ত্রটাকে একটা গম্বুজের মত দেখাচ্ছে। মহাসভার ইউনির্ফম পরা কয়েকজন সশস্ত্র সদস্য দাঁড়িয়ে আছে প্রজেক্টরের কাছেই।

কুয়াশা বলল, 'বাঁ দিকটা দিয়ে এগিয়ে যাও তুমি, আমীরগুল, পাহাড়ের আড়াল দিয়ে। ওদিকে নিশ্চয়ই কেউ নেই। পোতাশ্রয়টা ওই দিকেই।'

কোন কথা না বলে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল আমীরগুল।

ঘড়ি দেখতে লাগল কুয়াশা। 'দশমিনিট পরে আমরা বেরিয়ে পড়ব। গার্ডগুলোকে বেকায়দায় ফেলতে হবে।'

আমীরগুল পাহাড়ের আড়াল দিয়ে পোতাশ্রয়ে পৌঁছে দেখল সমুদ্রের তীরে বন্দিরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। রিভলভারধারী কয়েকজন রক্ষী তাদের পাহারায় মোতায়েন আছে।

আমীরগুল যেখানে গিয়ে দাঁড়াল তার মাত্র দশহাত দূরেই একজন গার্ড বন্দিদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা টমিগান।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল আমীরগুল। এই গার্ডটাকে সকলের আগে খতম করে ওর টমিগানটা বাগাতে হবে। বাকি কাজটুকু তাহলে অনায়াসেই সম্পন্ন করতে পারবে সে। কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই আপাতত, কারণ গার্ডদের কেউই এদিকে তাকিয়ে নেই।

সকলের দৃষ্টি সামনের সমুদ্রের তীরে দাঁড়ানো বন্দীদের দিকে।

ধীরে, অতি ধীরে নিঃশব্দে আমীরগুল গার্ডটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁ হাতটা দিয়ে গার্ডের গলাটা পেঁচিয়ে ধরে ডানহাত দিয়ে তার কানের কাছে প্রচণ্ড একটা আঘাত করল।

আচমকা হামলায় গার্ডটা আর্তনাদ করে উঠবার চেষ্টা করল কিন্তু আমীরগুল এমনভাবে তার কণ্ঠটা চেপে ধরেছিল যে, সে এতটুকু শব্দও করতে পারল না। অসহায়ের মত সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। এক ঝটকায় তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে টমিগানটা কেড়ে নিল আমীরগুল। লোকটা চিৎকার করার চেষ্টা করতেই বুট দিয়ে মুখের উপর একটা লাথি হাঁকাল আমীরগুল। লোকটা জ্ঞান হারাল।

পাহাড়ের খাদের মধ্যে দিয়ে আমীরগুল নেমে গেল কয়েক পা। সে চিৎকার

করে বলল, 'বন্ধুগণ, এই দস্যুদের, এই শয়তানদের খতম করে দাও। খুন কর ওদের।'

গার্ড ও বন্দীরা চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে টমিগান হাতে আমীরগুলকে দেখে চমকে উঠল।

আমীরগুল তখনও চিৎকার করে বলছে, 'বন্ধুরা, এই খুনেগুলোকে খতম করে দাও।'

গার্ডরা প্রথমে বিস্মিত হলেও মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠল। তারা আমীরগুলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। আমীরগুল একটা পাথরের আড়ালে সরে গেল। বন্দীদের গায়ে গুলি লাগতে পারে এই আশঙ্কায় সে গুলি করতে সাহস পেল না।

কিন্তু বন্দীদের মধ্যে ততক্ষণে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আহ্বানে সাড়া দিতে তারা বিলম্ব করল না। বদমাশগুলোর কবল থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ পেয়ে তিনটে জাহাজের নাবিক আর অফিসাররা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুষ্টিমেয় গার্ডদের উপর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল সব।

ক্যাপ্টেন গোলজার আহমদ আমীরগুলকে জড়িয়ে ধরল। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

আমীরগুল বলল, 'কোন কথা নয়। এখুনি সবাইকে গিয়ে জাহাজে উঠতে হবে। তিনটে জাহাজই যেন পনেরো মিনিটের মধ্যেই যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়। এটাই এখন আমার নেতার আদেশ।'

'কিন্তু ব্যাপার কি?' ক্যাপ্টেন শুধোলেন।

'সব পরে শুনবেন, ক্যাপ্টেন, এখন আলাপ করার সময় নেই। এখানকার অধিবাসীদেরও যেন জাহাজে তোলা হয়। ভাইসব, সবাই গিয়ে নিজ নিজ জাহাজে উঠে পড়ুন। এঞ্জিন চালু করে দিন। যান, আর এক মিনিট দেরি করবেন না।'

ক্যাপ্টেন গোলজার বললেন, 'আপনি কি করবেন?'

'আমিও আপনাদের সাথে থাকব।'

ওদিকে মমতাজ গহ্বরের মধ্যে থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে পিছন দিক দিয়ে সোজা ডিরেক্টরের রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

ডিরেক্টর নুরবক্স তখন আতস-কাঁচ দিয়ে একটা ফুলের পাপড়ি পরীক্ষা করছিল। দরজা খোলার শব্দে সে ফিরে তাকিয়ে মমতাজকে দেখে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

মমতাজ তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

নুরবক্সের বিস্ময় কেটে যেতেই সে বলল, 'ওর একটা ব্যবস্থা কর।' নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

'এখুনি করছি, স্যার।' হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করল জাকের।

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল মমতাজ, 'স্যার, আমাকে মাফ করে দিন। শুনুন স্যার, কুয়াশা আর শহীদ আগুনে স্রোতের গহ্বর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'সে কি!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল নুরবক্স। 'অসম্ভব! এ অসম্ভব! জাকের, মেরো না ওকে। শোনা যাক ব্যাপারটা।'

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল মমতাজ। শেষে সে যোগ দিল, 'বেরিয়েই মনে করলাম, আমার প্রথম কর্তব্য হল আপনাকে খবরটা দেওয়া।'

প্রচণ্ড ক্রোধে নুরবক্সের চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে জাকেরকে বলল, 'লেসার-বীম মেশিনের রক্ষীদের বল যে, কুয়াশা ও শহীদ মেশিনটা ধ্বংস করার চেষ্টা করতে পারে। তারপর চারদিকে একটা বিপদ-সঙ্কেত দাও। কুয়াশা ও শহীদকে দেখামাত্র যেন হত্যা করা হয়।'

রেডিও-ট্রান্সমিটারে নুরবক্সের নির্দেশ জানাল জাকের।

'স্যার, আমি?' প্রশ্ন করল মমতাজ।

'তোমাকে এ যাত্রা মাফ করলাম। আপাতত এখানেই থাক তুমি।'

নুরবক্সের নির্দেশ পেয়ে গার্ডরা লেসার-বীম প্রজেক্টরটাকে ঘিরে দাঁড়াল। গার্ডদের লীডার সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, 'ওরা যদি প্রজেক্টরের ক্ষতি করতে সক্ষম হয় তাহলে ডিরেক্টর আমাদের কাউকে প্রাণে বাঁচাবেন না। ছড়িয়ে পড় সবাই।'

সুড়ঙ্গের একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে কুয়াশা ও শহীদ গার্ডদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল। হঠাৎ করে ওদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখে কুয়াশা বুঝতে পারল কোথাও একটা গোলমাল ঘটেছে। সে বলল, 'এখানে আর এক সেকেণ্ডও নিরাপদ নয়। নিশ্চয়ই মমতাজ নুরবক্সকে খবর দিয়েছে। আর তা রেডিও মারফত গার্ডদের কানে এসেছে। চল।'

'কিন্তু কোন্‌দিকে?'

'এস আমার সঙ্গে। মমতাজ নিশ্চয়ই অন্য পথে বেরিয়েছে সেই পথে যেতে হবে আমাদের।'

দৌড়াতে লাগল তারা আবার সুড়ঙ্গের দিকে।

মিনিট দুয়েক পরে ওরা সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এল। কাছেই কোথাও হৈ-চৈ হচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। শহীদ কান পেতে শুনে বলল, 'পোতাশ্রয়টা এই দিকেই না? মনে হচ্ছে যেন আমীরগুল গোলমাল পাকিয়ে তুলতে পেরেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' হাত দশেক উঁচুতে পাহাড়ের গায়ের একটা গর্ত থেকে ধোঁয়া উদগীরণ দেখতে দেখতে কুয়াশা বলল।

অদূরেই একটা হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছিল। শহীদ একটু উল্লসিত হয়ে বলল, 'কুয়াশা, আমরা হেলিকপ্টারটা নিয়েই তো প্রজেক্টরের উপরে উঠে ওটাকে ধ্বংস

করেত পারি।'

'অসম্ভব। আমরা পঞ্চাশ পা এগোতেই নুরবক্সের চোখে পড়ে যাব। তারচেয়ে বরং একটা কাজ করলে ভাল হয়।'

'কি?'

'ওই গর্তটা দেখেছ? ধোঁয়া বেরোচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখ, কিছুক্ষণ ধোঁয়া বেরোয় আবার কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে।'

শহীদ কিছুক্ষণ গর্তটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাই তো! কিন্তু ওটা দেখলে তো হবে না। সময় যে হাতে নেই?'

কুয়াশা ঘড়ি দেখে বলল, 'তাই তো, আর মাত্র দশ মিনিট। এর মধ্যেই আমাদের লেসার-বীম প্রজেক্টর ধ্বংস করতে হবে।'

'কিন্তু কি করে?' হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'এস। আর দেরি নেই। জ্বালামুখটার মধ্যে ঢুকতে হবে।'

'বল কি।'

'হ্যাঁ। এখন ওটাই একমাত্র পথ।'

শহীদ বুঝতে না পারলেও বলল, 'চল তাহলে।'

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল দুজন। কুয়াশা বলল, 'জ্বালামুখটা থেকে দুমিনিট ধোঁয়া বেরোয় আর তিনমিনিট বন্ধ থাকে। আমি ঘড়িতে মিলিয়ে দেখেছি। ওই তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের কাজ সারতে হবে।'

জ্বালামুখে যখন পৌঁছুল ওরা ঠিক সেই সময় ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল। কুয়াশা ভিতরে ঢুকে বলল, 'দৌড়ে এস।'

শহীদ ভিতরে ঢুকল। মনে হল যেন আগুনের হলকা এসে লাগল তার চোখে-মুখে। জ্বলতে লাগল সর্বাঙ্গ। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কুয়াশা দৌড়োচ্ছে তার মাঝখান দিয়েই। শহীদও শ্বাস বন্ধ করে দৌড়ুতে লাগল।

'উহ,' শহীদ বলল। 'সালফারে যেন সর্বাঙ্গ আর ফুসফুস পুড়ে যাচ্ছে।'

'উপায় নেই। কষ্ট করতেই হবে। আরও জোরে দৌড়ে এস।

গর্তের মুখটা যেখানে খুব ছোট হয়ে গেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল দুজন।

কুয়াশা বলল, 'এই গর্তটা নিশ্চয়ই আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছে। এটা বন্ধ করে দিলেই অন্য কোন জায়গা দিয়ে বিশেষ করে মূল জ্বালামুখ দিয়ে অর্থাৎ লেসার-বীম প্রজেক্টর যেখানে আছে সেখানে দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হতে বাধ্য। এস এটাকে বন্ধ করে দিই।'

একটা প্রস্তর-খণ্ড দেখিয়ে কুয়াশা বলল, 'এটাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তটা বন্ধ করতে হবে। এস জলদি। এক মিনিটের মধ্যে কাজটা শেষ করে বেরোতে হবে আমাদের।'

অসহ্য উত্তাপে তখন শহীদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। শ্বাস নিতে না পারায় কষ্ট যেন আরও অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। উত্তেজনায় আর ক্লান্তিতে পা দুটো ভেঙে আসছিল। তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে পাথর খণ্ডটা ধাক্কা দিয়ে গর্তের মুখের কাছটাতে নিয়ে গেল। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই হয়ে গেল কাজটা।

কুয়াশা বলল, 'এখুনি পালাতে হবে। দৌড়াও।'

বাইরের মুক্ত হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নিল ওরা। দ্রুত নেমে এল নিচে।

পিছনে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে ওদের কানে তালা লেগে গেল।

কুয়াশা বলল, 'এখুনি সমস্তটা আকাশ ভেঙে পড়বে। মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে। তার আগেই যদি আমরা ওই হেলিকপ্টারটায় না উঠতে পারি তাহলে আমাদেরও মৃত্যু অনিবার্য।'

রুদ্ধশ্বাসে ওরা হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়াতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে ওরা আকাশে উঠল।

ওদিকে আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া উদগীরণের পথে পাথরের খণ্ডটা কামানের গোলার মত ছিটকে পড়ে সমগ্র দ্বীপটাতে মহাপ্রলয়ের সূচনা করল।

নয়

মানব-ধ্বংসী মহাসভার ডিরেক্টর নুরবক্স কন্ট্রোলরুমে গিয়ে পৌছুল বারোটা বাজার ঠিক দুমিনিট আগে। তার সঙ্গে গেল মমতাজ আর জাকের।

কন্ট্রোলার সবিনয়ে নুরবক্সকে অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন, স্যার। মাস্টার সুইচটা এইখানে। আর দুমিনিট পরে আপনি মাস্টার সুইচ টিপবেন।'

একটা টেলিভিশন সেটের সামনে নিয়ে নুরবক্সকে হাজির করল কন্ট্রোলার।

টেলিভিশনের পর্দায় লেসার-বীম প্রজেক্টরের গম্বুজের মত চূড়াটা দেখা যাচ্ছিল। নুরবক্স প্রশ্ন করল, 'সব প্রস্তুত?'

'সব প্রস্তুত, স্যার।' জানাল কন্ট্রোলার। ঘড়ি দেখে সে বলল, 'আর এক মিনিট সময় আছে। তারপর আপনি সুইচ টিপবেন।'

নুরবক্স খুশি হয়ে বলল, 'চমৎকার! আমাদের এতদিনের চেষ্টা তাহলে এখন সফল হতে চলেছে।'

'হ্যাঁ, স্যার।' ঘড়ি দেখে জাকের বলল, 'আর পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড।'

'...আর ত্রিশ সেকেণ্ড।'

'...আর বিশ সেকেণ্ড।'

'...আর পাঁচ সেকেণ্ড।'

মাস্টার সুইচের দিক হাত বাড়াল নুরবক্স।

হঠাৎ খুব কাছে প্রচণ্ড একটা গর্জন শোনা গেল। আর তার সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে কেঁপে উঠল মাটি।

তারপর শুরু হয়ে গেল মহাপ্রলয়।

নুরবক্স চিৎকার করে উঠল, 'ব্যাপার কি!'

জাকের বলল, 'স্যার, নিশ্চয়ই অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে গেছে।'

'তাই তো! তাহলে তো সর্বনাশ!' আর্তনাদ করে উঠল নুরবক্স।

কাঁপছে মাটি। কন্ট্রোলরুমটা দুলছে। যন্ত্রগুলো আর্তনাদ করে ভেঙে পড়ছে। টেলিভিশন সেটটা দড়াম করে এসে কন্ট্রোলারের মাথার উপর পড়ল।

প্রাণভয়ে ইঁদুরের মত দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল নুরবক্স, জাকের আর মমতাজ। চারদিক ধোঁয়ায় আর ধুলোয় অন্ধকার হয়ে এসেছে। অবিরামভাবে বিস্ফোরণ হচ্ছে।

'জাকের,' চিৎকার করে উঠল নুরবক্স। 'হোভার ক্র্যাফট?'

'রেডি, স্যার। আসুন আমার সঙ্গে।'

জ্বালামুখের পিছনের সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করল ওরা তিনজন। কিন্তু সুড়ঙ্গ-মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে। যখন ওরা ফিরে এল কন্ট্রোলরুমটা তখন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

ককিয়ে উঠল মমতাজ, 'এখানে থাকলে তো মারাই যেতাম।'

কন্ট্রোলরুমের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল।

তখনও মহাপ্রলয় চলছে সমগ্র দ্বীপ জুড়ে। বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক। ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। হোভার ক্র্যাফটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল তিনজন।

জাকের বলল, 'উঠুন, স্যার।'

নুরবক্স উঠে পড়ল।

জাকেরও উঠল হোভার ক্র্যাফটে। দরজাটা বন্ধ করতে যেতেই মমতাজ চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, আমি?'

জাকের বলল, 'আর জায়গা নেই।'

চিৎকার করে উঠল মমতাজ, 'স্যার, আমাকে ফেলে যাবেন না। আমি, স্যার, একেবারে মারা যাব।'

তার কথায় কান দিল না কেউ।

হোভার ক্র্যাফট মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল। কিছুক্ষণ সেটার পিছনে দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মমতাজ। স্তব্ধ হয়ে হোভার ক্র্যাফটটাকে দেখতে লাগল সে। জ্বালামুখের কাছ দিয়ে যাচ্ছে ওটা। প্রবল বেগে ধোঁয়া উঠছে জ্বালামুখটা থেকে।

হঠাৎ সে দেখতে পেল, বিশাল একটা পাথরের চাঁই উপর থেকে সোজা গিয়ে

পড়ল হোভার ক্র্যাফটের উপর। পরের মুহূর্তে হোভার ক্র্যাফটটা দুটুকরো হয়ে নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। পাথরের চাঁইটাও পড়ে গেল মাটিতে।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল হোভার ক্র্যাফটটাতে।

প্রাণভয়ে উল্টোদিকে দৌড়ুতে লাগল মমতাজ।

দুমাইল দূরে শহীদ ও কুয়াশা হেলিকপ্টারে বারবার পাক খাচ্ছিল।

শহীদ দূরবীণ দিয়ে নিচের দিকে দেখছিল। সে বলল, 'কুয়াশা, ওরা আমার মেসেজ পেয়েছে। রওনা দিয়েছে তিনটে জাহাজই।'

কুয়াশা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শহীদ পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে বলল, 'এখনও প্রবল বেগে ধোঁয়া উঠছে আগ্নেয়গিরি থেকে।'

সগর্জনে ছুটে চলেছে হেলিকপ্টার।

একটু পরে শহীদ বলল, 'ভাল কথা। তুমি যে বারবার নুরবক্স নুরবক্স করছ, আমি তো জানি তুমি নিজে তাকে পাহাড়ী খাদে পানিতে ডুবিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছ।'

রহস্যজনক হাসি ফুটে উঠল কুয়াশার মুখে। সে বলল, 'তোমরা যাকে দেখেছ সেটা ছিল অন্য একজনের লাশ।'

'বল কি?' অবিশ্বাসের সুরে বলল শহীদ। 'তাহলে নুরবক্স ছিল কোথায়?' আর খাদ থেকে যার চিৎকার ভেসে এসেছিল সেই বা কে?'

কুয়াশা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি। আমিই তখন আর্ত চিৎকারের ভান করে তোমাদের বোঝাতে চেয়েছিলাম যে নুরবক্সকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

তবুও শহীদের অবিশ্বাস দূর হল না। সে আমতা আমতা করে বলল, 'কারণ?'

'কারণ দুটো। প্রথমত আমি তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলাম। বোঝাতে চেয়েছিলাম যে নুরবক্স মরেছে, আমিও চলে গেছি বিশাল বন থেকে। তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলে। দ্বিতীয়ত অমরত্বের থিসিস যে পুড়ে গেছে বলে নুরবক্স দাবি করেছিল, আমি তা বিশ্বাস করিনি। আমি ধারণা করেছিলাম ওটা নষ্ট হয়নি। ওটা ওর কাছেই আছে। চাপ দিলেই বের করতে পারব। তোমরা চলে যাবার পর আমি তাই দিন পনেরো ধরে পাহাড়ের প্রত্যেক গুহায় থিসিসের খোঁজ করেছি। শেষ দিন নুরবক্স পালিয়ে যায়।'

শহীদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাট্টা করে বলল, 'এবারে সত্যি সত্যি মারা গেছে তো, না আবার আসবে?'

'বলা যায় না!' মৃদু হেসে বলল কুয়াশা।

কুয়াশা ২৯

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৭০

এক

রৌদ্রকরোজ্জ্বল শীতের সকাল।

বাগানে চেয়ার পেতে রোববারের কর্মহীন সকালে রোদ পোহাচ্ছিল শহীদ, মহুয়া আর কামাল। সামনে গরম চায়ের কাপ।

আলোচনা হচ্ছিল মিথ্যার সংজ্ঞা আর শ্রেণীভেদ নিয়ে। শহীদ বলল, 'আমেরিকানরা ঠাট্টা করে বলে, লাই অর্থাৎ মিথ্যা হল তিনরকম।'

'যথা?' প্রশ্ন করল কামাল।

'ব্ল্যাক-লাই অর্থাৎ অহেতুক অপবাদ দেওয়া, হোয়াইট-লাই মানে আমরা সচরাচর যে মিথ্যা বলে থাকি, আর স্ট্যাটিস্‌টিকস্।'

'তার মানে, স্ট্যাটিস্‌টিকস্‌কে ওরা মিথ্যা বলে গণ্য করে?'

'আগে ওরা এমন শ্রেণী-বিভাগ করেনি, তবে পাকিস্তানে স্ট্যাটিস্‌টিকস্-এর দশা দেখেই বোধ হয় আমেরিকানদের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে,' শহীদ সিগারেটে টান দিয়ে বলল।

'দাদা, তোমার টেলিফোন,' বারান্দা থেকে উচ্চকণ্ঠে হাঁক ছাড়ল লীনা।

'নাহ্, জ্বালালে দেখছি, রোববারের সকালেও তিষ্ঠাতে দেবে না!' কামাল বিরক্তি প্রকাশ করল।

উঠে পড়ল শহীদ। ড্রইংরুমে গিয়ে রিসিভার তুলল।

'হ্যালো?'

'শহীদ খান সাহেব বলছেন?' তরুণী কণ্ঠ ভেসে এল।

'বলছি। আপনি?'

'ডালিয়া আকরাম।'

'ঠিক চিনতে পারলাম না,' শহীদ জানাল।

'তা জানি। আমি নারায়ণগঞ্জের মরহুম ফকির আকরামের মেয়ে। ওনার নাম হয়ত শুনেছেন। জুট মার্চেন্ট ছিলেন এককালে। পরে ফিল্ম্ প্রডাকশনে নামেন। মাস তিনেক আগে মারা যান।'

ফকির আকরামের শুধু নামটাই জানা ছিল না, সামান্য আলাপও ছিল তার সঙ্গে শহীদের। ব্যবসায়ের সূত্র ধরেই আলাপ। করিতকর্মা পুরুষ ছিলেন ফকির

আকরাম। নিতান্ত সামান্য অবস্থা থেকে বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় পাট চালান দিয়ে কোটিপতি হয়েছিলেন। নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যার তীরে প্রাসাদোপম যে অট্টালিকা গড়েছেন তা দেখবার মত। শুধু পয়সাই নয় রুচিও ছিল ভদ্রলোকের। শেষটায় ভদ্রলোক কি কারণে যেন আত্মহত্যা করেন।

শহীদ বলল, 'জ্বি, নাম শুনেছি আপনার বাবার।'

'হয়ত শুনে থাকবেন উনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'হ্যাঁ, কাগজে তো তাই পড়েছিলাম।'

'সকলেরই তাই ধারণা। পুলিসেরও। ময়নাতদন্তেও তাই বলা হয়েছে। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সবাই যেটাকে আত্মহত্যা বলে মনে করছে সেটা আসলে আত্মহত্যা নয়। প্লেইন অ্যাণ্ড সিম্পল মার্ডার। আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেটাকে নিপুণ হাতে আত্মহত্যার মত করে সাজানো হয়েছে। অথচ প্রমাণ নেই। আমি চাই, আবার বাবার হত্যারহস্য উন্মোচন হোক। হত্যাকারী ধরা পড়ুক। তার শাস্তি হোক।'

শেষের দিকে তরুণীর কণ্ঠস্বর খুবই উত্তেজিত শোনা গেল।

'আপনার এমন মনে করবার হেতু?'

'হেতু অবশ্যই আছে। আর তাই তো আমি জোর দিয়ে বলছি, আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে।'

'পুলিসকে জানিয়েছেন আপনার সন্দেহের কথা?'

অস্ফুট একটা শব্দ করে তরুণী বলল, 'সে অসম্ভব। ওরা চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখছে আমার দিকে। কে জানে, এই টেলিফোনের ব্যাপারটাও ওরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে কিনা। যদি জেনে থাকে তাহলে আমাকে এই মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে ওরা এতটুকু ইতস্তত করবে না।'

শহীদ একটু ভেবে বলল, 'আপনি কি এখন নারায়ণগঞ্জ থেকে বলছেন?'

'না। ঢাকা থেকে বলছি। এখানে ফার্মগেটের কাছে একটা ফ্ল্যাটে থাকি আমি। একাই থাকি। অবশ্য চাকর আর ঝি আছে।'

'আপনি আমার এখানে আসতে পারেন না?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'অতটা সাহস থাকলে কি আর ফোন করতাম? সোজা চলে যেতাম আপনার বাসায়।'

'তাহলে আপনার বাসার ঠিকানা দিন। আমি নিজেই যাব।'

একটু ইতস্তত করে তরুণী বলল, 'ফার্মগেটের কাছে দ্য ডলস নামে একটা চারতলা ব্লক আছে, চেনেন?'

'চিনি বই কি?'

'এখানেই আমি থাকি দোতলার পুবদিকের ফ্ল্যাটটায়। কিন্তু শহীদ সাহেব, দয়া করে এখানে আসবেন না। এলে ওরা জানতে পারবেই। তখন ওদের কবল

থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাব না।' তরুণীর কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

'তাহলে তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা অন্তত কিছুটা বুঝতে না পারলে আমি দায়িত্বই বা নেব কি করে, আর এগুবই বা কি করে?'

'তাহলে কি করা যায়?' করুণ কণ্ঠে জানতে চায় তরুণী।

'ব্যাপারটা আমার জানতে হবে তো?'

'তা তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? বাইরে যদি কোথাও আলাপ করা যায়?' তরুণী প্রস্তাব করল অবশেষে।

'তা যায়।' শহীদ সমর্থন করল প্রস্তাবটা।

'সন্ধ্যায় আমাদের প্রডাকশনের শূটিং আছে নাভানা স্টুডিওতে। সাড়ে দশটার দিকে সেখান থেকে আমি বেরিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু দেখা হবে কোথায়?'

'কোন হোটেলে।'

'উঁহুঁ। ওদের লোকের চোখে পড়তে পারি। অন্য কোথাও, বিশেষ করে নির্জন কোন জায়গায় হলে ভাল হয়।'

শহীদ একটু ভেবে বলল, 'গুলশান ১ নম্বর মার্কেটের কাছে ঝিলের ধারে একটা মাথাভাঙা বটগাছ আছে। জায়গাটা রাস্তার পাশেই। সন্ধ্যার পর সেখানে বড় একটা কেউ যায় না। সেখানে দেখা হতে পারে। আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই?'

'আছে। ড্রাইভ করতেও জানি। তবে নিজের গাড়িতে যাব না আমি। ডিরেক্টর সাহেবের মাজদা নিয়ে যাব। গাড়িটা সাদা রঙের। চিনতে আপনার সুবিধাই হবে।'

'বেশ। আমি ঠিক সাড়ে দশটায় পৌঁছুব।'

'আমিও। কিন্তু কিছুক্ষণ যদি দেরি হয় আমার, তাহলে চলে যাবেন না যেন।'

'আচ্ছা।'

'তাহলে এই কথাই রইল।'

'হ্যাঁ।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ।

'অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা-আ-আক...।' বেসুরো গলায় সুরচর্চা করতে করতে কামাল এসে ঢুকল। সে প্রশ্ন করল 'কে রে বটে?'

'এক ফিল্ম্ প্রডিউসার। পুরুষ নয়, মেয়ে।'

'কি বললি?'

'একটা কন্ট্রাক্ট দিতে চায়।'

'কন্ট্রাক্ট! কিসের কন্ট্রাক্ট?' বিস্ময় প্রকাশ করল কামাল।

'অভিনয়ের,' গম্ভীর গলায় বলল শহীদ। 'একেবারে হিরোর রোলে।'

'যাঃ যাঃ। কেন বাওয়া সকাল বেলাই গুল মারছিস?'

'কেন, তোর বিশ্বাস হয় না? আমার চেহারাটা কি বাংলা সিনেমার নায়কের মত যথেষ্ট বোকা নয়? হলফ করে বলতে পারিস?' কৃত্রিম রাগ দেখাল শহীদ।

'তা বটে। তা শহীদ অভিনীত অপরূপ বাণী-চিত্রের নামটা কি হবে?'

শহীদ কৃত্রিমভাবে গলা কাঁপিয়ে বলল, 'এটা হবে এক নতুন ধরনের টকি। থ্রিল, সাসপেন্স···বাঘের সঙ্গে খালি হাতে নায়িকার লড়াইয়ের সময় সন্ন্যাসীর মুখে জাজ সুরে প্রেমের হিট গান। অথচ সপরিবারে অর্থাৎ ছিঁচকাঁদুনে কোলের শিশুটাকে পর্যন্ত নিয়ে দেখবার মত ছবি। ডালিয়া আকরাম নিবেদিত শহীদ "হিরোয়িত" অনবদ্য বাংলা চিত্র "কখনও হবে না"।'

'ফাজলামো ছাড় তো। আসল ব্যাপার কি?'

ঘটনাটা খুলে বলল শহীদ।

'সর্বনাশ করেছিস,' সবটা শুনে বিরস মুখে মন্তব্য করল কামাল।

'কার?'

'তোর নিজের।'

'কেমন করে!' ঘাবড়ে গিয়ে বলল শহীদ।

'গৃহবিপ্লব দেখা দেবে। ট্রয় ধ্বংস করতে না পারলেও গার্হস্থ্য বিবাদ ঘটাবার মত সুন্দরী মহিলা ওই ডালিয়া আকরাম। নিন্দায় কানপাতা যায় না ওদের সোসাইটিতে। নিন্দুকেরা বলে, ওর জন্যেই নাকি ওর বাবা আত্মহত্যা করেছেন।'

'তার মানে?'

'মেয়ের অত প্রশংসা নাকি বাপের বুড়ো হাড়ে সহ্য হয়নি। তাই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছেন। ওর ধারে-কাছে গেলেও তোর মত দেব-দুর্লভ লোকের নামেও ব্ল্যাক-লাই জুটতে কতক্ষণ। তারপরেই শুরু হবে তোর গার্হস্থ্য বিপ্লব।'

'তাহলে তো কেসটা নিতেই হয়,' হেসে বলল শহীদ।

'কপালে দুর্ভোগ থাকলে তো নেবেই,' গম্ভীর হয়ে বলল কামাল।

দুই

ঠিক সোয়া দশটায় বাসা থেকে বেরোল শহীদ। কামাল সঙ্গ ছাড়ল না।

পৌষ মাসের শীতের রাত। বেশ জেঁকে শীত পড়েছে। পথে লোক চলাচল বিরল। যানবাহনের সংখ্যা নগণ্য। খোলা জানালা দিয়ে শীতের তীক্ষ্ণ হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে যদিও দুজনেরই দেহটা মোড়া আছে উত্তম শীতবস্ত্রে।

গুলশান মার্কেট পেরিয়ে মাথাভাঙা বটগাছটা কাছেই। সড়ক থেকে হাত ত্রিশেক দূরে। তার পরই শুরু হয়েছে ঝিল। গন্তব্যস্থানের কাছে যখন এসে পৌঁছুল তখন কাছে-পিঠে একটা লোকও ওদের চোখে পড়ল না। গাড়ি-ঘোড়াও দেখা

গেল না।

ঝিলের তীর পর্যন্ত জায়গাটা ফাঁকা মাঠ। একশ' গজের মধ্যে বাড়ি-ঘর নেই। ফুটপাথ না থাকায় গাড়িটা মাঠের মধ্য দিয়ে বটগাছ পর্যন্ত নিয়ে গেল শহীদ।

ঝিলের বুক থেকে তীক্ষ্ণ হিমেল হাওয়া ভেসে আসছে।

'ভীষণ ঠাণ্ডা রে!' কামাল বলল, 'তুই ইন্টারভিউ-এর আর জায়গা পাসনি?'

জবাব না দিয়ে গাড়ি থেকে নামল শহীদ। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'বেশি ঠাণ্ডা লাগলে জানালার কাঁচটা তুলে দে।'

'তুই বাইরেই থাকবি?'

'ঠাণ্ডা লাগবে না।'

কথাটা কামালের ব্যক্তিত্বে বোধ হয় আঘাত করল। শহীদ যদি এই ভীষণ শীতেও খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে তার অসুবিধে হলেই বা কি করবার আছে। অগত্য সে চুপচাপ বসে রইল।

পায়চারি করতে লাগল শহীদ, আর ঘড়ি দেখতে লাগল বারবার।

কৃষ্ণপক্ষের কুয়াশা জড়ানো চাঁদটা অনেক উপরে উঠেছে। ঝিলের বুকে কাঁপছে তার প্রতিচ্ছবি। আলোয় চিকচিক করছে ঢেউগুলো। অপরূপ, অপরূপ এই রাত। আর, অপরূপ চারদিকের অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

সাড়ে দশটা বেজে গেছে অনেক আগে। ঘড়ির কাঁটা গিয়ে পৌছেছে পৌনে এগারোটার কাছাকাছি। আর একটা সিগারেট ধরাল শহীদ।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল।

...এবং আরও কয়েক মিনিট।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটা পেরিয়ে গেছে।

বিরক্ত হল শহীদ, একটু চিন্তিতও হল। হয়ত ডালিয়া আকরামের ধারণা যথার্থ। হয়ত টেলিফোনের ব্যাপারটা হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের (ডালিয়া বলেছিল, ওরা আমাকে সবসময়ই চোখে চোখে রাখছে। তার মানে, হত্যার পিছনে একাধিক লোক থাকতে পারে) কানে গেছে এবং তার চরম আশঙ্কাটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তবু আরও কিছুক্ষণ দেখা যাক।

কামাল জানালার ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল, 'কি রে, এল তোর বাগদত্তা?'

'সময় হলেই আসিবে আমার কুঞ্জে, সরি, ঝিল-পুলিনে।'

'আর এসেছে! চল, এবার কেটে পড়ি। কোথায় স্ফূর্তি করছে কে জানে।'

'আহ্, তুই বড্ড পরনিন্দা শুরু করেছিস, কামাল! দিনে দিনে অধঃপতন হচ্ছে তোর।' বিরক্তি প্রকাশ করল শহীদ।

'বেশ বাওয়া, আর কিছু বলব না।'

উত্তর দিকে দুটো চলমান আলোর রেখা দেখা গেল। আলো ক্রমশ উজ্জ্বলতর

হচ্ছে। শহীদ অগ্রসরমান আলো দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে আরও দুটো চলমান আলো দেখা দিল। সে দুটোও ক্রমশ উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

একটু পরেই সামনের আলো দুটোর উৎস গাড়িটা দৃষ্টিগোচর হল। কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা। রাস্তার উপরকার বৈদ্যুতিক বাতির ঠিক নিচেই থামল। পেছনের আলো দুটো নিভে গেল।

সচকিত হল শহীদ। পেছনের গাড়িটা সামনের গাড়িটাকে অনুসরণ করছে না তো? যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন বিপদ দেখা দিতে পারে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে পকেটে হাত ঢোকাল সে। পকেটে রিভলভার নেই। রিভলভারটা গাড়িতে। বেশ তো, দেখাই যাক।

এই অবস্থায় গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সে চাপাস্বরে কামালকে বলল, 'কামাল, ভদ্রমহিলা এসে গেছেন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু কেউ পিছু লেগেছে। জলদি রিভলভারটা বের করে আমার হাতে দে। যে-কোন মুহূর্তে দরকার হতে পারে।'

কিন্তু কামাল কিছু বলার বা রিভলভারটা বের করে দেবার আগেই শুরু হয়ে গেল কাণ্ডটা।

অখণ্ড নির্জনতাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়ে অকস্মাৎ গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র, গুড়ুম, গুড়ুম গুড়ুম,গুড়ুম।

কানে তালা লেগে গেল শহীদের। মুহূর্তের জন্যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে দেরি হল না। পিছনের নয়, সামনের গাড়ি থেকেই আসছে টমিগানের মৃত্যু-গর্জন। আর তার লক্ষ্য অন্য কেউ নয়, সে নিজে। কোন অজ্ঞাত কারণে এখন পর্যন্ত তপ্তসীসা তার বক্ষ ভেদ করে যায়নি। কিন্তু আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। ঘাসের উপর সে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে গাড়ির আড়ালে চলে গেল।

টমিগানের গুলি বর্ষণ সমানে চলছে।

শোনা যাবে শহীদ জানে, তবু চিৎকার করে সে বলল, 'কামাল, আমার রিভলভার…।'

কামালের জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু যেরূপ অকস্মাৎ গুলিবর্ষণ শুরু হয়েছিল তেমনি অকস্মাৎ থেমে গেল।

শ্বাস রোধ করে শুয়ে রইল শহীদ। কে জানে টমিগানধারী এদিকেই আসছে কিনা। হয়ত ভেবেছে, কুপোকাত হয়েছে তার শত্রু। কিন্তু কামাল কি করছে?'

হঠাৎ তার মনে হল, কামালের গায়ে গুলি লাগেনি তো? শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল! কিন্তু এখন কামালকে দেখতে গেলে দুজনেরই জীবন সংশয় হয়ে পড়বে। অথচ কিছু একটা করা দরকার এবং এক্ষুণি করা দরকার। দ্রুত চিন্তা করতে লাগল শহীদ।

গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দে সচকিত হল শহীদ। মুখ বাড়িয়ে দেখল গাড়িটার

আলো জ্বলে উঠেছে। গতি সঞ্চারিত হয়েছে তাতে। একটু এগোতেই পথের পাশের বৈদ্যুতিক আলো গিয়ে পড়ল চালকের মুখের উপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে এবং শহীদের চোখে পড়ল প্রকাণ্ড জালার মত একটা মুখ। লোকটা তখন শহীদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল।

সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। একটা বেবি অস্টিন।

উঠে দাঁড়াল শহীদ ঘাস-শয্যা থেকে। কামালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চি চি করে প্রশ্ন করল, 'টিকে আছিস তো?'

নিশ্চিত হল শহীদ। কামাল ঠিক আছে তাহলে। কিন্তু পথের ওপর পড়ে আছে ওটা কি? মানুষের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে যেন!

তাই তো।

ছুটে গেল শহীদ রাস্তার দিকে। কামালও বেরিয়ে এল।

কাছে যেতেই দেখা গেল বস্তুটা মানুষই বটে। স্যুট পরা একটা লোক। চিৎ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার উপর। দেহটা একেবারে স্পন্দনহীন। পাশে একটা টমিগান পড়ে আছে।

'স্টোন-ডেড,' মন্তব্য করল কামাল। 'গুলি লেগে মারা গেছে। রক্তে ভিজে গেছে কাপড়। আশ্চর্য, গুলি করল কে? তুই? কিন্তু...?'

'বুঝতে পারছি না। আমি তো নিরস্ত্র।'

শহীদ অবাক হয়ে এই কথাটাই ভাবছিল। বলা নেই কওয়া নেই একটা গাড়ি এসে থামল। আচমকা টমিগান চার্জ করতে লাগল। অথচ মারা গেল টমিগানধারী নিজেই এবং গুলির আঘাতেই মারা গেল। কে করল তাকে গুলি? ওই প্রকাণ্ড মুখওয়ালা লোকটা তো হতেই পারে না। তার সঙ্গেই তো এসেছে টমিগানধারী।

তাহলে?

হঠাৎ তার মনে হল, টমিগানধারীর গাড়ির পেছনে আরও একটা গাড়ি আসছিল। সেই গাড়িটা হয়ত। মুখ তুলে তাকাল শহীদ। গাড়িটা চোখে পড়ল না। তার বদলে তার চোখে পড়ল একটা সচল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

কামালের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শহীদ সেদিকেই তাকিয়ে রইল। কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হাতে চাপ দিয়ে তাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল শহীদ। কামালও তাকাল সামনের দিকে।

আরও একটু পরে দেখা গেল ওভারকোট গায়ে একটা বিশাল মনুষ্য-মূর্তি ধীরে-সুস্থে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গটা স্বভাবত তারই হাতের সিগারেটের।

আবার কে আসছে কে জানে? মতলবটাই বা কি লোকটার? তবে ধীরে-সুস্থে এগোবার ভঙ্গি দেখে শহীদের মনে হল, লোকটাকে বোধ হয় ভয় পাবার কিছু নেই।

লোকটা আরও নিকটবর্তী হতেই তার হাঁটবার ভঙ্গিটা পরিচিত বলে মনে হল শহীদের। কামালেরও চিনতে অসুবিধে হল না। ওভার-কোট গায়ে যে লোকটা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং কুয়াশা।

একটু দূরে দাঁড়াল কুয়াশা।

'কুয়াশা!' উল্লাসে ফেটে পড়ল কামাল।

'আরে, তোমরা যে!' কুয়াশার কণ্ঠে বিস্ময়। সে এগিয়ে এসে বলল, 'আশ্চর্য, আমি তো ধারণাই করতে পারিনি।'

'তাহলে তুমি উদয় হলে কি করে?'

'আমি বিল্লীর আড্ডার দিকে নজর রাখছিলাম। দেখলাম, বিল্লী আর রওশন গাজী বেরোচ্ছে। পিছু নিলাম। কারণ তখুনি বুঝেছিলাম, একটা খুনোখুনির ব্যাপার আছে। খুনের প্রোগ্রাম না থাকলে বিল্লী নিজে বেরোয় না।'

'কি রকম?' কামাল প্রশ্ন করল, 'বিল্লীটা আবার কে?'

'লোকটার নাম হচ্ছে, মাহদী বিল্লাহ। অপরাধ-জগতে বিল্লী নামে পরিচিত। বিরাট দল ওর। সোয়ারী ঘাটে আড্ডা। পাইকারী ব্যবসার নামে একটা দোকান আছে সেখানে। তিনতলায় হোটেল আছে। নাম পরিষ্কার হোটেল। আসলে ওটা হল জুয়ার আড্ডা। এজেন্টদের মাধ্যমে লোক আনে। আর তাদের জুয়ার আড্ডায় এনে সর্বস্বান্ত করে। দরকার হলে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তাদের। তাছাড়া আছে হাজারটা বেআইনী ব্যবসা। চোরাচালান করে। ভেজাল জিনিস বের করে। অর্থাৎ একটা অত্যন্ত সুসংগঠিত দল। বিল্লাহ ওদের নেতা। সে সাধারণত আড্ডাতেই থাকে। বাইরে বেরোয় কম। আগে থেকে খুনোখুনির কোন প্রোগ্রাম থাকলে তবেই সে বেরোয়।'

'অনেকটা স্পেশ্যাল প্রোগ্রামের মত,' কামাল বলল।

'তা বলতে পার,' কুয়াশা সায় দিল। 'ওরা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক কোটি টাকা করেছে এইসব অপরাধ করে। সেগুলো এখন কোথায় রেখেছে তার খোঁজে আমি বিল্লীর আড্ডায় কয়েকদিন ধরে নজর রাখছিলাম। তা ভীষণ ধুরন্ধর বিল্লাহ। কোন হদিস পাইনি ওদের গুপ্ত ধনাগারের।'

'তোমার গুলিতেই তো এই লোকটা মারা গেছে?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'যদি তোমরা কেউ গুলি না করে থাক,' সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলল কুয়াশা।

শহীদ বলল, 'সে অবকাশ পাইনি আমরা।'

'তা এই লোকটাই বিল্লাহ নাকি?'

'না, ওর নাম রওশন গাজী। বিল্লাহ নিজে টমিগান চার্জ না করে ওকেই দিয়েছিল দায়িত্বটা। কিন্তু অকস্মাৎ তোমাদের পিছনে লাগল কেন বিল্লাহ?'

একটা সিগারেট ধরাল শহীদ। ধোঁয়া ছেড়ে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল

কুয়াশাকে। শেষটায় বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, মিস ডালিয়া আকরামের ধারণা অভ্রান্ত। আর টেলিফোনের ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে। সম্ভবত বেচারি ইতিমধ্যেই বিল্লীর দলের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। আমাকে এখুনি যেতে হবে ওর খোঁজে, আর দেরি করা উচিত নয়।'

'তা ঠিক। তুমি বরং চলে যাও। তবে খুব সাবধান থেক। আবার হামলা হতে পারে তোমার উপর। আমি চলি এবারে।'

চলে গেল কুয়াশা। টমিগানটা তুলে নিতে ভুলল না।

তিন

নির্জন পথে আবার ছুটে চলল শহীদের বিলেট। স্টুডিওতে যখন পৌঁছুল তখন সোয়া বারোটা বেজে গেছে।

নাভানা স্টুডিওর বিরাট লোহার দরজাটা বন্ধ। অনেকক্ষণ হর্ন বাজাল শহীদ। কেউ দরজা খুলতে এগিয়ে এল না।

কামাল বলল, 'শূটিং বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। চল, ফিরে যাই।'

অগত্যা গাড়ি ফেরাল শহীদ।

'এখন কোন্‌দিকে যাবি?'

'দ্য ডলস হাউসের দিকে।'

'মিস ডালিয়া ওখানেই থাকে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

নীরব হয়ে গেল দুজন। অনেকক্ষণ পরে কামাল আবার মুখ খুলল।

'তোর কি ধারণা, ডালিয়া অলরেডী কালপ্রিটদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে?'

'তাছাড়া আর কি ধারণা হতে পারে? তবে বাসায় খোঁজ না নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।'

'তা বটে,' স্বীকার করল কামাল। 'ভাল কথা, ওই লোকটাকে দেখেছিস তুই? বিল্লাহ না কি নাম বলল কুয়াশা। আমি দেখেছি বটে। বিরাট মুখটা, ইয়া বিরাট। গোলগাল হাঁড়ির আকারের একটা মুখ।'

'দেখেছিস তাহলে তুই? পরে দেখলে চিনতে পারবি?'

'নিশ্চয়ই, ওই চেহারা কি সহজে ভোলা যায়?'

'দ্য ডলস হাউস' নামের বাড়িটা চিনত শহীদ। গাড়িবারান্দায় গাড়িটা রেখে পুবদিকের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল সে। কামাল তাকে অনুসরণ করল।

বৈদ্যুতিক ঘন্টার সুইচ টিপল শহীদ। অন্দরে ঘন্টা বাজার শব্দ কানে এল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার সুইচ টিপল। একটু পরেই পদশব্দ কানে এল শহীদের। খুট করে

একটা শব্দ হল। দরজা খুলে এক বুড়ো দাঁড়াল তার সামনে। ঘুম-জড়িত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'আপনেরা?'

'মিস ডালিয়া থাকেন এই বাসায়?'

'জ্বে, আপনেরা কেডা?'

'উনি আছেন এখন?'

'জ্বে, না। এহনও ফেরেন নাই। কয়ডা বাজে অহন, সাব?'

'পৌনে একটা।'

'পৌনে একটা!' আর্তস্বরে উচ্চারণ করল বুড়ো। মুহূর্তে তার চেহারায় ফুটে উঠল উদ্বেগের ছাপ। কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল সে। একটু ভেবে আবার প্রশ্ন করল, 'তা আপনেরা কেডা?'

'আমার নাম শহীদ খান। আর ইনি আমার বন্ধু কামাল আহমেদ। মিস ডালিয়া এলে বোলো, ওঁর সাথে আমরা দেখা করতে এসেছিলাম।'

'কি নাম বললেন, সাব?'

'শহীদ খান আমি, আর...'

'শহীদ খান সাব! তা হুজুর, কয়ডা বাজে কইলেন?'

'পৌনে একটা। আমরা চলি, বুঝলে?'

'পোনে একটা। স্যার, একটু ভিতরে আইবেন?' ইতস্তত করে আবেদন জানাল বুড়ো।

ভিতরে ঢুকল শহীদ।

'কিছু বলবে?'

'জ্বে। আপায়, মানে ডালিয়া মেম সাবে কইয়া গেছলেন, উনি রাইত বারোডার মইদ্যে না ফিরলে য্যান শহীদ খান সাবের বাসায় ফোন কইরা খবরডা দেই। ফোন নম্বরও লেইখ্যা দিয়া গেছেন এক টুকরা কাগজে। তাই তো স্যার জিগাইলাম, কয়ডা বাজে। আমি আবার ঘুমাইয়া পড়ছিলাম।'

'কোন খবর দিতে বলেছিলেন উনি?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'যদি উনি না ফেরেন তাইলে না ফিরনের খবরডাই য্যান দেই, কইয়া গেছেন।'

'হুঁ। আর কিছু?'

'জ্বে, না। উনি তো রাইত একটা-দুইটা পর্যন্ত প্রায়ই বাইরে থাকেন,' ঢোক গিলে ইতস্তত করে বলল বুড়ো। 'একাই যান, খুব সাহসী মানুষ আমার আফায়। কিন্তুক পাঁচ-ছয় দিনের মইধ্যে আমারে দেখবার যাওন ছাড়া বাইরে আর কুন জাগাতেই পা বাড়ান নাই।'

'কোথায় গেছেন, বলেছেন কিছু তোমাকে?'

'বলছেন। ইস্টুডিওতে যাইবেন। শুটিং আছে। আমার...আমার কেমন য্যান

ভয় করতাছে, সাব।'

কামাল অভয়ের সুরে বলল, 'আরে, ভয়ের কি আছে? এখুনি হয়ত এসে যাবেন।'

শহীদ বলল, 'এখন চলি আমরা। না ফিরলে খবর দিয়ো আমাকে সকালে। ফোন নাম্বার তো জানই।'

'জ্বে।'

কামালকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে নিজের বাসার দিকে এগোল শহীদ। সমস্ত এলাকাটা নিস্তব্ধ। কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে। বাসার সামনে গাড়ি থামাল সে। হর্ন বাজাতে বাজাতে চারদিকে তাকাল একবার। জ্যোৎস্না আর বৈদ্যুতিক আলো উভয়েই হার মেনেছে কুয়াশার কাছে। দৃষ্টি বেশি দূর যায় না। তবে সন্দেহজনক কিছু কাছে-পিঠে চোখে পড়ল না। তবু তার মনে হল, কে যেন তার দিকে লক্ষ্য রাখছে।

গফুর এসে গেট খুলে দিল। প্রাঙ্গণের মধ্যে গাড়ি ঢোকাল শহীদ। গেট বন্ধ করে গফুর ভিতরে চলে গেল।

গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে বাগান ও বারান্দা পেরিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকল শহীদ। একটু সুস্থির হয়ে বসে চিন্তা করতে হবে। গত কয়েক ঘন্টায় অভিজ্ঞতাগুলোকে লজিক্যালি ঢেলে সাজাতে হবে।

একটা সিগারেট ধরাল শহীদ। সোফার উপর দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে টানতে লাগল।

কি-চ্-চ!

অত্যন্ত চাপা একটা শব্দ শোনা গেল। রাস্তার দিক থেকে শব্দটা আসছে। কান খাড়া করল শহীদ। সমস্ত ইন্দ্রিয় মুহূর্তে হুঁশিয়ার হয়ে গেল। আর তার মনে হল, যেন এই শব্দটার জন্যেই এতক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা করছে। অবাঞ্ছিত অতিথির আবির্ভাব ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সোফাতে বসে থাকা বিপজ্জনক। উঠে সোফার পিছনে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রিভলভার বের করল পকেট থেকে। জানালার ঠিক সামনে মাথাটা বের করল সে মুহূর্তে, পরক্ষণেই সরে গেল। পর্দার উপর ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল।

এখন কি ঘটবে তা জানে শহীদ।

ঘটতে দেরিও হল না।

টমিগানের গর্জনে ভঙ্গ হল চারদিকের অন্তহীন স্তব্ধতা। ইসলাম সাহেবের ফটোটা মেঝেয় পড়ে গেল। দেয়াল থেকে ঝরে পড়ল চুন-সুরকি। জানালার পর্দাটায় অসংখ্য ছিদ্র। একটা পাল্লাও ভেঙে পড়ল।

চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল শহীদ। যেখানটায় সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গুলি পৌঁছুবার আশঙ্কা নেই।

অবশেষে থামল গর্জন। দোতলায় হৈ-চৈ শোনা গেল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

আবার গর্জে উঠল টমিগান।

না, আর দেরি করা যায় না। উবু হয়ে জানালার নিচে বসল শহীদ। হাতটা তুলে জানালার পর্দার নিচ দিয়ে রিভলভারটা বের করে ট্রিগার টিপল। শত্রু কোথায় তা সে জানে না। দরকারও নেই। দরকার শুধু প্রত্যুত্তর দানের। আন্দাজে গুলি চালাতে লাগল সে। ছয়টা গুলি শেষ হতে ছয় সেকেণ্ড লাগল।

আর গুলি নেই। দরকারও বোধহয় নেই। বাইরে টমিগানের গর্জন থেমে গেছে। দরজার দিকে এগোল সে। আবার গুলির শব্দ শোনা গেল। কিন্তু টমিগানের শব্দ নয় ওটা। অমানুষিক একটা আর্তনাদ শোনা গেল।

চিৎকার শোনা গেল বাড়ির ভিতরে। সশব্দে একটা গাড়ি চলে গেল রাস্তা দিয়ে।

সিঁড়িতে এলোমেলো শব্দ করে আর চিৎকার করতে করতে মহুয়া, লীনা আর গফুর এসে পৌঁছুল। কিন্তু শহীদ ততক্ষণে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে।

মহুয়া চিৎকার করে বলল, 'ওগো, যেয়ো না।'

সে-কথা কানে তুলল না শহীদ। দৌড়ে গেল সে গেটের দিকে। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, গেটের ঠিক বাইরেই পড়ে আছে একটা লোক। তখনও ছটফট করছে সে। শেষ ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটার দেহ নিস্পন্দ হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা নিরস্ত্র।

গেট খুলে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। কতক্ষণ সে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ছিল বলতে পারবে না। গাড়ির শব্দে তার সংবিৎ ফিরে এল। মুখ তুলে দেখল একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কাছে আসতেই চালক তার দিকে হাত নাড়ল। চিনতে পারল সে চালককে। কুয়াশা।

কিন্তু কুয়াশার গাড়িটা দাঁড়াল না। হুস করে বেরিয়ে গেল।

প্রতিবেশীরা হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে রিভলভার। একজন বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছেন। বটিও আছে একজনের হাতে। সকলেরই চোখে উদ্বেগ আর জিজ্ঞাসা।

মৃতদেহটা দেখে থমকে গেল ওরা। স্যুট পরা একটা লোককে এইভাবে পথের উপর মৃত অবস্থায় দেখবে বলে ওরা হয়ত আশা করেনি।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি, শহীদ সাহেব? ডাকাত পড়েছিল নাকি? কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, যেন যুদ্ধ বেধেছে!'

অন্য একজন বলল, 'ডাকাত ছাড়া আর কি? দেখেছেন তো, আজকাল ডাকাতরাও স্যুট পরে ডাকাতি করতে আসে।'

'কোন ক্ষতি-টতি···মানে, কেউ জখম হয়নি তো?'

'না। কয়েকটা জিনিস ভেঙেছে মাত্র।'

'তা যাক।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রশ্নকর্তা, 'উঃ কি মারাত্মক ব্যাপার! আল্লার মেহেরবাণীতে যে কোন ক্ষতি হয়নি এই ঢের। আমি তো সাহেব…।'

অন্য একজন বলল, 'কি সাহস, বলুন তো! শেষপর্যন্ত কিনা আপনার বাসায় হামলা!'

'ক'জন এসেছিল, শহীদ সাহেব?' অন্য একজন প্রশ্ন করল।

'আমি তা দেখতে পাইনি।'

'আহা, এই লোকটাকে যদি জ্যান্ত ধরা যেত তাহলে সব ক'টাকেই জালে ফেলা যেত।'

পুলিস এসে পৌঁছুল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল শহীদের দিকে।

উৎসাহী প্রতিবেশীদের আরও অনেক প্রশ্নের জবাব হয়ত দিতে হত শহীদকে। কিন্তু পুলিস দেখেই হোক আর শীতের তাড়নাতেই হোক তারা একে একে কেটে পড়ল।

চার

আটটার সময় ফোন এল ডালিয়া আকরামের বাসা থেকে। ফোন করল অভিনেতা বেলাল সিদ্দিকী। আত্মপরিচয় দিয়ে সে বলল, 'মিস ডালিয়া তো এখনও বাসায় ফেরেননি। আপনি নাকি রাতে এসেছিলেন, আর এ ব্যাপারে তোরাব আলীর সাথে আলাপও নাকি হয়েছে আপনার।'

'তোরাব আলী, মানে সেই বুড়ো লোকটা তো?'

'হ্যাঁ, বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। আপনি যদি দয়া করে একবার আসতেন…' আবেদন জানাল বেলাল সিদ্দিকী।

'বিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছুব আমি।'

কামালকে ফোন করে কতকগুলো জরুরি নির্দেশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহীদ।

দিব্যকান্তি এক তরুণ আর বুড়ো তোরাব আলী শহীদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ড্রইংরুমের খোলা দরজার সামনে গিয়ে সে দাঁড়াতেই তরুণ এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আমি বেলাল সিদ্দিকী। আপনি শহীদ খান তো?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন, বসুন।'

ড্রইংরুমের এক কোনায় ত্রস্ত মলিন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ো তোরাব আলী। শহীদকে দেখে তার বুকে যেন বল ফিরে এল। সে এগিয়ে এসে বলল, 'হুজুর, আপায় যে অহনও ফিরল না। কি করুম, হুজুর, অহন আমি?'

'অস্থির হয়ো না, তোরাব আলী। দেখি কি করা যায়। পুলিসে খবর দিয়েছ?'

জবাব দিল বেলাল সিদ্দিকী, 'এখনও দেয়া হয়নি। এই মুহূর্তে পুলিসে খবর দেয়া উচিত কিনা সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তাছাড়া ডালিয়ার পক্ষে এই ধরনের আকস্মিক অন্তর্ধান একেবারে নতুন ঘটনা নয়। অবশ্য ওর বাবার মৃত্যুর পর এটাই প্রথম। তবু তোরাব আলীর কাছে যা শুনলাম তাতে এবারের অন্তর্ধানকে অত সহজভাবে নেয়া সমীচীন বলেও মনে হচ্ছে না। আর পুলিসে খবর দেবার অধিকার আমার আছে কি না তা-ও বলতে পারছি না।'

'কি শুনলেন তোরাব আলীর কাছে?'

যুবক একটু থতমত খেয়ে বলল, 'এই যে…ডালিয়া বলে গেছে, সে না ফিরলে যেন আপনাকে খবর দেয়া হয়। তাতে মনে হয়, ডালিয়ার অন্তর্ধানের পেছনে কোন রহস্য থাকা বিচিত্র নয়। তবু আপনার সম্মতি না নিয়ে পুলিসে খবর দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিনি। তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও ভেবে দেখবার আছে। ডালিয়া সুন্দরী তরুণী। তার অন্তর্ধানের খবরটা মুখরোচক হতে পারে। নানারকম অর্থ আবিষ্কৃত হতে পারে।'

'তা বটে,' শহীদ চিন্তা করে বলল। 'আজকের দিনটা দেখা যাক উনি ফেরেন কিনা। অন্যথায় পুলিসে জানাতেই হবে খবরটা।'

'আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'অপরাধ নেবেন না,' শহীদ বেলাল সিদ্দিকীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ডালিয়ার আত্মীয় হন?'

সিদ্দিকী হেসে বলল, 'না। রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, আমি ওর বাল্যবন্ধু। তাছাড়া ওর প্রোডাকশনে আমি অভিনয় করছি।'

'আপনি কখন এসেছেন এখানে?'

'আটটার দিকে। এসেই খবরটা শুনলাম।'

'শুনেছি, গতকাল নাকি আপনাদের শূটিং ছিল। সেখানে যাবার কথা ছিল মিস ডালিয়ার। তা উনি কি সেখানে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলেন। তবে শূটিং হয়নি। ডিরেক্টর সাহেব হঠাৎ কাল বিকেল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডালিয়া ওখান থেকে বেরিয়েছিল সাড়ে আটটার দিকে। আমাকে বলেছিল, সে যাবে ড. কাওসার এলাহীর চেম্বারে। ওর মায়ের খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে, এখন-তখন অবস্থা।'

'ওঁর মা কোথায় আছেন? নারায়ণগঞ্জে?'

'জ্বি না। ড. এলাহীর স্যানাটোরিয়ামে। ডেমরার কাছে স্যানাটোরিয়ামটা, শীতলক্ষ্যার তীরে। হয়ত শুনে থাকবেন।'

শোনা ছিল না শহীদের।

সে বলল, 'মিস ডালিয়া কি স্যানাটোরিয়ামেই গিয়েছিলেন?'

'না। ড. এলাহীর চেম্বার মোহম্মদপুরে। ভদ্রলোক সকালে স্যানাটোরিয়ামে যান আর বিকেলে বসেন চেম্বারে। চেম্বারটা তাঁর বাসাতেই।'

সেখানে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'খোঁজ নিতে কোথাও বাকি রাখিনি। সেখান থেকে সোয়া ন'টায় বেরিয়ে গেছে বলে ডাক্তার সাহেব জানিয়েছেন। স্যানাটোরিয়ামে খোঁজ নিয়েছি। সেখানেও যায়নি। তাছাড়া পরশু সন্ধ্যাতেই নাকি সেখান থেকে ডালিয়া এসেছে। নারায়ণগঞ্জেও যায়নি। দারোয়ানকে ফোন করে জেনেছি।'

'অন্য কোন আত্মীয়ের বাসায়?'

'আত্মীয় বলতে ওদের কেউ এখানে নেই। আছে পশ্চিম বাংলায়। সেখানেই ডালিয়াদের আদিবাস। এখানে যেসব আত্মীয় আছে তারা নিতান্তই দূর সম্পর্কের। তাদের সাথে ডালিয়াদের যোগাযোগ ছিল না। হয়ত আত্মীয়দের দারিদ্র্য তার কারণ হতে পারে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ টেনে শহীদ প্রশ্ন করল, 'মিস ডালিয়া ডক্টর এলাহীর চেম্বার থেকে কখন বেরিয়েছে বলতে পারেন ?'

'সেখানে নাকি মাত্র মিনিট দশেক ছিল, ডাক্তার তো তাই বললেন। আমি অবশ্য ডাক্তারের আচরণে একটু বিস্মিতই হলাম।'

'বিস্মিত হলেন কেন?'

'ভদ্রলোক ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান তো বটেই। ডালিয়ার ভাবী বরও উনি। ভেবেছিলাম ভাবী-স্ত্রীর নিখোঁজ-খবরে উদ্বিগ্ন হবেন উনি, কিন্তু ওঁকে কেমন যেন নিরুদ্বিগ্ন নির্বিকার মনে হল।' একটু উষ্মা প্রকাশ পেল বেলালের কণ্ঠে।

শহীদও অবাক হল।

'অথচ দেখেন,' বেলাল বলল। 'আমার সাথে ডালিয়ার এমন কি সম্পর্ক আছে? কিন্তু এখন দেখছি আমিই যেন জড়িয়ে পড়েছি বেশি করে।'

'বিয়েটা কি ওরা, মানে মিস ডালিয়া আর ডাক্তার সাহেব নিজেরাই ঠিক করেছেন, না অভিভাবকরা?' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'প্রস্তাবটা ছিল আকরাম সাহেবের। তবে ডালিয়ার আপত্তি ছিল না। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। ড. এলাহী আকরাম সাহেবের পরম প্রিয়ভাজন ছিলেন। অনেক ব্যাপারে ওঁর উপর নির্ভর করতেন তিনি। নিজের ম্যানেজার ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারের কাছ থেকেই বুদ্ধি নিতেন বেশি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও। পাটের ব্যবসায় গুটিয়ে ফিল্মের ব্যবসায় নেমেছিলেন আকরাম সাহেব ড. এলাহীর পরামর্শেই। অন্যদিকে ড. এলাহীর স্যানাটোরিয়াম গড়ে তোলার টাকাটাও আকরাম সাহেবই দিয়েছেন। ডালিয়া আর ডাক্তারের বিয়েটা এতদিনে হয়েই যেত। কিন্তু আকরাম সাহেব আত্মহত্যা করলেন। আর মিসেস আকরাম ওই রাতেই মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওঁর তো এখন-

তখন অবস্থা। তাই বিয়েটা আপাতত স্থগিত রয়েছে।'

'মিসেস আকরামের কি হয়েছিল?'

তোরাব আলী বলল, 'আছাড় খাইয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পইড়া গেছিলেন আম্মায়।'

বেলাল ব্যাখ্যা করল, 'আকরাম সাহেব যেদিন আত্মহত্যা করেন সেইদিনই এই ঘটনা ঘটে। যতদূর মনে হয়, গুলির আওয়াজ শুনে উনি আকরাম সাহেবের রুমের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। যে ভাবেই হোক তিনি পড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গেছেন। অনেক জায়গায় আঘাত লাগে এবং উনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন।'

শহীদ বলল, 'আকরাম সাহেব তো আত্মহত্যা করেছেন, তাই না?'

'জ্বি হ্যাঁ।'

'কারণ কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'গলায় ক্যান্সার হয়েছিল ওঁর। খুব কষ্ট পেতেন। আমিও দেখেছি ওঁকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে। শেষটায় সম্ভবত যন্ত্রণা সইতে না পেরেই মুখের ভিতর রিভলভার ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেন। এ ঘটনা ঘটেছিল নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে।'

'মিস ডালিয়া ওই ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন?'

'উনি নারায়ণগঞ্জেই ছিলেন তহন। সাহেবের অসুখের খুব বাড়াবাড়ি হওনে উনি ওইহানেই থাকতেন।'

বেলাল বলল, 'ডালিয়া অবশ্য নারায়ণগঞ্জে বড় একটা থাকত না। মায়ের সাথে বনিবনা ছিল না ওর।'

শহীদ সপ্রশ্নদৃষ্টিতে বেলালের দিকে তাকাল।

বেলাল বলল, 'উনি ডালিয়ার আপন মা নন। সৎমা।'

'সেই জন্যেই কি মিস ডালিয়া পৃথক থাকতেন?'

'একেবারে সেই কারণেই আলাদা থাকত তা বলা ভুল হবে। কলেজে পড়বার সময় ডালিয়া এই বাসায় এসে ওঠে। তখন থেকেই সে এখানে থাকে। মাঝেমধ্যে নারায়ণগঞ্জে যায়। ওর বাবাও ঢাকায় এলে এখানেই থাকতেন। তবে অসুখের বাড়াবাড়ি হবার পর আর এ বাসায় আসেননি।'

'যদি কিছু মনে না কর তোরাব আলী, তোমার আপার রুমটা আমি দেখতে চাই একবার।'

'বেশ তো, আহেন না, হুজুর। এই তো পাশের রুমটাই আপার।'

শহীদ উঠে দাঁড়িয়ে বেলালকে বলল, 'আপনিও আসুন না।'

'চলুন,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল বেলাল সিদ্দিকী।

ডালিয়ার রুমটা সুসজ্জিত। চমৎকার করে সাজানো গোছানো। সুরুচির পরিচায়ক। ঘুরে ফিরে সমস্ত রুম পর্যবেক্ষণ করল শহীদ।

একপাশে ছোট লিখবার টেবিলটার উপর গুটিকয়েক ইংরেজি-বাংলা বই। অধিকাংশই রহস্যোপন্যাস। সেগুলো উল্টে-পাল্টে দেখল শহীদ।

বিছানাটা দামি বেড-কভারে ঢাকা। শয়নের চিহ্নমাত্র নেই। সাইড-টেবিলের উপর লেবেলহীন একটা ওষুধের শিশি। তার পাশে ছোট একটা কাগজের বাক্স। বাক্সটা খুলল শহীদ। সেটা খুলতেই দেখা গেল একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ।

বেলাল বলল, 'ড. এলাহীর সিরিঞ্জ ওটা। মাঝখানে জ্বরের জন্যে ইনজেকশন করা হয়েছিল রহিমের মাকে অর্থাৎ ডালিয়ার ঝিকে। ইনজেকশনটা দেবার জন্যে সিরিঞ্জটা এনেছিলেন ড. এলাহী। আর নেয়া হয়নি।'

সিরিঞ্জটা রেখে ওষুধের শিশিটা হাতে নিল শহীদ। ক্যাপটা খুলল। ভিতরে আর একটা রাবারের ক্যাপ দেখা গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করে দেখল, ক্যাপটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় সূঁচের সূক্ষ্ম একটা দাগ রয়েছে। শিশির ভিতরে অর্ধেকটা শূন্য।

সিরিঞ্জটা আবার হাতে নিল শহীদ। সে শিশি আর সিরিঞ্জ পকেটে ফেলে বলল, 'আমি নিয়ে গেলাম এ দুটো।'

আড়চোখে লক্ষ করল শহীদ বেলালের চেহারাটা কেমন যেন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। বেলাল বলল, 'তা নিয়ে যান।'

দেয়ালের দিকে তাকাল শহীদ। একদিকের দেয়ালে ফকির আকরামের ছবি। বকুল ফুলের একটা মালা ঝুলছে ছবিটার গায়ে। অন্য দেয়ালে এক সুন্দরী তরুণীর ছবি। সন্দেহ নেই ইনিই ডালিয়া আকরাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটা দেখল শহীদ। ভদ্রমহিলা যথার্থই সুন্দরী।

'মিস ডালিয়া পড়াশোনায় কতদূর?' বেলালকে জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'আই. এ. পাস করেছিল কষ্টে-সৃষ্টে। ভাল ছিল না পড়াশোনায়, যদিও চেষ্টার ক্রটি ছিল না। তা দরকারই বা কি বলুন, কোটিপতির একমাত্র মেয়ে।'

'তা বটে। আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেবেন, সিদ্দিকী সাহেব?'

'বলুন।'

'ডালিয়ার ধারণা ছিল ওঁর বাবা আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?'

বেলালের চেহারা দেখে মনে হল, সে যেন প্রশ্নটা শুনে ভীষণ অবাক হয়েছে। কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে শহীদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি যতদূর শুনেছি আত্মহত্যাই করেছেন আকরাম চাচাজী। আর ডালিয়া আমার কাছে তার সন্দেহের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি। আমার নিজেরও কখনও এ সম্ভাবনার কথা মনে হয়নি।'

'অথচ আমাকে উনি তাঁর বাবার খুনের রহস্যটা তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েই দেখা করতে বলেছিলেন,' শহীদ বলল। 'যাই হোক. এখন আসি আমি।

দরকার হলে আমাকে জানাবেন। আর যদি মিস ডালিয়া আজ সন্ধ্যার মধ্যে না ফেরেন তাহলে পুলিসে খবর জানাতে ভুলবেন না।'

বেলাল একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে ড. এলাহীর সাথে আলাপ করবেন?'

'তাই তো ভাবছি।'

'তাহলে পুলিসে খবর দেবার ব্যাপারটা তার কাছে জিজ্ঞেস করবেন। আমার ধারণা, ডালিয়ার সাথে ড. এলাহীর যখন বিয়েটা ঠিক হয়ে আছে, আর যেহেতু এখনও তিনিই ডালিয়ার প্রকৃত অভিভাবক সেক্ষেত্রে তাঁর সাথে আলাপ না করে পুলিসকে জানাতে আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছিনে। এর জন্যে উনি হয়ত আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন। বলতে গেলে এ সম্পর্কে আমার তো কোন এখতিয়ারই নেই।'

'ড. এলাহীর পক্ষ থেকে কোন আপত্তি আসবে বলে আশঙ্কা করছেন?'

'তা করছিনে। তবে ভাবী-বধূর নিখোঁজ খবরটা, লোক জানাজানি হোক তা উনি পছন্দ না-ও করতে পারেন। তাছাড়া আমি ডালিয়ার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখালে ডাক্তার সাহেব খুশি হবেন বলেও মনে হয় না। আবার এমনও হতে পারে যে, ডালিয়া কোথায় আছে তা উনি জানেন, কিন্তু যেহেতু খোঁজটা আমি করেছি তাই...।'

শহীদ হেসে বলল, 'তা ঠিক। আমি এ সম্পর্কে ড. এলাহীর সাথেই আলাপ করব।'

বেলাল তার ঠিকানা একটা কাগজে লিখে শহীদের হাতে দিয়ে বলল, 'দরকার হলে আমাকে জানাবেন, আমি যতটা পারি আপনার সাথে সহযোগিতা করব।'

এয়ারপোর্টের দিকে গাড়ি চালাল শহীদ। সেখানে কামালের অপেক্ষা করার কথা। হয়ত ইতিমধ্যেই সে পৌঁছে গেছে।

গাড়ি পার্ক করে সোজা চলে গেল সে ক্যান্টিনে।

কামাল এককোণে বসে সিগারেট টানছিল চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে। তার দৃষ্টি ছিল দরজার দিকে নিবদ্ধ। শহীদকে ঢুকতে দেখে সে সোজা হয়ে বসল। শহীদ চারদিকে তাকিয়ে কামালের দিকে এগিয়ে গেল। কামালের চেহারায় উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সে শহীদকে দেখেও যেন দেখল না। দরজার দিকেই তাকিয়ে রইল। শহীদ সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'থাক, তোকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি দেখেছি। কেউ পিছু লাগেনি আমার। তারচেয়ে বরং চায়ের অর্ডার দে। গলাটা শুকিয়ে গেছে বকবক করতে করতে।'

বেয়ারা ডেকে চা আর স্ন্যাকসের অর্ডার দিল কামাল।

বেয়ারা চলে যেতেই শহীদ প্রশ্ন করল, 'খবর আছে কিছু?'

'নিশ্চয়ই। তোর ধারণা সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট। সেই প্রকাণ্ড মুখওয়ালা

লোকটা, মানে বিল্পী ডলস্ হাউসের সামনে একটা লোক নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'ক'জন ছিল ওরা?'

'সেই বেবি-অস্টিনে করেই এসেছিল। চারজন ছিল গাড়িতে। বিল্পী ছিল পিছনে। গাড়ির নাম্বারটা টুকে নিয়েছি আমি,' এক টুকরো কাগজ পকেট থেকে বের করে শহীদের হাতে দিয়ে বলল, 'এই যে নাম্বার।'

নাম্বারটা দেখে কাগজটা ছিঁড়ে অ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে শহীদ বলল, 'এটা নকল নাম্বার।'

'নকল নাম্বার! কি করে বুঝলি?'

'আমার গাড়ির নাম্বার যে ওটা!'

'বলিস কিরে! আরে হ্যাঁ তাই তো। কিন্তু আমি তো ওই নাম্বারটাই টুকেছি।'

'সেটাই স্বাভাবিক। এসব অপরাধীর দল নিজেদের গাড়িতে আসল নাম্বার ব্যবহার করে না। চোরাই গাড়ি হলে অবশ্য আলাদা কথা।'

বোকার মত চেহারা করে বসে রইল কামাল।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

শহীদ চা বানাতে বানাতে বলল, 'যাকগে। এখন তোকে আরও একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক।'

'কামাল বুক উঁচিয়ে বলল, 'ভয় দেখাচ্ছিস? বিপদকে থোড়াই পরোয়া করে কামাল আহমদ।'

''বেশ, নিজেকে একজন গ্রাম্য ব্যবসায়ী হিসেবে কল্পনা কর।'

চোখ বুজে কামাল বলল, 'করলাম।'

'মনে কর, দুহাজার টাকা নিয়ে মাল কিনতে এসেছিস মানিকগঞ্জ থেকে লঞ্চে করে। সোয়ারীঘাটে নেমেছিস।'

'নামলাম।'

'কি ধরনের কাপড় তোর পরনে থাকবে?'

এবার চোখ খুলল কামাল।

'এই ধর—লুঙ্গি, জামা, একটা টুপি···এই আর কি,' কামাল জবাব দিল।

'লুঙ্গি থাকবে অবশ্য। তবে খুব ফাইন বাবুরহাটের লুঙ্গি হয় যেন। গায়ে হাতে-কাচা একটা জামা। তাতে যেন অবশ্যই ঘড়ি-পকেট থাকে। ঢোলা একটা কোট তার উপরে। কোমরে খাকী রঙের কাপড়ের একটা তহবিলে হাজার খানেক টাকা। কিছু থাকবে ঘড়ি-পকেটে আর কিছুটা কোটের পকেটে। কোটটা যেন অবশ্যই কিছুটা পোকায় কাটা থাকে। মাথায় তেল একটু বেশি করে দিবি, জুলপি বেয়ে যেন পড়ে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি হলে ভাল হত। কিন্তু তার জন্যে দুদিন অপেক্ষা করা দরকার, সেটা সম্ভব নয়।'

'বেশ, তারপর?'

'লঞ্চ থেকে তো আর নামতে পারছিস না। তা হোক। লঞ্চ যখন ঘাটে ভেড়ে ঠিক তখন পৌঁছলেই চলবে। ওহ্‌ ভাল কথা, হাতে একটা পুরানো পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ আর বগলে কম্বলে জড়ানো একটা বালিশ থাকতে হবে।'

'থাক।'

'দেখবি হোটেলে যাবার নিমন্ত্রণ জানাবে অনেকেই। জোর করে নিয়ে যেতে চাইবে। ব্যাগ আর পুঁটুলি ছিনিয়ে নেয়াও বিচিত্র নয়।'

'হুঁ।'

'তিনতলা বাড়িতে যে হোটেলটা আছে তার প্রতিনিধিকে চিনে নিতে পারবি? অর্থাৎ পরিষ্কার হোটেলে ঢুকতে পারবি?'

'জরুর পারেগা।'

'তো চালা যাও উধার। আশা করি একবেলাতেই তোর দু'হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে। তবে বাড়িটার অন্ধি-সন্ধি জেনে আসা চাই যতটা সম্ভব।'

'কবে যেতে হবে?'

'আজকেই। একঘন্টার মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে বেরুবি। দুটোর মধ্যে সেখানে পৌঁছা চাই। এক্ষুণি বেরিয়ে পড় তুই। আমি একটু পরে বেরোব।'

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়ল কামাল।

শহীদ বেরোল আধঘন্টা পরে।

সে নিউমার্কেটে গিয়ে ঢুকল এক কেমিস্টের দোকানে, দোকানদার ভদ্রলোক তার বিশেষ পরিচিত। তিনি একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আসুন, শহীদ সাহেব। কি মনে করে অভাগার দ্বারে?'

পকেট থেকে ডালিয়ার রুম থেকে আনা ওষুধের শিশি আর সিরিঞ্জটা এগিয়ে দিয়ে শহীদ বলল, 'এই শিশিটা কোন ওষুধের, বলতে পারেন?'

ভদ্রলোক শিশিটা হাতে নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে বললেন, 'কেমিক্যাল এক্সামিনেশন ছাড়া বলা যাবে না। ঠিক এই আকারের ফাইল আমাদের কাছে নেই। রেখে যান না হয়, আমাদের কেমিস্ট টেস্ট করে বলে দিতে পারবেন। বিকেলে আসুন।'

'বেশ, আর দেখবেন তো এই সিরিঞ্জে যে ওষুধটা সর্বশেষ ব্যবহার করা হয়েছে তা ধরা পড়ে কিনা।'

ভদ্রলোক শিশি আর সিরিঞ্জটা নিয়ে গেলেন। শহীদ বলল, 'বিকেলে যেন জানতে পারি।'

'অবশ্যই।'

পাঁচ

টেলিফোনে যোগাযোগ করল শহীদ ড. কায়সার এলাহীর সঙ্গে। রাত আটটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

পৌনে আটটায় শহীদ ড. এলাহীর চেম্বারে পৌঁছুল।

শেষ রোগী বিদায় নিতেই ড. এলাহী তাকে ডেকে পাঠাল।

একমুহূর্তে ডাক্তারকে জরিপ করে নিল শহীদ। লম্বা, বলতে গেলে অতিরিক্ত ঢ্যাঙা লোকটা। সেই তুলনায় দেহটা যথেষ্ট চওড়া নয়। রঙটা বেশি রকমের ফর্সা, ফ্লোরোসেন্ট টিউবের আলোয় কেমন ফ্যাকাসে দেখায়। মুখের তুলনায় নাকটা ছোট। সামনের দিকটা চ্যাপ্টা। তার নিচে সরু গোঁফের রেখা। জুলফি কানের নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। চুলগুলো কোঁকড়া। কপালের দু'পাশ থেকে চুল পড়ে যাওয়াতে কপালটা চওড়া দেখায়। দুচারটে ভাঁজও পড়েছে কপালে। বয়স, শহীদ অনুমান করল, পঁয়ত্রিশের কম নয়।

শহীদকে বসতে অনুরোধ করে ড. এলাহী তার সামনে সিগারেট-কেস খুলে ধরল।

একটা সিগারেট নিয়ে শহীদ অগ্নিসংযোগ করল। ডাক্তারও একটা সিগারেট ধরাল। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, 'আপনার নাম শুনেছি, শহীদ সাহেব, কিন্তু আমার কাছে আগমনের কারণটা অনেক চিন্তা করেও আন্দাজ করতে পারছিনে।'

শহীদ বলল, 'আমি এসেছি মিস ডালিয়া আকরামের খোঁজ করতে।'

'ডালিয়া আকরামের খোঁজ করতে এবং আমার এখানে!' বিস্ময় প্রকাশ করল ডাক্তার।

'জ্বি হ্যাঁ। গতকাল সন্ধ্যায় উনি বেরিয়েছেন বাসা থেকে। তারপর থেকে তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ভাবলাম, আপনার এখানে আসাটা অস্বাভাবিক নয়।'

'অস্বাভাবিক মোটেও নয়। সে এসেছিল বটে এখানে, রাত ন'টার দিকে। কিন্তু তক্ষুণি চলে গেছে। দেখুন শহীদ সাহেব, আপনি নিশ্চয় জেনে-শুনেই এসেছেন যে, ডালিয়া আমার ভাবী-স্ত্রী। তবু আমি একটু সাবেকী আমলের লোক। বিয়ের আগেই আমার স্ত্রী আমার বাড়িতে রাত কাটাবে, এতটা প্রগতিবাদী আর সংস্কারমুক্ত আমি নই, যদিও একথা ঠিক যে, আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অভাব নেই। মাঝে-মধ্যে আমরা একসাথে খাওয়া-দাওয়া করি। বেড়াই, সিনেমা দেখি। আর যাওয়া-আসা তো সর্বক্ষণ লেগেই আছে। তবে কাল এসেছিল ওর মায়ের অসুখ সম্পর্কে আলোচনা করতে। কিন্তু আসল কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'বলুন?'

ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আমার ভাবী-বধূ সম্পর্কে আপনার এত উৎসাহের কারণ বুঝতে পারছিনে। হয়ত জানেন যে, বিয়ে না হওয়া সত্ত্বেও আমিই ওর অভিভাবক। আমার নির্দেশ বা অনুরোধ ছাড়া আপনি তার খোঁজ করতে শুরু করলেন কি করে? এ দায়িত্ব তো আপনাকে কেউ দেয়নি? তাছাড়া ডালিয়া নিখোঁজ হয়েছে এই ধারণাই বা কেন হল!'

ভিতরে ভিতরে চটে গেলেও শহীদ তা প্রকাশ না করে সহজ গলায় বলল, 'এতটা আমার জানা ছিল না আগে। এখন জানতে পারলাম। কিন্তু আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাবটা দিচ্ছি। মিস ডালিয়াই আমাকে একটা তদন্ত পরিচালনার অনুরোধ করেছিলেন। সে সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও হয়েছিল। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট উনি রক্ষা করতে পারেননি। পরে দেখলাম, উনি নিখোঁজ হয়েছেন। সুতরাং আপনার কাছে আসতেই হল। আশা করি, এমন কিছু অন্যায় হয়নি?'

ডাক্তার একটু চুপসে গিয়ে আমতা-আমতা করে বলল, 'কিন্তু তদন্তটা কিসের তা তো বুঝতে পারলাম না?'

'জানি না, আপনার সাথে মিস ডালিয়া কখনও এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিনা। তবে আমাকে বলেছেন যে, ওঁর ধারণা ওঁর বাবা আত্মহত্যা করেননি। ওনাকে খুন করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যেই উনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে না পারায় আমিই ওঁকে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'অবশ্য ওর পক্ষে ওইরকম ধারণা পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়, যদিও আসলে এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই।'

'হয়ত কোন প্রমাণ ওঁর হাতে এসেছে।'

ডাক্তার সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'এটা হতেই পারে না। আসলে কি জানেন, আকরাম সাহেবের মর্মান্তিক আত্মহত্যা ডালিয়াকে মনের দিক থেকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। ওর কাছে ওর বাবা ছিলেন এক আদর্শপুরুষ—অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। উনি আত্মহত্যা করতে পারেন, এটা ডালিয়া তখনও বিশ্বাস করেনি এখনও করে না। ফলে, ক্রমে ক্রমে ডালিয়া একটু ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে খেপে উঠেছে মাকে নিয়ে। ওর ধারণা, আমার স্যানাটোরিয়ামে ওর মায়ের ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না। মাকে সে এখন তার কাছে রেখে চিকিৎসা করাতে চায়। অন্তত নিজ হাতে তাঁকে শুশ্রূষা করতে পারবে এই আশায়।'

'শুনেছি, ভদ্রমহিলা ওঁর বিমাতা।'

'হ্যাঁ. মার সঙ্গে বনিবনাও বড একটা ছিল না ডালিয়ার। কিন্তু এখন সেই মা-

ই তার জীবিত নিকটতম আত্মীয়। ওর ধারণা, এতদিন ও মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। তাই অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে সেবা-যত্ন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় ও।'

'আপনি বলতে চাইছেন, মিস ডালিয়ার মনটা এখন সব মিলিয়ে অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত আছে?'

'তা···হ্যাঁ, তাই বলতে পারেন।' সায় দিল ডাক্তার, 'বিয়েটা হয়ে গেলে অবশ্য ডালিয়া নিজেও অনেকটা সুস্থ হত। কিন্তু মায়ের এই অবস্থায় ডালিয়া তা কল্পনাও করতে পারে না।'

'আপনি বলতে চাইছেন, আকরাম সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে ডালিয়ার সন্দেহ ভিত্তিহীন? আপনি তো আকরাম সাহেবকে চিকিৎসা করেছেন। আপনার কি ধারণা, উনি আত্মহত্যাই করেছেন?'

'নিঃসন্দেহে।'

'কোন কারণ ছিল?'

ডাক্তার সিগারেটের শেষাংশ অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, 'অন্তত তাঁর কাছে তো ছিল-ই।'

'আর আপনার মতে?'

একটু ইতস্তত করে ডাক্তার বলল, 'আকরাম সাহেবের ধারণা ছিল, ওঁর গলায় মারাত্মক রোগ বাসা বেঁধেছে। এই চিন্তা ওঁকে দিশেহারা করে তুলেছিল। নিজেকে উনি একেবারে গুটিয়ে ফেলেছিলেন। আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, উনি অবস্থা যতটা খারাপ মনে করেছিলেন ততটা খারাপ ছিল না। কিন্তু উনি বিশ্বাস করেননি।'

শহীদ আর একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'কিন্তু ওঁর কণ্ঠনালীর অবস্থাটা আসলে কেমন ছিল? নিরাময়যোগ্য ছিল কি?'

'আমার মতে, ছিল না। কিন্তু ওঁকে তো উল্টো কথাটাই বলতে হয়েছে। ওঁর মা মারা গিয়েছিলেন ক্যান্সারে। আর আমরা যাই বলি না কেন ওঁর ধারণা হয়েছিল, ওঁর ক্যান্সার হয়েছে। অথচ আমরা তা ওঁর কাছ থেকে গোপন রেখেছিলাম। আত্মহত্যার রাতে উনি হয়ত হতাশার চরমে পৌঁছেছিলেন।'

'মিস ডালিয়া নিশ্চয়ই বাপের মানসিক অবস্থা জানতেন। তারপরেও কেন ওঁর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল যে, ওঁর বাবা আত্মহত্যা করেননি?'

'ডালিয়া জানত নিশ্চয়ই। কিন্তু সে তা নিজের কাছে স্বীকার করতে রাজি নয়। ওর কাছে ওর বাবা ছিলেন এক মহাপুরুষ। ডালিয়া নিজেও অত্যন্ত মজবুত মেয়ে। সে জানে, আত্মহত্যা করা কাপুরুষতা। ওর বাবা কাপুরুষ, তা যেন ও ভাবতেই পারে না।'

'আপনার সাথে নিশ্চয়ই মিস ডালিয়া এসব নিয়ে আলাপ করেছেন?'

'প্রথম দিকে করত। কিন্তু ইদানীং কিছু বলে না। আমার সঙ্গে ইদানীং সে শুধু তার মায়ের অসুখ সম্পর্কেই আলোচনা করে।'

'ওর মায়ের কি হয়েছে? মানে, উনি কি অসুখে ভুগছেন?'

ডাক্তার ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে-ও এক ট্র্যাজেডী, শহীদ সাহেব। ডালিয়ার বাপ যে রাতে আত্মহত্যা করেন সেই রাতেই মিসেস আকরামকে সিঁড়ির গোড়ায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

'কি হয়েছিল ওঁর?'

'মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, যা কিনা বাহ্যিক জখমের চাইতেও মারাত্মক। অবশ্য ফ্র্যাকচারও হয়েছে দুজায়গায়।'

'কিভাবে হয়েছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না। ঘটনাস্থলে তখন কেউ ছিল না। চাকর-বাকরগুলো কোথায় যেন গিয়েছিল। ডালিয়া ছিল বাগানে বসে। কাছে-পিঠে কেউ ছিল না। তবে মনে হয়, স্বামীর রূম থেকে রিভলভারের আওয়াজ শুনে উনি দৌড়ে যাচ্ছিলেন। সম্ভবত সিঁড়ির মাথাতে যখন পৌঁছোন সেই মুহূর্তে ওঁর স্ট্রোক হয়। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে চলে যান।'

'উনি নিজে কি বলেন?'

মাথা নাড়াল ডাক্তার। আবার একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সেইটাই তো চরম ট্র্যাজেডী। কিছু বলবার মত জ্ঞান উনি এখনও ফিরে পাননি, পাবেন সে ভরসাও দেখছিনে।'

পিছন দিকে ফিরে র‍্যাক থেকে বেছে একটা বড় ম্যানিলা এনভেলাপ বের করল ডাক্তার। সেটা টেবিলের উপর রেখে সে বলল, 'মিসেস আকরামের আঘাতের পরিমাণ জানতে আপনার ঔৎসুক্য থাকতে পারে।'

খামটা থেকে চারটে ধূসর রঙের নেগেটিভ বের করল ডাক্তার।

'এগুলো হল মিসেস আকরামের ক্ষতস্থানগুলোর এক্স-রে। জখম হওয়ার পর এইগুলোই প্রথম নেয়া হয়।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে কোণের বাক্সের আকারের একটা কেবিনেটের আলো জ্বালল। একটা নেগেটিভ বেছে নিয়ে তা আলোর সামনে ধরে শহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

একটি করোটির রূপরেখা শহীদের চোখের উপর ভেসে উঠল। কানের কাছে বেশ বড় আকারের একটা কালো জায়গা। ডাক্তার ওই কালো জায়গাটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'পড়ে গিয়ে মিসেস আকরাম কানের কাছে অত্যন্ত মারাত্মক চোট পেয়েছেন। ফলে ভিতরটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।'

সেটা রেখে আর একটা নেগেটিভ হাতে নিল ডাক্তার।

শহীদ বলল, 'থাক ডাক্তার সাহেব, ওসব দেখবার দরকার নেই। আপনার

মুখের কথাই যথেষ্ট।'

ডাক্তার যেন তা শুনতেই পেল না। সে বলল, 'এটাতে দেখুন চোয়ালেও ফ্র্যাকচার হয়েছে। হাতেও ফ্র্যাকচার হয়েছে, এই যে, এটাতে দেখুন। ওঁর যা বয়স তাতে বুঝতেই পারছেন ওই ধরনের আঘাত কি মারাত্মক হতে পারে।'

শহীদ চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ নীরবে সিগারেট টানল। ডাক্তার নেগেটিভগুলো গুছিয়ে এনভেলাপে ভরে র‍্যাকে রাখল।

'আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আকরাম সাহেবের চাকর-বাকরগুলো বিশ্বস্ত ছিল তো?'

'হ্যাঁ, সবাই প্রায় পুরানো চাকর-বাকর,' ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, 'আকরাম সাহেব যদি খুন হয়েও থাকেন তাহলেও অন্তত চাকর-বাকরের হাতে হননি।'

'বেলাল সিদ্দিকী সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

ডাক্তার কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে শহীদের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি ওকে খুব স্নেহ করি। ডালিয়ার বাল্যবন্ধু ছেলেটি। তাই সে আমারও বন্ধু। আশা করি, এরপরে আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

'আপাতত নেই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'বলুন?'

'ডালিয়ার অন্তর্ধানে আপনি যে এতটুকু বিচলিত হননি কেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।'

'এটা ডালিয়ার পক্ষে নতুন কোন ঘটনা নয়। মাঝে-মধ্যে ও এরকম করেই থাকে। আবার কয়েকদিন পরে ফিরে আসে। না, সন্দেহজনক কিছু নেই। যে-কোন মুহূর্তে ডালিয়া ফিরে আসতে পারে। তখন ওকে বরং বকে দেবেন। আর ওর কথায় তদন্ত করতে গিয়ে অহেতুক হয়রান হবেন না। আকরাম সাহেব আত্মহত্যা করেননি। তবু দরকার হলে পুলিসের কাছ থেকে ফাইল-পত্র নিয়ে দেখতে পারেন। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পড়লেও আপনার সন্দেহ ঘুচবে।

ছয়

পরদিন সকালে শহীদ গিয়ে হাজির হল মি. সিম্পসনের অফিসে। মি. সিম্পসন অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আরে, এস এস। খবর কি? তোমার বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছিল?'

'ব্যাপারটা অনেকটা তাই। আর সেই ব্যাপারেই আমি এসেছি।'

'শোনাও তো দেখি?'

গত দুদিনের ঘটনার বিশদ বিবরণ দিল শহীদ।

মি. সিম্পসন সবটা শুনে বললেন, 'কিন্তু ফকির আকরাম যে আত্মহত্যা

করেছেন সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। ময়না তদন্তেও তাই বলা হয়েছে। আর বর্তমান সিভিল সার্জন রেজাউদ্দিনকে তো জান। তার ভুল হয় না।'

'রেজাকে আমি ভাল করেই জানি। ওর ভুল বড় একটা হয় না, তা ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে যে হয়নি, তা-ও তো আপনি বা রেজা কেউই জোর করে বলতে পারেন না।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করলেন মি. সিম্পসন।

'তাছাড়া ঘটনাগুলোকেও তো বিচার করতে হবে। তিনমাস আগে আকরাম সাহেব মারা গেছেন। এর মধ্যে মিস ডালিয়া নিরুদ্দেশ হননি। যেদিন উনি আমাকে সন্দেহের কথা জানিয়ে তদন্তের জন্যে অনুরোধ করলেন সেইদিনই নিখোঁজ হলেন তিনি। আর আমার উপর দুবার বুলেট বৃষ্টি হল। আপনি এ ঘটনাগুলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'হুঁ, তা তুমি এখন কি করতে চাও?'

'আমি ময়না তদন্তের রিপোর্ট আর মৃতদেহের ছবিগুলো দেখতে চাই। আপনি সেই ব্যবস্থা করে দিন।'

'তাহলে রেজার কাছে চলে যাও।'

'কিন্তু আপনার নির্দেশ ছাড়া রেজা আমাকে ওগুলো দেখাবে কেন?'

'এখুনি যাবে?'

'এখুনি।'

মি. সিম্পসন একখণ্ড কাগজে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লিখে শহীদের হাতে দিলেন। সেটা পকেটে ফেলে বেরিয়ে এল শহীদ। সোজা চলে গেল সে সিভিল সার্জনের অফিসে।

সিভিল সার্জন রেজাউদ্দিন ল্যাবরেটরিতেই ছিলেন। সহকারীর কাছে জানতে পেরে হাতের কাজ সেরে অফিসরুমে ঢুকলেন।

'আরে, আমাদের শহীদ ডিটেকটিভ যে! কি মনে করে? রাস্তা ভুলে এসে পড়েছিস নাকি?'

'না, পথ ভুলে নয়। নিতান্ত দায়ে ঠেকে।'

সার্জন বসতে বসতে বললেন, 'তা কি ব্যাপার, বল?'

শহীদ মি. সিম্পসনের নোটটা সার্জনের দিকে এগিয়ে দিল।

রেজাউদ্দিন সেটা পড়ে বললেন, 'কিন্তু ওটা যে সত্যি আত্মহত্যা।'

'ওঁর মেয়ের ধারণা, ওটা খুন। শুধু অনুমান নয়, এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস।'

সজোরে মাথা নাড়ল সার্জন, 'অসম্ভব।'

শহীদ একটু চিন্তা করে বলল, 'তোরই বা এতটা নিশ্চিত হবার কারণ কি?'

'আর কিছু যে হতেই পারে না। অন্য কিছু হবার কোন অবকাশই তো নেই। অন্য কোন ধারণাই তো করা যায় না।'

'কিন্তু তোর তো ভুলও হতে পারে?' ইতস্তত করে বলল শহীদ।

সার্জন কিছুক্ষণ শহীদের দিকে নীরবে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'তোর ধৃষ্টতা ক্ষমা করলাম, তবু বলি, ভুল আমার হতে পারে বৈকি! মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু এই বিশেষ কেসটিতে ভুল করার কোন অবকাশই ছিল না। তবু তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ করলি তাই বলছি, তুই যদি আমার মুখে জোর করে রিভলভার পুরে দিস তাহলে আমার মুখে ধস্তাধস্তির অথবা বাধা দেবার কোন চিহ্ন থাকবে না? তুই-ই বল?'

'তাই তো থাকা উচিত।'

'বেশ। তাহলে দ্যাখ। জাস্ট এ মিনিট।'

সিভিল সার্জন উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুললেন। লাল রিবনে বাঁধা অনেকগুলো এনভেলাপের মধ্যে থেকে একটা এনভেলাপ এনে টেবিলের উপর রাখলেন তিনি। রিবন খুলে এনভেলাপের মধ্যে থেকে কয়েকটা ফটো বের করলেন। তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিয়ে শহীদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা দ্যাখ, কোন চিহ্ন মুখে আছে কি?'

ফটোটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল শহীদ। তারপর বলল, 'বুলেটটা মাথার খুলি ভেদ করে গেছে, তাই না?'

'মুখের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র পুরে আত্মহত্যা করার ওটাই একমাত্র লক্ষণ। তুই করলেও ওভাবেই করবি। কিন্তু অন্য কেউ যদি জোর করে তোর মুখে রিভলভার গুঁজে দিতে চায় তাহলে তো তুই তাকে অনুমতি দিবিনে। বরং কিছু না কিছু বাধা দেবার চেষ্টা করবি। চেহারায় তা প্রকাশ পাবেই।'

'হুঁ। তোর কথাটা ভেবে দেখবার মত।' ফটোটা ফিরিয়ে দিয়ে শহীদ সিলিং-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'সেক্ষেত্রে অবশ্য বুলেটটা সিলিং-এর দিকে ধাবিত হবে এবং সম্ভবত সেখানেই ঢুকে থাকবে। বলতে পারিস বুলেটটা সিলিং-এ পাওয়া গেছে কি না?'

মাথা নাড়ল সিভিল সার্জন।

'পাওয়া যায়নি বলেই জানি। পুলিস অনেক খুঁজেছে। কোথাও বুলেটটা পাওয়া যায়নি। কিন্তু বুলেটটা সিলিং পর্যন্ত পৌঁছুবেই, একথা কেন বলছিস? মাথার খুলি ভেদ করে বেরোতে গিয়ে যদি বুলেটের শক্তি ফুরিয়ে যায় তা হলে সেটা বিছানা বা মেঝেতে পড়বে। তারপর হৈ-চৈ আর বিভ্রান্তির মধ্যে কোথাও হারিয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়।'

'এ কথাটা ভেবে দেখবার মত,' শহীদ কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর গাত্রোত্থান করে বলল। 'যাক, আমি উঠি, ভাই। তোকে জ্বালাতন করে গেলাম।'

'আরে, তাতে কি! দরকার হলেই আসবি। মহুয়া বৌদি ভাল আছেন?'

'আছে ভালই। তুই আসিস আমার বাসায়। বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে।'

রেজাউদ্দিন জানাল, সে যাবে।

নিউমার্কেটে কেমিস্টের দোকানে গেল শহীদ।

মালিক সম্বর্ধনা জানিয়ে বলল, 'এই যে শহীদ সাহেব, এসেছেন, আপনার কাজটা তো গতকালই করে রেখেছি।'

ড্রয়ারের ভিতর থেকে একটা প্যাকেট বের করে তিনি বললেন, 'এর মধ্যে আপনার জিনিস আছে।'

'পরীক্ষার ফল কি?'

'মর্ফিয়া। শিশি আর সিরিঞ্জ দুটোতেই।'

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শহীদ বেরিয়ে এল।

বাসায় ফিরে দেখে কামাল শুকনো মুখে বসে আছে বারান্দায়।

শহীদ বলল, 'কিরে? কে মেরেছে, কে বকেছে, কে দিয়েছে গাল?'

কামাল ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সবকটা টাকাই একেবারে গচ্চা দিয়ে আসতে হল। তবে উদারতার সীমা নেই ওদের। মানিকগঞ্জে ফিরে যাবার জন্যে লঞ্চ ভাড়া পাঁচ টাকা দিয়েছে।'

'জান নিয়ে যে ফিরতে পেরেছিস এই ঢের। কেউ লাগেনি তো পিছনে?'

'না। সেদিকে আমি খুব হুঁশিয়ার।'

'তা খবর আনতে পারলি কিছু?'

'তেমন কিছু না। তিনতলা বাড়িটা পশ্চিমমুখো। নিচতলায় রাস্তার ধার ঘেঁসে পাইকারী দোকান। ওখান থেকে ভেজাল জিনিস সাপ্লাই দেওয়া হয়। দোকানের দু'পাশে সিঁড়ি। উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার হোটেলে যেতে হয়, আর দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। শুনলাম, দোতলাটা নাকি স্টোর। দক্ষিণের সিঁড়িতে অষ্টপ্রহর গুণ্ডামত একটা লোক বসে থাকে। কথায়-বার্তায় বুঝলাম, মালিক দোতলাতেই বসে। তার নাম নাকি মোহাম্মদ মোল্লা। ভদ্রলোক নাকি অসুস্থ, চলাফেরা করতে পারে না। নিচে নামে না, কারও সঙ্গে দেখাও করে না। অনেক বড় বড় ডাক্তার তাকে দেখতে আসে, এবং চমকাবি না, ড. কায়সার এলাহীও তাদের অন্যতম।'

'বাহ্, তাহলে তোর দু'হাজার টাকায় তো বেশ পুষিয়ে গেছে। অনেক খবর এনেছিস। জুয়োর আড্ডাটা কোথায়, বল তো?' খুশি হয়ে বলল শহীদ।

'নিচে। রাস্তার পাশে যে রুমটা আছে তার পিছনেরটাই। ফ্ল্যাশ, ব্ল্যাক-জ্যাক, রুলেত সব খেলাই হয়। মেয়েও আছে দলে। ওরা জাঁদরেল সব খদ্দের জোগাড় করে।'

'একেবারে বৈজ্ঞানিক কায়দায় চালাচ্ছে ব্যবসা।'

'হ্যাঁ, তবে খেলায় ভীষণ চুরি করে।'

'তা তো করবেই। তবে হ্যাঁ. দিন ওদের ঘনিয়ে এসেছে। ভাল কথা, গাড়িটার

পাত্তা মিলেছে?'

'কোনটা? সেই অস্টিন? না। ওটা দেখলাম না কোথাও।'

'তা যাকগে। তুই বোস, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।'

'এখানেই খেয়ে যাবি। এবার তোর কাজ হবে বেলাল ছোকরা, ডালিয়া আর ড. এলাহীর খবরাখবর সংগ্রহ করা। বেলাল তো চিত্রজগতের লোক। সেখানে তো তোর বন্ধুর অভাব নেই। অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই?'

কামাল ঘাড় নেড়ে জানাল যে, অসুবিধা হবে না।

খেতে বসে কামাল জিজ্ঞেস করল, 'তোর ওদিকের খবর কি? হত্যা না আত্মহত্যা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলি?'

শহীদ বলল, 'আত্মহত্যাই যদি হবে তাহলে মিস ডালিয়াই বা কেন অন্তর্ধান করবে, আর আমার উপরই বা কেন বুলেট-বৃষ্টি হবে, বল?'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু প্রমাণ পেলি কোন?'

'প্রমাণটাই তো পাচ্ছিনে। সিভিল সার্জন বলল, 'ওটা সত্যিই আত্মহত্যা। অথচ শুধু যদি বুলেটটা, মানে যে বুলেট আকরাম সাহেবের মৃত্যুর জন্যে দায়ী সেটার হদিস পাওয়া যেত তাহলে সম্ভবত আমি প্রমাণ করতে পারতাম যে, ওটা হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'কি রকম?'

শহীদ বলল, 'বুলেটটা হিসেব অনুযায়ী সিলিং-এ পাওয়া উচিত। কিন্তু সিলিং-এ পাওয়া যায়নি। সেখানে কোন চিহ্নও নেই বুলেটের। সিভিল সার্জনের ধারণা, ফকির আকরামের মাথার খুলি ভেদ করার সময়ই বুলেটের শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে বুলেটটা সিলিং-এর দিকে না গিয়ে নিচে পড়েছিল। তারপর গোলমালের মধ্যে কোন ফাঁকে হারিয়ে গেছে।'

'তা সেটা তো অসম্ভব নয়?'

'এ ক্ষেত্রে তো অসম্ভবই বটে।'

'কারণ?'

'বুলেটটা ছিল ·38। তার গতিশক্তি কেমন তা তো জানিসই। আকরাম সাহেবের মাথায় যদি ইস্পাতের লাইনিং থাকত শুধু তাইলেই ·38-এর পক্ষে গতিবেগ হারিয়ে ফেলা সম্ভব।'

কামাল বিভ্রান্ত হয়ে বলল, 'তাই তো। তাহলে গেল কোথায় বুলেটটা?'

শহীদ শুকনো হাসি হেসে বলল, 'সেটাই তো প্রশ্ন।'

খাওয়া শেষ হতেই শহীদ বলল, 'তুই পরিষ্কার হোটেলে যাবার রাস্তার একটা নকশা এঁকে দে আমাকে।'

'যাবি নাকি তুই সেখানে?'

'যেতেই হবে এবং আজ রাতেই।'

সাত

শীতটা সে রাতে বেশ জাঁকিয়েই পড়েছিল। বুড়িগঙ্গা থেকে কনকনে হাওয়া ভেসে আসছিল! পথে লোক চলাচল বিরল। সোয়ারী ঘাটের একটা সঙ্কীর্ণ গলি দিয়ে হেঁটে চলেছে শহীদ। সঙ্গে তার অপরূপ বেশভূষা। লুঙ্গির উপর সার্জের পাঞ্জাবী। তার উপর ঢিলে একটা কোট! মাথায় কম্ফরটার জড়ানো। চিবুকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লাগানো নকল দাড়ি। নাকের পাশেই বেশ বড় আকারের একটা তিল। চাহনিতে একটা বোকা বোকা ভাব। সব মিলিয়ে গ্রাম থেকে সদ্য-শহরে-আসা লোকের মত লাগছে তাকে।

বেরোবার সময় মহুয়াই শহীদকে দেখে চমকে উঠেছিল।

মোড়ের দোকান থেকে পান মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে এগোচ্ছিল সে। সমস্ত ইন্দ্রিয় তার সজাগ। কামালের আঁকা নকশার কথা স্মরণ করে হাতের বাঁয়ের বাড়িগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল শহীদ।

উদ্দিষ্ট বাড়িটা চোখে পড়তেই শহীদের গতি আরও মন্থর হল।

কামাল যেমনটি বলেছিল ঠিক তেমনি রাস্তার পাশেই একটা রুম। তার এপাশে-ওপাশে বারান্দা দেখা যাচ্ছিল একটু দূরের রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোয়। পথের উপরেও রুমটার একটা খোলা পাল্লা দিয়ে আলো আসছে। ভিতর থেকে আলোর রেখা ভেসে আসছে। এটা নিশ্চয়ই হোটেলের সিঁড়ির দরজা।

রুমটার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাল শহীদ। কাউকে দেখা গেল না। রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল ওপাশের সরু বারান্দার উপর একটা লোক আপাদ-মস্তক কালো চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা সিগারেট। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ।

একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কামালের বর্ণনা অনুযায়ী এটাই দোতলার অর্থাৎ বিল্লাহর রুমে ঢুকবার পথ। অবশ্য মোহাম্মদ মোল্লাই যদি বিল্লাহ হয়। হবে যে তাতে সন্দেহ নেই। এই লোকটা নিশ্চয়ই প্রহরী।

ভিতরে কি করে ঢুকবে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই তার ছিল না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে, এটাই ছিল তার প্ল্যান। লোকটাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল শহীদ।

কোটের পকেট থেকে একটা স্টার সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, 'একটু আগুন দিবেন, মিয়াভাই?'

লোকটা নিঃশব্দে তার হাতের সিগারেট বাড়িয়ে দিল। সেটা নিয়ে সিগারেট ধরাল শহীদ। লোকটাকে সিগারেটটা ফেরত দিয়ে আড়চোখে সে দেখল, লোকটা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কয়েকটা টান দিয়ে জুৎ করে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে শহীদ বলল, 'মিয়াভাই, এইডাই তো ঘাটে যাওনের রাস্তা? রাস্তা যে কয়বার ভুল করলাম!'

লোকটা মুখ খুলল। তবে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

'যাইবেন কই?'

'সোয়ারী ঘাটে, চাঁন মিয়া সাহেবের হোটেলে। সেহানেই যাইতাম চাই। রাইত-বিরাইত সঙ্গে পয়সা-কড়ি লইয়া চলন-ফিরন ভালা না। তা মিয়াভাই, এই রাস্তায়ই তো যামু?'

লোকটা নীরবে জরিপ করতে লাগল শহীদকে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্যে।

শহীদ মনে মনে বলল, ওষুধ ধরেছে।

'পথ ঠিকই আছে। ভুল করেন নাই। সিধা যান।'

একটু হতাশ হল শহীদ। দু'পা এগিয়ে গেল সে।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি কই?'

আবার দাঁড়াল শহীদ।

'রামচন্দ্রপুর।'

'বেড়াইতে আইছেন?'

'জে না। মাল খরিদ করনের লাইগা। রেডিমেড কাপড়।'

'তা সোয়ারী ঘাটে আর এত কষ্ট কইরা যাইবেন কেন? আমাগো এইডাই তো হোটেল। জবর ভালা হোটেল। দেহেন না কত বড় বাড়ি!'

'এইডাও হোটেল!' বিস্মিত হবার ভান করল শহীদ, 'এই এত বড় বাড়িডাই হোটেল!'

'কেন, বিশ্বাস হয় না?'

'তা, তা অয়। তবে কিনা…।'

'তাইলে এহানেই উইডা পড়েন। শীতের রাইত। আরামে থাকবেন। তাছাড়া খুব সস্তাও।' প্রলোভন দেখাল সে শহীদকে।

একটু ইতস্তত করল শহীদ, 'কিন্তুক চাঁন মিয়ার হোটেলে আমার তালতো ভাই আছে। হে আবার চিন্তা করব। হে কইচে, ট্যাকা-পয়সা চাঁন মিয়ার কাছে রাইখা নিশ্চিন্তি। হের পর ফুর্তি-টুর্তি যা করবার চাও কর।'

'আরে, মিয়াভাই, ফুর্তির ব্যবস্থা তো এহানেই আছে,' শহীদের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল লোকটা।

শহীদ সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকাল।

লোভে ও ধূর্ততায় তার দু'চোখ ধিকধিক করে জ্বলছে। টোপ ফেলা সার্থক হয়েছে শহীদের। সাদর আমন্ত্রণ এসেছে বাঘের খাঁচায় ঢোকবার। এখন শেষরক্ষা করতে পারলে হয়। তবু একটু দ্বিধার ভাব করল, 'আমার সাথে কিন্তুক ল্যাপ-

খ্যাতা নাই।'

লোকটা একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'সে তো দেখতেই আছি। তা মিয়া, বড় হোটেলে ল্যাপ-খ্যাতা আনন লাগে না। আহেন, আহেন। জারের মইধ্যে আর খাড়াইয়া কষ্ট কইরেন না।'

'লন চলেন। খাড়ান, মিয়াভাই। আর একটা সিগারেট ধরাইয়া লই।' প্যাকেট বের করে আরও একটা সিগারেট ধরাল আগেরটার আগুনে। তারপর বলল, 'চলেন।'

লোকটা একটু সরে দাঁড়িয়ে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে বলল, 'এই যে ঢুইকা পড়েন। এই তো দরজা।'

শহীদ খুশি হল। একটু শঙ্কিতও হল। সে ভেবেছিল, লোকটা তাকে হোটেলের সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাবে। এটা যে হোটেলের অর্থাৎ তিনতলার সিঁড়ি নয় কামাল তাকে তা আগেই বলেছে। এটা হচ্ছে বিল্লাহর রুমের সিঁড়ি। এর দুটো অর্থ হতে পারে। একটা হল, লোকটা নিজেই তাকে বেকায়দায় ফেলে টাকা-পয়সা কেড়ে নেবে। এমন একটা শিকার সে একাই ভোগ করবার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়ত লোকটা হয়ত তাকে চিনে ফেলেছে। তার মতলব টের পেয়েছে। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে নিজের থেকেই সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যাই হোক এখন আর ফেরবার অবকাশ নেই। তবে লোকটাকে কোন চান্স সে দেবে না। প্রথম সুযোগেই তাকে ঘায়েল করতে হবে।

সামনে অন্ধকার।

শহীদ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বড় আন্ধার, মিয়াভাই।'

'তাই তো। বাত্তি জ্বালান অয় নাই। খাড়ান, আলো জ্বালাইয়া দেই।'

লোকটা ভিতরে ঢুকে দেশলাই জ্বালিয়ে বলল, 'আহেন আমার পিছনে পিছনে।'

শহীদ ঢুকল তার পিছনে। পাশেই একটা সিঁড়ি দেখা গেল দেশলাইয়ের আলোয়।

দরজাটা বন্ধ করে দিল লোকটা একহাত দিয়ে। দেশলাইয়ের আলোটা নিভে গেল।

শহীদের ডান হাতটা কোটের পকেটে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই সে তার গলার কাছে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল। আপন মনে হাসল শহীদ। মাথাটা সরিয়ে আন্দাজে লোকটার কানের কাছে প্রচণ্ড শক্তিতে রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করল।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে লোকটা শহীদের পায়ের কাছে পড়ে গেল। পকেট থেকে টর্চলাইটটা বের করল শহীদ। সিঁড়ির পিছনটা দেখল একবার। নোংরা জায়গাটা। কয়েকটা ভাঙা প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে।

টর্চটা মাটিতে রেখে পকেট থেকে সিল্ক-কর্ড বের করে লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে মুখে টেপ আটকে দিল। তারপর টেনে প্যাকিং বাক্সের আড়ালে ফেলে দিল।

সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে আবার দাঁড়াল শহীদ। এখুনি উঠবে কি উঠবে না স্থির করতে পারল না। কে জানে, উপরে ক'জন আছে।

কোন কথাবার্তা শোনা যায় কিনা তার জন্যে কান পেতে রইল শহীদ। কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত কিনা ভাবতে লাগল সে।

হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন গলা খাঁকারি দিল। সিঁড়ির পিছন দিকে সরে গেল শহীদ।

'জোমারত?' চাপাকণ্ঠে সিঁড়ির মাথা থেকে কে যেন বলল।

চুপ করে রইল শহীদ। অচেতন লোকটাই সম্ভবত জোমারত। জবাব না পেলে ওই লোকটা উপর থেকে নেমে আসবে। সুতরাং তার এই মুহূর্তেই বিপন্ন হবার আশঙ্কা আছে। দরজা খুলে সে অনায়াসে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে তার অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে, আর সাবধান হয়ে যাবে বদমায়েশগুলো। সুতরাং পালিয়ে যাওয়া চলবে না। শেষপর্যন্ত দেখবে সে।

'জোমারত।' আবার শোনা গেল অসহিষ্ণু কণ্ঠ।

জবাব না পেয়ে বোধ হয় সন্দেহ হল লোকটার। সে দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। সিঁড়ির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিল শহীদ। লোকটা কিন্তু কোন অবকাশ পেল না। একই পন্থায় তাকেও কুপোকাৎ করল শহীদ। কাজটা সহজেই হাসিল হল।

মিনিট দুয়েক পরে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল শহীদ। সিগারেটের বড্ড তেষ্টা পেয়েছে তার। কিন্তু উপায় নেই।

সিঁড়ির বাঁ দিকে একটা দরজা, ভারি পর্দা ঝুলছে। অতি সূক্ষ্ম আলো আসছে পর্দার একপ্রান্ত দিয়ে। আধ ইঞ্চির মত পর্দা সরিয়ে ভিতরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল শহীদ। সুসজ্জিত একটা অতি আধুনিক ড্রইংরুম। একটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে সেই বিশাল মুখের মালিক—যার নাম, কুয়াশা বলেছে, মাহদী বিল্লাহ। টেলিফোনে কথা বলছে সে। ডান হাতে জ্বলন্ত চুরুট। বিরাট রুমটাতে আর কোন জনপ্রাণী নেই।

নকল দাড়িটা একটানে খুলে ফেলল শহীদ। লুঙ্গিটাও ফেলে দিল খুলে। নিচে ছিল টাইট প্যান্ট। আবার পর্দাটা ফাঁক করে দেখল। রিসিভার নামিয়ে রেখেছে বিল্লাহ।

রিভলভার ডান হাতেই ছিল শহীদের। সেটা দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে নিয়ে ভিতরে ঢুকল সে।

'হ্যালো, মিস্টার মাহদী বিল্লাহ।'

মোটা লোকটা ঘাড় তুলল। ঠোঁটে চুরুট লাগাতে যাচ্ছিল। হাত থেকে সেটা কার্পেটের উপর পড়ে গেল। রিভলভার হাতে শহীদকে দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল বিল্লাহর ছোট দুটো চোখ।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আকস্মিকতা-জনিত বিস্ময়ের (এবং শহীদের ধারণায় ভয়ের) ছাপ মিলিয়ে গেল। তার বদলে চোখে-মুখে ফুটে উঠল হিংস্রতার ছায়া। ভয়ঙ্কর ক্রোধে জ্বলে উঠল বিল্লাহর চোখ দুটো।

সে গর্জন করে উঠল, 'কে তুমি! কি চাও এখানে?'

'আহা, অমন অপরিচয়ের ভান করছ কেন? এত কষ্ট করে তোমার আতিথেয়তার স্বাদ পেতে এলাম, আর···' শহীদ ঠাট্টা করল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিল্লাহ্ বলল, 'এক্ষুণি স্বাদ পাবে।'

'অতি আনন্দের কথা। কিন্তু মিয়াজী, সত্যি করে বল তো, তুমি আমার পিছনে এমনভাবে লেগেছ কেন? কেন আমার জন্যে এই মাগগীগণ্ডার বাজারে এতগুলো বুলেট বাজে খরচ করছ? আমার অপরাধ কি দোস্ত্?' রিভলভারটা বিল্লাহর অতিকায় ভুঁড়ির দিকেই উদ্যত রেখে সে বিল্লাহর সামনের সোফাটার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল।

কঠিন কণ্ঠে বিল্লাহ বলল, 'কে তুমি, কি চাও?'

মাথা সামান্য নুইয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গি করল শহীদ।

'নাম আমার শহীদ খান। দেখ তো। চিনতে পার কিনা?' তরল কণ্ঠে বলল সে।

বিল্লাহ চিন্তা করার ভান করল, 'না। চিনি না তোমাকে আমি। নামও শুনিনি তোমার।'

'সে কি, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে! এই তো সেদিন, মানে মাত্র পরশু রাতে গুলশানে ঝিলের ধারে বাজ-পড়া বটগাছের পাশে বুলেটবিদ্ধ করার জন্যে তুমি আর তোমার এক স্যাঙাৎ টমিগান নিয়ে গিয়েছিলে। শেষটায় স্যাঙাৎ হারিয়ে চলে এলে। আবার তার কয়েক ঘন্টা পরেই আমার বাড়িতে গেলে কষ্ট করে। আর এক স্যাঙাৎ হারিয়ে এলে। এমন দু-দুটো স্মরণীয় ঘটনা তোমার মনে নেই? আশা করি স্মৃতিভ্রম রোগে এখনও আক্রান্ত হওনি।'

'তুমি কি বলছ এসব বুঝতে পারছি না।' পকেটের দিকে হাত বাড়াল সে।

'উঁহুঁ, উঁহুঁ। ওটি হবে না, ভায়া। হাত দুটো সামনে একেবারে পেটের উপর রাখ। না হলে ভুঁড়িটা ফেঁসে যাবে। দেখছ না সাইলেন্সার লাগানো আছে রিভলভারে? টেরও পাবে না কেউ।'

তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল বিল্লাহ শহীদের দিকে। নিতান্ত কলিকাল বলেই সে দৃষ্টিতে ভষ্ম হয়ে গেল না শহীদ। নির্দেশ পালন করল বিল্লাহ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই

একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সাঁ করে বিল্লাহর সামনের ছোট টেবিলটা শূন্যে উঠে শহীদের মুখ বরাবর ধেয়ে এল। কিছু বুঝে উঠবার এবং আত্মরক্ষার জন্যে যথাযথ প্রস্তুতি নেবার আগেই সেটা তার ডানহাতের কনুইতে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। রিভলভারটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। ধরে ফেলল শহীদ। পরমুহূর্তেই একটা টিপয় ছিটকে পড়ল তার কপালের উপর। টিপয়ের কোনাটা কপালে লেগে ঠকাশ করে শব্দ হল। বাঁ হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরল শহীদ।

প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত পড়ল শহীদের চোয়ালে। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে। অতিকষ্টে ভারসাম্য বজায় রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু আচমকা একটা ঘুসি পড়ল তার চোয়ালে। দু'চোখে অন্ধকার দেখল শহীদ। চিত হয়ে পড়ে গেল সে। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিল্লাহ। হাত থেকে কোন্ ফাঁকে রিভলভারটা পড়ে গেল টেরও পেল না শহীদ। বিল্লাহ তার বুকের উপর চেপে বসেছে। দুহাত দিয়ে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে শহীদের কণ্ঠ। তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। এখুনি···এখুনি সব শেষ হয়ে যাবে। চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে তার হৃৎস্পন্দন। দুনিয়া থেকে মুছে যাবে তার অস্তিত্ব। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে।

'আতিথেয়তার স্বাদটা কেমন লাগছে?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বিল্লাহ।

শেষবারের মত চোখ খুলল শহীদ।

বিদায় নিতে ইচ্ছে করল সকলের কাছ থেকে।

বিদায়! মহুয়া বিদায়!! আমি চললাম!!!

বিদায়! হে সুন্দর পৃথিবী!! বিদায়!!!

চেতনার উপর দিয়ে অন্ধকার একটা পর্দা নেমে আসছে যেন। কে যেন কানের কাছে কি বলে উঠল।

শহীদের হঠাৎ মনে হল, ধীরে ধীরে বিল্লাহর হাতের মুঠো আলগা হয়ে যাচ্ছে। হাতটা কি সরে গেছে? চেতনা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। অন্ধকার পর্দাটা যেন সরে যাচ্ছে।

চোখ মেলে তাকাল সে। একটু ধাতস্থ হয়ে সে দেখতে পেল তার পাশেই ঊর্ধ্বে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিল্লাহ। তার বিশাল বপুটা একটু একটু নড়ছে (সম্ভবত, শহীদ ভাবল, উত্তেজনায়)। বিল্লাহর মুখটা দরজার দিকে। শহীদ মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। দেখতে পেল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা উদ্যত রিভলভার হাতে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ। মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত বেদনা ও অবসাদ দূর হয়ে গিয়ে সে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল।

কোন কথা বলল না কুয়াশা।

বাঁ হাত দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিল্ক-কর্ড বের করে শহীদের দিকে ছুঁড়ে

দিল।

শহীদ পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল বিল্লাহকে। একটা সোফায় বসিয়ে দেয়া হল তাকে। হিংস্র দৃষ্টিতে কুয়াশা ও শহীদের দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল বিল্লাহ।

কুয়াশা বিল্লাহর কোমর থেকে একটা চাবির গোছা বের করে নিয়ে বলল, 'আমার কাজ আছে, শহীদ।'

কুৎসিত ভাষায় কুয়াশাকে একটা গালি দিল বিল্লাহ। কুয়াশা ফিরেও তাকাল না।

'মরতে ইচ্ছে হলে যাও। যম বসে আছে তোমার।'

কুয়াশা একবার মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করল শহীদ। ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বলল, 'তারপর? দাবার চাল তো আবার পাল্টে গেছে, এবারে, জবাবটা দিয়ে ফেল তো, বন্ধু, ভালয় ভালয়?'

'আমি কিছু জানি না। বিশ্বাস কর, কিছুই জানি না আমি,' অসহায়ের মত বলল বিল্লাহ।

'বেশি গোলমাল কোরো না। নিস্তার পাবে না।'

বিল্লাহ বলল, 'কেন তুমি সেদিন ঝিলের ধারে গিয়েছিলে, আমি জানি না। তবে আমি আর গাজী যে সেখানে গিয়েছিলাম তা ঠিক। তবে ওটা ছিল মোফাখখরের অ্যাসাইনমেন্ট। আমি সঙ্গে ছিলাম মাত্র।'

'কে সে?'

'তোমার বাড়ির সামনে যে মারা গেল।'

'বলতে থাক।'

'তোমাকে খুন করার কন্ট্রাক্ট পেয়েছিল মোফাখখর। গিয়েছিলাম প্রথমে আমি আর গাজী।'

'তিনি আবার কোন মহাশয়?'

'ঝিলের ধারে তোমার গুলিতে যে মারা গেছে।'

শহীদ বুঝতে পারল, কার গুলিতে যে টমিগানধারী গাজী মারা গেছে তা এখনও জানে না বিল্লাহ। সে সম্পর্কে এখন আলোচনার অবকাশ নেই। সে বলল, 'কে দিয়েছিল কন্ট্রাক্ট?'

'তা আমি বলতে পারব না।'

'কারণটা নিশ্চয়ই বলতে পারবে?'

'সঠিকভাবে পারব না। তবে তুমি অনেকেরই অসুবিধা ঘটাচ্ছ, সম্ভবত তার অবসানের জন্যেই।'

'তা তো বটেই। এতদিন পরে ফকির আকরামের হত্যারহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি

করলে অসুবিধা তো নিশ্চয়ই হবে।'

বিল্লাহর চেহারায় ভয়ের ছাপটা আবার চেপে বসেছে। সে বলল, 'বিশ্বাস কর, এ সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্র জানি না। যে বলতে পারত অর্থাৎ মোফাখখর, সে তো মারা গেছে।'

'ডালিয়া আকরাম কোথায়?'

'আমি তার কি জানি?'

'খুব ন্যাকামো হচ্ছে, না? ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জান না। ড. এলাহীর চেম্বার থেকে পরশু রাত ন'টায় ডালিয়া আকরাম বেরিয়ে যাবার পর তাকে তোমরা চুরি করেছ। তোমাকে বলতে হবে, কোথায় রেখেছ তাকে। আর আমার দিকে কেন টমিগান চালিয়েছিলে তা-ও বলতে হবে। কে তোমাকে এ কাজ করতে বলেছে?'

এই শীতেও ঘাম দেখা দিল বিল্লাহর কপালে। তবু সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমি কখনও কারও চেহারা ভুলি না। তোমার মুখ তো ভুলতেই পারি না। খুব মজা পেয়েছ আমাকে নিয়ে। তবু যদি নিজের কৃতিত্ব থাকত। ওই বদমাইশটা এসে না পড়লে তোমার প্রাণহীন দেহটা এতক্ষণে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিতাম। কিন্তু দাবার চাল আবার পাল্টাতে কতক্ষণ?'

'সে চিন্তা পরে করা যাবে। এখন নিজের কথা ভাব।'

চুপ করে রইল বিল্লাহ।

শহীদ কঠোর স্বরে বলল, 'আমি জবাব চাই, এবং তা এই মুহূর্তেই চাই। একমিনিট সময় দিলাম। জবাব না দিলে গাজী আর মোফাখখরের দশা হবে তোমার।'

শহীদ ট্রিগারের উপর আঙুল রেখে পুনরাবৃত্তি করল, 'এক মিনিট সময়।'

শহীদের দিকে তাকিয়ে বিল্লাহ বুঝতে পারল, জবাব না পেলে ঠিকই গুলি করবে সে। একটু দমে গেল সে।

ঘড়ি দেখে শহীদ বলল, 'আর পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড।'

'বেশ তো, বলব আমি।'

'এই তো সুবোধ বালকের মত কথা,' শহীদ মন্তব্য করল।

হঠাৎ তার খেয়াল হল, বিল্লাহর চোখ দুটো তাকে অতিক্রম করে দরজার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে। সেদিক থেকে একটা অত্যন্ত অস্পষ্ট শব্দ কানে এল শহীদের।

সে মুখ না ফিরিয়েই রূমের একমাত্র জ্বলন্ত বাল্বটার দিকে গুলি করল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে দুপ করে একটা শব্দ হল। রূমটা নিবিড় অন্ধকারে তলিয়ে গেল নিমেষে। চিত হয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়ে পাক খেয়ে সরে গেল শহীদ।

দরজার দিকে অন্ধকারের মধ্যেই আর একবার গুলি ছুঁড়বে কিনা ভাববার আগেই দুপ করে আর একটা শব্দ হল। কার্পেটের উপর ভারি কিছু একটা পতনের শব্দ শোনা গেল প্রথমে, তারপর ঘড়ঘড় করে একটা আওয়াজ হল।

শহীদ গুলি চালাল দরজার দিকে আন্দাজ করে।

দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল সিঁড়ির দিকে। কে যেন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

কার্পেট-শয্যা থেকে উঠে পড়ল শহীদ। টর্চ বের করে জ্বালাতেই দেখা গেল রক্তাপ্লুত দেহে মেঝের উপর পড়ে আছে বিল্লাহ। সারা মুখে তার রক্ত। কপাল থেকে তখনও তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কয়েকবার প্রচণ্ড খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল বিল্লাহর বিশাল দেহটা।

দরজার দিকে টর্চ ঘোরাল শহীদ। কেউ নেই সেখানে। থাকবে না, সে তা জানে। কিন্তু এখানে আর এক সেকেণ্ডও থাকা নিরাপদ নয়। বিল্লাহর দল এক্ষুণি জংলী কুকুরের মত তাড়া করে আসবে।

পথে অনেক কিছুই ভাবছিল শহীদ। কে গুলি করল বিল্লাহকে? কেন করল? বিল্লাহকেই গুলি করতে এসেছিল লোকটা? না, তাকে খুন করতে এসেছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিল্লাহ মারা গেছে?

বাসায় ফিরেই মি. সিম্পসনকে ফোন করে বিল্লাহর হোটেলে তক্ষুণি পুলিস পাঠাবার অনুরোধ করল শহীদ।

শহীদের অভিযানের খবর নেবার আর নিজের সংগৃহীত তথ্য শহীদকে জানাবার জন্যে এই তীব্র শীত উপেক্ষা করে কামাল শহীদের ড্রইংরুমে বসে ছিল। মহুয়া আর লীনা অনেক আগেই চলে গেছে শুতে। স্ফীতকায় একটা উপন্যাস খুলে বসেছিল কামাল।

শহীদ মি. সিম্পসনকে ফোন করে রিসিভার নামিয়ে রাখতেই কামাল উপন্যাসটা বন্ধ করে কোলের উপর রেখে বলল, 'তারপর খবর কি?'

'বিল্লাহ খুন হয়েছে। সমস্তটা অভিযানই বলতে গেলে ব্যর্থ,' সিগারেট ধরিয়ে বলল শহীদ।

'তা ওকে মারতে গেলি কেন?'

ম্লান হেসে শহীদ বলল, 'আমি মারিনি।'

'তাহলে?'

ঘটনাটা খুলে বলল শহীদ।

'তাহলে কুয়াশা গুলি করেছিল?'

'উঁহুঁ। সে করলে ওভাবে পালিয়ে যেত না। তাছাড়া লোকটা বিল্লাহর চেনা। কারণ, সে যখন দরজা দিয়ে ঢুকেছিল তখন তাকে আমি দেখতে না পেলেও বিল্লাহ দেখতে পেয়েছিল এবং তাকে দেখে বিল্লাহর চেহারায় ভয়ের কোন ছাপ ফুটে ওঠেনি, বিস্ময়ের ছাপও নয়। এবং ভেসে উঠেছিল পরিচয়ের ও আশার চিহ্ন।

যাকগে, ওদিকে খবর কি? সেই অ্যাক্টর ছোকরার সাথে দেখা হয়েছিল?'

'না, ওর সাথে দেখা হয়নি। তবে ওর সম্পর্কে রিপোর্ট খুব সুবিধের নয়। ডাক্তার সম্পর্কেও নয়।'

'যথা?'

'বেলাল,...শুধু বেলালই নয়, ফিল্ম্ জগতের অনেকেই এখন মাদকসেবী। ওরা বলে ডোপ। আর সে ডোপ সরবরাহ করে ড. এলাহী। বেলাল তারই একজন খদ্দের।'

'ভুল খবর না তো?'

'মোটেই না। ড. এলাহীর চেম্বারে যারা ভিড় জমায় তাদের অধিকাংশই ডোপ-সেবী। জেনুইন রোগীর সংখ্যা অতি নগণ্য। বুঝতেই পারিস, সাধারণ এম. বি. বি. এস. পাস করা ডাক্তার—স্পেশালিস্ট নয়, অথচ রোগীর ভিড়। কারণটা কি?'

শহীদ বলল, 'আমার ধারণা তাহলে মিথ্যে নয়।'

'অথচ প্রমাণ নেই। আবগারী বিভাগের লোকেরা দু'একবার নাকি জিজ্ঞাসাবাদও করেছে ডাক্তারকে। কিন্তু বেশি ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। ডাক্তার অত্যন্ত ঘড়েল আদমী। ওর অতীতও ভাল নয়। একবার বিয়ে করেছিল ডাক্তার মরিয়ম নামে এক নার্সকে। সে নাকি মারা গেছে।'

'সাবাস, অনেক খবর জোগাড় করেছিস! কিন্তু ওই ছোকরার ব্যাপারটা কি? ডালিয়ার সাথে ওর সম্পর্ক কি?'

'স্রেফ বন্ধুত্বের সম্পর্কই। বন্ধুত্বের বদৌলতে ফিল্মে চান্স পেয়েছে বেলাল। তবে খুব সুবিধে করতে পারছে না।'

ভিতরের বারান্দায় পরিচিত পদশব্দ শোনা গেল।

পর্দা সরিয়ে গফুর উঁকি দিয়ে বলল, 'দাদামণি, হাত-মুখ ধুয়ে নেন। নাস্তা হয়ে গেল বলে।'

'সে কিরে, এতরাতে নাস্তা!'

'রাত আর নাই। চারদিকে আলো ফুটেছে।'

চলে গেল গফুর।

কামাল বলল, 'তাই তো বলি, আমার খিদে পাচ্ছে কেন।'

শহীদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি গোসলটা সেরে নিই। তুইও গোসল করে নে। নাস্তা করে চল বেরিয়ে পড়ি।'

'সারারাত ঘুমোসনি। এখন আবার যাবি কোথায়?'

'নারায়ণগঞ্জে, ফকির আকরামের বাড়িতে। মি. সিম্পসনও যাবেন।'

আট

দারোয়ান গেট খুলে দিল।

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'কে কে আছে এখন এ বাড়িতে?'

দারোয়ান বলল, 'দেওয়ান সাহেব, মানে কেয়ারটেকার সাহেব আছেন আর আমি আছি।'

'আমরা বাড়িটার মধ্যে ঢুকব, বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেয়ারটেকারকে ডেকে দাও।'

কিন্তু ডাকবার প্রয়োজন হল না। সামনের বারান্দা থেকে কে একজন এগিয়ে আসছিল। তাকে দেখিয়ে দারোয়ান বলল, 'ওই যে দেওয়ান সাব আসছেন।'

মি. সিম্পসনের পুলিসী পোশাক দেখে দেওয়ান সাহেব একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'কাকে চাইছেন, স্যার?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমরা একটু দোতলাতে বিশেষ করে মি. ফকির আকরাম যে রূমটাতে মারা গেছেন সেই রূমটা দেখতে চাই। বিশেষ প্রয়োজন আছে।'

দেওয়ান সাহেব আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু স্যার, আমি দেখাব কি করে? হুকুম নেই। ডালিয়া বেগম সাহেবার বা ডাক্তার সাহেবের হুকুম লাগবে। আমার অপরাধ নেবেন না। পরের চাকরি করি আমি।'

'হুকুমের অপেক্ষা এখন করা যাবে না। আমাদের সময় নেই,' মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে মি. সিম্পসন বললেন।

'তাহলে সার্চ-ওয়ারেন্ট আনতে হবে। বুঝতেই পারছেন, ওদের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঢোকালে আমার চাকরি চলে যাবে।'

'যাবে না, মি. দেওয়ান। সে গ্যারান্টি আমি আপনাকে দিচ্ছি।'

দেওয়ান সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, 'আসুন তাহলে।'

'আমাদেরকে মি. ফকিরের রূমে, মানে যে রূমটাতে উনি মারা গেছেন সেই রূমে নিয়ে চলুন,' শহীদ বলল।

মোটা কার্পেট বিছানো সিঁড়ির ঠিক মাথার রূমটাই আকরাম সাহেবের স্টাডি রূম। দেওয়ান সাহেব রূমটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই রূমেই মারা গিয়েছিলেন উনি।'

রূমের তালা খুলে দিলেন দেওয়ান সাহেব।

রূমের একটা দিকের দেয়াল সম্পূর্ণটাই কাঁচের। সামনেই শীতলক্ষ্যা চোখে পড়ে। দুটো দেয়ালে বুককেসে ভর্তি বই। অন্য দেয়ালের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটা চিক। তাতে একটা ড্রাগনের ছবি। আগুনের হলকা বেরুচ্ছে

ড্রাগনের মুখ থেকে। রুমের ঠিক মাঝখানে একটা বড় ডিম্বাকার টেবিল। তার উপরে একটা রেডিও সেট, কয়েকটা চিঠি-পত্রের ট্রে। কলম রাখার পাত্রে কয়েকটা দামি কলম। পাইপ-র‍্যাকে কয়েকটা পাইপ। একটা সুদৃশ্য ছাইদানি। একটা প্যাড। মেঝেতে ঘন সবুজ রঙের-এর কার্পেট।

দেওয়ান সাহেব জানালেন যে, রুমটা আগে যেমন সাজানো থাকত এখনও তেমনি সাজানো আছে।

'আকরাম সাহেব এই রুমেই বোধ হয় সর্বক্ষণ থাকতেন, তাই না দেওয়ান সাহেব?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'জ্বি হ্যাঁ। প্রায় সব সময় এখানেই কাটাতেন। বিশেষ করে মারা যাবার আগের কয়েকমাস তো বটেই। বাইরেও বড় একটা বেরোতেন না। পড়াশোনা করেই প্রায় সময় কাটাতেন।'

'এরকম একটা স্টাডি-রুম থাকলে সবটা সময় এখানে ব্যয় করতে ইচ্ছে করবে বৈকি,' কামালের মন্তব্য শোনা গেল।

'তা তো বটেই,' সিলিং পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল শহীদ।

সিলিং-এ কোন দাগ চোখে পড়ল না শহীদের। কাঁচের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঁচের ফ্রেমগুলো পর্যবেক্ষণ করল। শেষটায় সে টেবিলটার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'দেওয়ান সাহেব, আকরাম সাহেবকে ঠিক কোন্ জায়গাটাতে পাওয়া গিয়েছিল?'

দেওয়ান সাহেব টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'এইখানে দাঁড়িয়ে উনি গুলি করেছিলেন।'

শহীদ অবাক হয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি! কি করে জানলেন?'

'তাই তো হওয়া উচিত। চেয়ারটা অনেকটা পিছনে সরানো ছিল। গুলি করার পর উনি মেঝেতে, এইখানে পড়ে গিয়েছিলেন।' দেওয়ান সাহেব যে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন সেখানে খড়িমাটির অস্পষ্ট একটা গোল দাগ এখনও দেখা যাচ্ছে।

'গায়ের ধাক্কা লেগে চেয়ারটা সরে যায়নি তো?'

'তা কি করে হবে? দেখুন না চেয়ারটা কেমন ভারি? একেবারে আসল মেহগনি-কাঠের চেয়ার।'

শহীদ সুইচ টিপে টেবিলটার লাইট জ্বালিয়ে দিল। তারপর রুমের চারদিকে আবার পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'বাতি তো মাত্র এই একটাই?'

'জ্বি হ্যাঁ। তবে বাইরে আলো জ্বালালে কাঁচের ভিতর দিয়ে ভিতরটা আলোকিত হয়ে যায়।'

শহীদ আলোটার দিকে মুখ করে খড়িমাটি চিহ্নিত জায়গাতে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে ঠিক পিছনের চিকটার দিকে তাকাল। পরের মুহূর্তে সে এগিয়ে গেল চিকটার

দিকে।

কামাল, মি. সিম্পসন ও দেওয়ান সাহেব নীরবে শহীদের কার্যকলাপ দেখছিলেন।

শহীদ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চিকটা দেখছিল। অকস্মাৎ সে যেন আবিষ্কারের আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'আসুন, মি. সিম্পসন। দেখে যান।'

'কি হল শহীদ?' এগোতে এগোতে প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন। কামাল ও দেওয়ান সাহেব তাকে অনুসরণ করলেন।

শহীদ প্রায় অদৃশ্য একটা ফুটোর দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল, 'এটা কি বলতে পারেন, মি. সিম্পসন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কোন পোকায় ফুটো করেছে বোধহয়।'

'উঁহুঁ। কামাল, দেওয়ান সাহেব আপনারা চিকটার দুদিক তুলে ধরুন।'

কামাল ও দেওয়ান সাহেব দুপ্রান্তে ধরলেন। মাঝখানটায় ধরল শহীদ নিজে। একহাত দিয়ে চিকটা ধরে অন্য হাত দিয়ে শহীদ মি. সিম্পসনকে দেখাল, 'এই যে, দেখুন গর্তটা, এটা কি কোন পোকায় কাটা? হতে পারে যদি সে পোকাটার ইস্পাতের দাঁত থাকে।'

'মানে, তুমি বলতে চাও…?'

তাঁকে জেরা করতে দিল না শহীদ। সে বলল, 'হ্যাঁ, যে বুলেটে ফকির আকরাম মারা গেছেন সেই বুলেটেই এই গর্ত হয়েছে। এবং এই বুলেটটাই প্রমাণ করবে যে, ফকির আকরাম সাহেব আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন দেওয়ান সাহেব। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'কি বলছেন স্যার, এই যে সবাই বলছে, বড় সাহেব আত্মহত্যা করেছেন!'

'ওসব মিথ্যা, সাহেব। ওসব মিথ্যা।'

দেওয়ান সাহেব তবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গাড়িতে উঠে মি. সিম্পসন বললেন, 'তাহলে তোমার ধারণা, ফকির আকরামকে খুনই করা হয়েছে এবং ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার মত করে সাজানো হয়েছে?'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে শহীদ বলল, 'একজ্যাক্টলি। আমি গোড়াতে যে সন্দেহ করেছিলাম এখন সন্দেহাতীতভাবে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

'তাহলে খুনটা কে করতে পারে সে সম্পর্কেও নিশ্চয়ই একটা সন্দেহ পোষণ করছ?'

'অবশ্যই। কিন্তু সমস্যা হল, খুনীর বিরুদ্ধে প্রমাণ এখনও জোগাড় করতে পারিনি। এখন আমাকে সেটাই সংগ্রহ করতে হবে। তারপর আমি হত্যাকারীকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারব বলে আশা করছি।'

আর কেউ কোন কথা বলল না। কামালের ঘুম আসছিল। সে আলাপে যোগ না দিয়ে পিছনের সিটে হেলান দিয়ে ঘুমোতে লাগল।

কামালকে তার বাসায় আর মি. সিম্পসনকে তাঁর অফিসে নামিয়ে দিয়ে শহীদ গেল সিভিল সার্জনের অফিসে।

সিভিল সার্জন ড. রেজাউদ্দিন অফিসেই ছিলেন। শহীদকে দেখে বললেন, 'কিরে, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে দিগ্বিজয় করে এসেছিস?'

'তা কিছু তো একটা জয় করেছিই,' বসতে বসতে শহীদ বলল।

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে সিভিল সার্জন বললেন, 'তাহলে কি ঠিক করলি—হত্যা না আত্মহত্যা?'

একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে শহীদ বলল, 'হত্যা বলেই সাব্যস্ত করলাম, আত্মহত্যা নয়।'

সজোরে মাথা নাড়লেন ড. রেজা। 'এ হতেই পারে না। তাছাড়া ফকির আকরাম যে আত্মহত্যা করেছেন একথা কাল তুইও স্বীকার করেছিস।'

'উঁহুঁ। আমি বলেছিলাম, আত্মহত্যা বলে মনে করবার অবকাশ আছে। তবে যথেষ্ট অবকাশ নয়। আমি জানি যে, ফকির আকরামকে হত্যা করা হয়েছে তবে আদালতে উত্থাপনের মত প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি।'

'কিন্তু তোর কথার তো ছাইভস্ম কিছুই বুঝতে পারছিনে। মুখের মধ্যে দিয়ে গুলি করা হয়েছে, অথচ বাধা দেওয়ার কোন চিহ্ন নেই। বুলেটের খোঁজ পেয়েছিস? গিয়েছিলি নিশ্চয়ই ফকির আকরাম সাহেবের বাড়িতে?'

সিগারেট টানতে লাগল শহীদ, জবাব দিল না কোন।

'তার মানে, পাসনি,' আত্মপ্রসাদের সুরে বলল ড. রেজা।

'পেয়েছি।'

ডাক্তার ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, 'কোথায়?'

'খুন হলে যেখানে পাওয়া উচিত, ঠিক সেখানে।'

'তারমানে…যাঃ, এ হতেই পারে না।'

'বেশ তো, মি. সিম্পসনও তো সাথে ছিলেন। তিনি নিজে দেখেছেন, কামাল দেখেছে দেয়ালের গর্ত। দেয়াল খুঁড়লেই বুলেটটা বেরিয়ে আসবে।'

ড. রেজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শহীদের দিকে। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল শহীদ। শেষে যোগ দিল, 'টেবিলের বাতিটা আমার পথ দেখাল। আকরাম সাহেব টেবিলের দিকে মুখ করে বসেছিলেন বলেই আমি ধরে নিয়েছিলাম। সে ক্ষেত্রে বুলেটটা তার পিছনের দেয়ালে বিঁধে যাওয়া অসম্ভব নয়, এই অনুমান করে আমি সেই দেয়ালটার দিকে পরীক্ষা করেছিলাম। চিকের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটা ফুটো চোখে পড়ল, তারপর চিক সরাতেই দেয়ালে দেখা গেল বুলেটের গর্তটা।

সিভিল সার্জন কানের পাশটা চুলকে বললেন, 'কিন্তু কিন্তু…তবু এটা আত্মহত্যা হতে পারে না? একজন লোক অন্যের মুখের মধ্যে রিভলভার ঢুকিয়ে দিলে সে বাধা দেবে না, একথা যদি কেউ বলে তাহলে আর যেই বিশ্বাস করে করুক আমি করছিনে।'

'যদি সেই লোকটা ডাক্তার না হয়।'

'তার মানে!' ভীষণভাবে চমকাল সিভিল সার্জন।

'তোর তো ওই একটাই যুক্তি যে, জোর করে কারও মুখে রিভলভার গুঁজে দিতে গেলেই বাধা আসবে, ধস্তাধস্তি হবে। কিন্তু ধর, রিভলভারধারী যদি ডাক্তার হয় এবং সে যদি কণ্ঠনালীর কোন কাল্পনিক রোগের চিকিৎসার নামে যন্ত্র দিয়ে মুখের ভিতরটা পরীক্ষা বা ওষুধ দেবার ছুতো করে ছোট্ট একটা রিভলভারের নল ঢুকিয়ে দেয়?'

সিভিল সার্জন হাঁ করে শহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শহীদ সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'কণ্ঠনালীর কাল্পনিক ক্ষত দুটো উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে—প্রথমত আত্মহত্যার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে, দ্বিতীয়ত হত্যার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।'

'আর এই জন্যেই আমি দেয়ালের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলাম,' একটু থেমে শহীদ বলল।

'কি রকম?' এতক্ষণে বাকস্ফূর্তি হল সিভিল সার্জনের।

'ফকির আকরাম যদি আত্মহত্যাই করতেন তাহলে গুলিটা সরাসরি সিলিংয়েই গিয়ে ঢুকত। কিন্তু ডাক্তার যদি রোগীর গলার ভিতরটা দেখতে চায় তাহলে রোগী নিশ্চয়ই পিছন দিকে ঘাড় কাত করে রাখবে। সেক্ষেত্রে বুলেট সিলিংয়ের দিকে না গিয়ে দেয়ালের দিকে যাবে।'

সিভিল সার্জন মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করলেন। তারপর বললেন, 'সেই ডাক্তারটা কে?'

'ভদ্রলোক হচ্ছেন ওদের পারিবারিক চিকিৎসক।'

'তার মানে, ড. এলাহী, কায়সার এলাহী? মানে, আকরাম সাহেবের হবু জামাই!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তার উদ্দেশ্য?'

'স্বভাবতই আকরাম সাহেবের টাকা।'

'কিন্তু টাকা তো তার ঢের আছে। তাছাড়া বিয়ের পর তো বলতে গেলে আকরাম সাহেবের সমস্ত সম্পত্তি তার হাতেই চলে যেত।'

'যদি বিয়েটা শেষ পর্যন্ত না হয়? ধর, আকরাম সাহেব যদি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টে থাকেন এবং সেটা ডালিয়ার অজান্তে যদি ড. এলাহী জেনে গিয়ে থাকে?

অথবা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়? হয়ত শুনেছিস, ড. এলাহী আগে একবার বিয়ে করেছিল।'

'হ্যাঁ, এক নার্সকে।'

'সে এখন কোথায়?'

'জানি না। বোধহয় তালাক-টালাক হয়ে গেছে।'

'হয়ত ব্যাপারটা আগে আকরাম সাহেব জানতেন না। পরে শুনে হয়ত তিনি তাঁর মত পাল্টেছিলেন।'

'তা হতে পারে।'

'হয়ত ভদ্রলোক এটাও জেনেছিলেন যে, ড. এলাহীর বে-আইনী মাদকদ্রব্যের ব্যবসা আছে।'

'বলিস কিরে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সিভিল সার্জন।

'হয়ত তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, ড. এলাহী ডালিয়াকেও মাদকদ্রব্য সেবন শিখিয়েছে।'

'অ্যাঁ, এসব কি বলছিস তুই! একটু ধীরে। এতটা চমকে দিবি না। হার্টফেল করতে পারি।'

হেসে ফেলল শহীদ। হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরাল সে।

'চা খাওয়া,' শহীদ বলল।

'নিশ্চয়ই।'

বেয়ারা ডেকে চায়ের ফরমায়েশ দিলেন সিভিল সার্জন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তোর অনুপ্রবেশ ঘটল কি করে?'

'মেয়েটা বোধ হয় সন্দেহ করেছিল। তাই, আমাকে অনুরোধ করেছিল ব্যাপারটা তদন্ত করতে। ডাক্তার যেভাবেই হোক জানতে পেরে মেয়েটাকেও সরিয়েছে, আর আমারও ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্যে বিল্লাহ ও তার দলকে লাগিয়েছে। ওরা তো দু-দুবার আমাকে আক্রমণ করেছিল।'

'হ্যাঁ, সেসব তো তুই আমাকে আগে বলিসনি। আজ সকালেই শুনলাম। কুয়াশা নাকি গতরাতে হানা দিয়েছিল বিল্লাহর আড্ডায়, শুনেছিস নাকি? ভয়ানক লড়াই হয়েছে শুনলাম। বিল্লাহ মারা গিয়েছে। সকালে তো ওর লাশটারই পোস্ট মর্টেম করলাম। আড্ডায় একটা লোকও ছিল না। পুলিস শুধু হোটেলের কয়েকজন নিরীহ লোককে ধরে এনেছিল। ছেড়ে দিয়েছে।'

'আমিও শুনেছি।'

বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

ড. রেজা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম কিন্তু ডাক্তারের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে?'

'সেটাই তো সমস্যা। তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারছিনে। হত্যাকাণ্ডের সময় মিসেস আকরাম কাছে-পিঠেই ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে হয়ত কিছু জানা যেত, কিন্তু ড. এলাহী তাঁকেও হাতের মুঠোয় পুরেছে।'

'তার মানে?'

'ডাক্তার যেভাবে ঘটনাটা সাজিয়েছিল তাতে মনে হয়, সুযোগের জন্যে তাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাড়িতে যেদিন কোন লোক না থাকে সেদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে মিসেস আকরাম ঘটনাস্থলের কাছেই, হয়ত পাশের রুমে অথবা কাছাকাছি কোথাও উপস্থিত ছিলেন। গুলির শব্দ শুনে তিনি নিশ্চয়ই দ্রুত সেখানে গিয়ে ডাক্তারকে দেখতে পান। তিনি চিৎকার করতে গেলে ডাক্তার নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় কিছু একটা দিয়ে আঘাত করে। এ সম্পর্কে অবশ্য ডাক্তারের বক্তব্য হল, মিসেস আকরাম সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ার ফলেই মাথায় চোট পেয়েছেন। আমার তা মনে হয় না, কারণ সিঁড়িতে অত্যন্ত পুরু কার্পেট বিছানো।'

'ডাক্তার তাহলে মিসেস আকরামকে হত্যা করল না কেন?'

'তাহলে আত্মহত্যার কাহিনী ফেঁসে যেত। একটা হত্যা ও একটা আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করলে যে তদন্ত হত তাতে ডাক্তার হালে পানি পেত না। সুতরাং সে সহজ পথটাই বেছে নিল, ফকির আকরামের হত্যাকাণ্ডটাকে আত্মহত্যার মত করে সাজিয়ে মিসেস আকরামের মাথায় আঘাত করে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিল। তাতে যদি মারা যেতেন মিসেস আকরাম তাহলে সুবিধাই হত। মারা না যাওয়াতে ডাক্তার তাঁকে দ্রুত নিজের স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে গেছে।'

'তা এখন তিনি কোথায়? তাঁর সাথে কথা বল না কেন?'

'এখনও তিনি ড. এলাহীর স্যানাটোরিয়ামেই আছেন। তাঁর নাকি কথা বলবার মত অবস্থা এখনও ফিরে আসেনি, আসবে এমন ভরসাও নাকি নেই। তাই তো বলছি, তাঁকে মুঠোয় পুরেছে ডাক্তার।'

'তাহলে কি করে তাঁর সাক্ষ্য নিবি? সেটা তো সম্ভব বলে মনে হয় না।'

শহীদ চিন্তাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'সেইটাই তো বড় সমস্যা। একটা তল্লাশি পরোয়ানা বের করতে পারলে হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ড. এলাহীর আদেশ ছাড়া ওঁকে স্থানান্তর করা যাবে না। অন্য ডাক্তার দিয়েও তাঁকে পরীক্ষা করানো যাবে না। সবক'টা টেক্কাই ডাক্তারের হাতে।'

'মি. সিম্পসনও কি তোর তল্লাশি পরোয়ানা বের করে দিতে পারবেন না? তাঁকে ধর না কেন?'

'কি করে বলি বল। একটা সঙ্গত কারণ তো দেখাতে হবে? আমার কথা হয়ত মি. সিম্পসন বিশ্বাস করবেন, কিন্তু পুলিসের বড়কর্তারা যদি বিশ্বাস না করেন?'

সিভিল সার্জন নীরবে অনেকক্ষণ সিগারেট টেনে বললেন, 'ডালিয়ার খবর কিছু পেলি?'

'বিন্দুমাত্র না। ডাক্তার তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে আমার।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ শহীদ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ড. রেজা বললেন, 'কি হলরে?'

'পেয়েছি, পথ পেয়েছি আমি। এতক্ষণ অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম।'

'কি হল তাই বল? কি পথ খুঁজে পেলি?'

শহীদ বলল, 'অবশ্য পথটা বে-আইনী এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'মানে?'

'বে-আইনী প্রবেশ, সিঁদকাটা, চুরি ডাকাতি যা খুশি বলতে পারিস।'

'খেপেছিস তুই?'

'মোটেও না। অত্যন্ত ঠাণ্ডা আছে মাথাটা এখন।'

'হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে বধির করে দাও। এসব কি শুনছি আমি! কিন্তু কোথায় ডাকাতি করতে যাবি? স্যানাটোরিয়ামে?'

'না, ডাক্তারের চেম্বারে। সেখানেই আছে আমার তুরুপের তাস। ডাক্তারের সবক'টা টেক্কাই আমি ঘায়েল করব।'

'চেম্বারে কি আছে সে এখন?'

'না, এবং এইটাই প্রশস্ত সময়। ডাক্তার এখন স্যানাটোরিয়ামে। দুটোর আগে ফিরবে না।'

'আরে ছ্যা, ছ্যা! পাগল হলি তুই! বোস বোস, মাথা ঠাণ্ডা কর।'

'না, আমাকে এখুনি বেরোতে হবে।'

'পরিণাম বিবেচনা করিস। ধরা পড়লে কি হবে? লজ্জার একশেষ।'

'কাগজে বেরোবে "প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি"। কিন্তু এই ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। তুই কতক্ষণ আছিস?'

'দুটো পর্যন্ত।'

'তারপর?'

'আপন নীড়ে।'

'থাকবি কিন্তু বাসায়। খুব দরকার হবে তোকে।'

'তা হোক, কিন্তু তুই কেলেঙ্কারি বাধাতে যাবি না।'

'যেতেই হবে। টা-টা।'

বেরিয়ে গেল শহীদ।

সিভিল সার্জন হতভম্ব হয়ে শহীদের গমন-পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

নয়

ঘন্টা দেড়েক পরে।

সিভিল সার্জনের কাজকর্ম শেষ। হাত-মুখটা ধুয়ে তিনি বেরোবেন বলে ঠিক করেছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুললেন সিভিল সার্জন।

'হ্যালো?'

'শহীদ বলছি।

'সাকসেসফুল?'

'হ্যাঁ, আমি তোর বাসায় যাচ্ছি তিনটের দিকে। দরকার আছে।'

'পাঁচটায় আয় বরং।'

'বেশ।'

ফোন ছেড়ে দিলেন সিভিল সার্জন।

ঠিক পাঁচটায় শহীদ ও কামাল সিভিল সার্জনের বাসায় গিয়ে পৌঁছুল। গাড়ি থেকে একটা ম্যানিলা খাম হাতে নিয়ে নামল শহীদ। তার পিছনে কামাল।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ড. রেজা বেরিয়ে এসেছিলেন। সম্বর্ধনা জানিয়ে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালেন তিনি ওদেরকে।

'তারপর খবর কি, কমল বাবু? শহীদের মত তোরও যে টিকিটি দেখা যায় না, কারণ কি?'

সঙ্গত কোন জবাব না থাকায় কামাল হাসল শুধু একটু।

'তা তোর খবর কি?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল কামাল।

'থোর বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোর,' সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন সিভিল সার্জন। 'আমি তো আর ডিটেকটিভও নই, তার চেলাও নই। তাই জীবনে কোন উত্তেজনা নেই। লাশকাটা ঘরে ঠাণ্ডা লাশের মতই উত্তাপহীন, উত্তেজনাহীন জীবন।'

সিগারেট ধরাল কামাল।

'এই তো, ভাল আছিস। উত্তেজনা আর উত্তাপের তো অনিবার্য পরিণতি ওই লাশকাটা ঘর,' বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল কামাল।

'এসব দার্শনিক কচকচি থামাবি?' শহীদের কণ্ঠে বিরক্তি।

'নিশ্চয়ই। এবার তোর কথা শোনা যাক। কি চুরি করে আনলি?' ড. রেজা শহীদের দিকে মনোযোগ দিলেন।

ম্যানিলা এনভেলাপটা সিভিল সার্জনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শহীদ বলল, 'এইটা।'

এনভেলাপটা হাতে নিয়ে সিভিল সার্জন বললেন, 'কি আছে এতে?'

'বের করে দ্যাখ না, মুখটা তো খোলাই আছে।'

চারটি এক্স-রে নেগেটিভ বের করলেন সিভিল সার্জন। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে আলোর সামনে ধরে পরীক্ষা করে তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তা এগুলোর সাথে এসব হত্যা বা আত্মহত্যার কি সম্পর্ক?'

'ওগুলোতে কি আছে?' কামাল জানতে চাইল।

সিভিল সার্জন আবার একটা নেগেটিভ তুলে নিয়ে দেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে, একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ডানদিকের কানের পাশে মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন বৃদ্ধা।'

সেটা রেখে অন্য একটা নেগেটিভ তুলে সিভিল সার্জন বললেন, 'লোকটার চোয়ালে চোট লেগেছে। মারাত্মক আঘাতই বলা উচিত।'

তৃতীয় নেগেটিভটা তুললেন।

'ছোকরার ডান হাতে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার হয়েছে।'

শহীদের মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল।

সিভিল সার্জন বললেন, 'তা এই এক্স-রে প্লেটগুলোর সাথে আকরাম-হত্যা মামলার যোগাযোগটা কি?'

'বলছি। কিন্তু তোর পরীক্ষায় কোন ভুল নেই তো?'

সিভিল সার্জন আবার প্লেটগুলো দেখে বললেন, 'মোটেও না। এটা হল একটা বুড়ো লোকের, বুড়ি বলেই মনে হয়। এই চোয়ালটা একটা পুরুষের। তিরিশের মত বয়স হবে। আর এই হাতটা তেরো-চোদ্দ বছর বয়স্ক এক কিশোরের।'

'অথচ এগুলো একই ব্যক্তির অর্থাৎ মিসেস আকরামের বলে আমায় বলা হয়েছিল। ড. এলাহী বলেছিল, মিসেস আকরাম অ্যাক্সিডেন্ট করার পরই এগুলো নেয়া হয়েছিল।'

সিভিল সার্জন বলল, 'কারণ?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে গলাটা ভেজানো দরকার।'

'নিশ্চয়ই। ওরে রিসু, হল?' হাঁক ছাড়লেন সিভিল সার্জন।

'হইচে, সাব। আইতাছি,' অন্দর-মহল থেকে জবাব এল।

রিসু মিয়া একটু পরেই চা নিয়ে এল।

শহীদ চায়ে চমুক দিয়ে বলল, 'নকল জখম দেখানর কারণ কি জানিস? চোয়ালে ওরকম জখম দেখিয়ে বোঝানো যেতে পারে যে, ভদ্রমহিলার, মানে মিসেস আকরামের কথা বলার শক্তি নেই। মাথার খুলিতে ফ্র্যাকচার দেখিয়ে ডাক্তার বোঝাতে চাইছে যে, ভদ্রমহিলা সংজ্ঞাহীনা। আর ডানহাতে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার থাকলে কোন প্রশ্নের লিখিত জবাব দেওয়াও সম্ভব নয়। তার মানে হল, মিসেস আকরাম এমন কিছু জানেন যা ডাক্তার ফাঁস করতে দিতে রাজি নয়।'

সিভিল সার্জনের মুখটা ম্লান হয়ে গেল, 'আমার তো মনে হয়, আসল অবস্থা

তার চাইতেও গুরুতর।'

'কি রকম?'

'আমার তো মনে হয়, ভদ্রমহিলাকে ডাক্তার আগেই মেরে ফেলেছে।'

কামাল বলল, 'তা করবে না। ডাক্তার তো জানে যে, সে সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত। সুতরাং সে বরং ভদ্রমহিলার স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যেই অপেক্ষা করবে। আর সেটাও খুব সহজ। রোগীর যথাযথ চিকিৎসা না করলেই হল।'

ড. রেজা কামালের যুক্তি খণ্ডন করে বললেন, 'অপেক্ষা করতে যাবে কেন, বল তো? মেরে ফেলে বরং একটা ডেথসার্টিফিকেট লিখে দেবে। ল্যাঠা যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় তারই চেষ্টা করবে। ঝামেলা করার মত আছে তো এক ডালিয়া। তাকে যা হোক একটা বোঝাবে। আমার মনে হয়, যেমন করে হোক আজকেই ড. এলাহীর স্যানাটোরিয়ামে যাওয়া উচিত। শহীদ, তুই মি. সিম্পসনকে বল।'

'অবশ্যই বলব। এখন আমার হাতে যে নথিপত্র আছে, মানে এই নেগেটিভগুলো, এর বদৌলতে পুলিস বিভাগের কাছ থেকে সার্চ-ওয়ারেন্ট বের করা কঠিন হবে না।'

সিভিল সার্জন সোৎসাহে বলল, 'আর একমুহূর্তও দেরি নয়। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া যাক।'

'তুইও বেরোবি নাকি!' কামাল বিস্ময় প্রকাশ করল।

'আলবৎ।'

'তিষ্ঠ বৎস। মি. সিম্পসনের সাথে আলাপ করি। দেখি উনি কোন ব্যবস্থা করতে পারে কিনা। ফোনটা দেতো এদিকে এগিয়ে।'

মি. সিম্পসন সবটা শুনে বললেন, 'ফর্ম্যাল সার্চ-ওয়ারেন্ট বের করতে সময় লাগবে। তবে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। অবশ্য আমি নিজে যেতে পারব না। একটা কাজে আটকে পড়েছি। স্থানীয় থানায় ফোন করে দিচ্ছি। দারোগা যাতে নিজেই যায় সে ব্যবস্থা করছি।'

'চার-পাঁচজন কনস্টেবল সঙ্গে নিতে বলবেন।'

'নিশ্চয়ই, আমি এক্ষুণি জানিয়ে দিচ্ছি। পুলিস তোমাদের আগেই পৌঁছে যাবে।'

'তাহলে তাদেরকে স্যানাটোরিয়ামের গেট থেকে দূরে থাকতে বলবেন।'

'আচ্ছা।'

বেরিয়ে পড়ল শহীদ, কামাল আর সিভিল সার্জন-ড. রেজা।

স্যানাটোরিয়ামটা নদীর তীর ঘেঁষে। প্রাচীর ঘেরা দোতলা দালানও দূর থেকে ওদের চোখে পড়ল। নদীর তীর দিয়েই পথ। স্যানাটোরিয়াম থেকে একটু দূরে অন্ধকারে দুটো জিপ দেখে গাড়ি থামাল শহীদ।

রাস্তার উপর আধা অন্ধকারে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল। সে গাড়ির জানালার কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'শহীদ সাহেব?'

'হ্যাঁ।'

'দারোগা সাহেব সামনের গাড়িতে। আসতে বলব?'

'দরকার নেই। সোজা স্যানাটোরিয়ামের দিকে চলুন।'

চলে গেল কনস্টেবলটা।

কামালের দৃষ্টি ছিল নদীর দিকে নিবদ্ধ। তার চোখে পড়ল ছোট একটা লঞ্চ নোঙর করে আছে নদীর তীরে।

স্যানাটোরিয়ামের গেটে গাড়ি থামতেই দারোগা সাহেব নেমে এসে পরিচয় দিলেন নিজের।

লম্বা-চওড়া মাঝবয়সী ভদ্রলোক। ভারি কণ্ঠস্বর। শহীদের চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিল না।

'মি. সিম্পসন আমাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়েছেন। মিসেস আকরামকে আটকে রাখা হয়েছে অসুস্থতার ছুতো করে। তবু আমাকে কি করতে হবে বলুন,' দারোগা সাহেব বললেন।

দারোগা সাহেবকে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দিল শহীদ।

'পুলিস কি ভিতরে নিতে হবে?'

'বাইরেও রাখতে হবে ভিতরেও নিতে হবে। ক'জন আছে আপনার সাথে?'

'ছয়জন।'

'চারজনকে বাইরে রাখুন। দু'জন আমাদের সঙ্গে চলুক।'

'বেশ, আসুন। রিয়াসত আর গুল মোহাম্মদ, আমার সঙ্গে এস।'

গেট খোলাই ছিল। দারোগার নেতৃত্বে ওরা ভিতরে ঢুকল। সামনের একটা রুম থেকে খোলা দরজা দিয়ে আলো আসছিল। জুতোয় শব্দ তুলে সেই রুমেই ঢুকলেন দারোগা সাহেব। উর্দি-পরা এক ছোকরা একটা টুলে বসেছিল। তার সামনে টেবিলের উপর টেলিফোন।

সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ভিজিটিং আওয়ার তো শেষ হয়ে গেছে, এখন দেখা হবে না রোগীদের সঙ্গে।'

'হুম।' রাশভারি গলায় উচ্চারণ করল দারোগা। তারপর প্রশ্ন করল, 'মিসেস আকরামের রুম কোনটা?'

যুবক একটু ভীতস্বরে বলল, 'আমি তা জানি না, স্যার। তাছাড়া ভিতরে ঢোকবার হুকুম নেই বড় ডাক্তার সাহেবের আদেশ ছাড়া।'

'আমি পুলিসের লোক, বুঝলে, যা বলছি জবাব দাও।'

যুবক বলল, 'ওসব ডাক্তার সাহেব বলতে পারেন। ফোন করে জেনে নিন।'

'রাখ তোমার ডাক্তার। বল, মিসেস আকরাম কোথায়?' ধমক দিলেন দারোগা

সাহেব।

লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'দোতলার পশ্চিমের রুমে। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লাগবে ঢুকতে,' চিঁ চিঁ করে বলল সে।

'চোপরাও!' একজন কনস্টেবল হুঙ্কার ছাড়ল।

সিঁড়ির কাছে গিয়ে দারোগা সাহেব নিচুস্বরে একজন কনস্টেবলকে কি যেন নির্দেশ দিল। সে মাথা নেড়ে চলে গেল।

দোতলার পশ্চিম দিকের রুমটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বারান্দার যেটুকু আলো ভিতরে ঢুকেছিল তাতে বিছানার উপর একটা মানুষকে শায়িত অবস্থায় দেখা গেল।

সিভিল সার্জন সবাইকে পাশ কাটিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। মাথার কাছের সুইচটা টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। দেখা গেল ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা মুখ। শুধু চোখ দুটো অনাবৃত। বুক পর্যন্ত চাদর ঢাকা। বাঁ হাতটা বাইরে পড়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে চাদরটা সামান্য নড়ছে। তাছাড়া প্রাণের অন্য কোন লক্ষণ নেই।

কামাল বলল, 'এখনও তাহলে বেঁচেই আছেন ভদ্রমহিলা।'

সিভিল সার্জন ড. রেজা বাঁ হাতটা তুলে নাড়ী দেখলেন। হাতটা রেখে মাথা তুলতেই তাঁর মুখের দিকে তাকাল শহীদ। তার মনে হল ড. রেজার চোখে-মুখে বিস্ময়ের একটা ছাপ ফুটে উঠেছে।

ড. রেজা রোগিনীর পায়ের কাছে গিয়ে চার্ট দেখে শহীদকে বললেন, 'ডানহাতে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার, চোয়াল ও মাথার খুলিতেও ফ্র্যাকচার। শহীদ, ওই ভুয়া নেগেটিভগুলোর মত জখমগুলোও যদি ভুয়া হয় তাহলে ড. এলাহীর হাতে হাতকড়া পরানর জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।'

'বেশ তো। খুলে ফেল ব্যাণ্ডেজ।'

সিভিল সার্জন চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

'কাজ শুরু করে দিন না,' দারোগা সাহেব বললেন।

ড. রেজা হতাশাভরা কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু কি করে তা সম্ভব?' ডান হাতটা দেখিয়ে যোগ করলেন, 'এটা তো কাস্ট করা আছে। ওঁর ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া এটা খোলার কোন অধিকারই আমার নেই। আইনত পারি না। নৈতিকতাতেও বাধে।'

দারোগা সাহেব বললেন, 'আরে রেখে দিন নৈতিকতার প্রশ্ন। আর আইনের হাঙ্গামাটা না হয় আমিই সামলাব। আপনি খুলুন, সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

তবু সামান্য ইতস্তত করে সিভিল সার্জন পকেট থেকে একটা চামড়ার ছোট কেস বের করলেন। একটু পরে স্কাল্পেল দিয়ে কাস্ট কাটার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা গেল না। কাস্টগুলো কেটে কেটে মাটিতে ফেলা হচ্ছে।

শহীদ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কাস্ট কাটা শেষ হতেই সিভিল সার্জন হাতটা নেড়েচেড়ে বললেন, 'না, কোন রকম জখম নেই হাতে। ফ্র্যাকচার তো নেই-ই। কিন্তু…।'

'কিন্তু কি?' শহীদ প্রশ্ন করল।

সিভিল সার্জন মুখ তুলে শহীদের দিকে তাকালেন।

'দ্যাখ, এখানে সারা হাত জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দু। দেখেছিস?'

শহীদ মাথা নুইয়ে দেখল।

দারোগা সাহেব বললেন, 'এবার তাহলে মাথার ব্যাণ্ডেজটা খুলুন, সার্জন সাহেব। দেখা যাক সেখানে কি আছে।'

কামাল বলল, 'চোয়ালে যদি জখম না থাকে তাহলে উনি নিশ্চয়ই কথা বলতে পারবেন, আর বোঝাই যাচ্ছে হাতের মত অন্য জখমগুলোও ভুয়া।'

'এই তো এবার খুলছি মাথার ব্যাণ্ডেজ,' ড. রেজা বললেন।

'নিশ্চয়ই নয়, মি. সিভিল সার্জন। এ ভীষণ অন্যায়, ভীষণ অন্যায় আপনার!' পিছন থেকে বজ্রপাত হল।

চকিতে সকলেই ফিরে তাকাল পিছন দিকে। শহীদ দেখল ডক্টর এলাহী এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা রিভলভার। চেহারায় হিংস্রতা। রাগে ও উত্তেজনায় তার নাকের বাঁশি বারবার ফুলে ফুলে উঠছে।

শহীদ তার রিভলভার বের না করাই উত্তম বিবেচনা করল।

ড. এলাহী কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আমার বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশ করেছেন। আমি আপনাদের গুলি করলেও আইন আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। ইন্সপেক্টর, আপনি কোন সার্চ-ওয়ারেন্ট ছাড়াই এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছেন। সার্জন, আপনি আমার বিনানুমতিতে আমার রোগিনীর কাস্ট খুলেছেন। আপনার কোন অধিকারই নেই।'

'অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন শুনতে আমি রাজি নই। আমরা আপনার রোগিনীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাব। আমাদের বিশ্বাস, আপনি অসুস্থতার নাম করে ভদ্রমহিলাকে এখানে বন্দি করে রেখেছেন। আর আপনাকেও আমরা খুনের দায়ে গ্রেফতার করব,' কঠিন কণ্ঠে বললেন দারোগা সাহেব।

'তাই নাকি, দারোগা সাহেব!' ব্যঙ্গ করল ড. এলাহী, 'একটু অপেক্ষা করুন। মি. সিম্পসনকে আমি ফোন করেছি। উনি আসছেন। তারপর দেখা…।'

হঠাৎ একটা রিভলভার গর্জে উঠল। ডক্টর এলাহী তার কথাটা শেষ করতে পারল না। তার শরীরটা একটা পাক খেল। দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে লাগল সে।

সবাই হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সকলের আগে নড়ে উঠলেন সিভিল সার্জন। দ্রুত ডক্টর এলাহীর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে তার

দেহ নিশ্চল হয়ে গেছে। ঠিক বুকে বিঁধেছে গুলি।

'কে? কে করল গুলি?' গর্জে উঠলেন ড. রেজা।

শহীদ নীরবে বিছানায় শায়িত দেহটার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করল।

সবাই দেখল, যে হাতটা থেকে কাস্ট কেটে ফেলা হয়েছে সেই হাতে একটা রিভলভার। হাতটা উপরের দিকে উঁচু। কিন্তু সেটা কাঁপছে।

শহীদ বলল, 'রেজা, বি কুইক। আগে ব্যাণ্ডেজগুলো খুলে ফেল।'

সিভিল সার্জন চামড়ার কেসটা থেকে কাঁচি বের করে ব্যাণ্ডেজ কাটতে লাগল দ্রুত হাতে। ডিমের খোসার মত খুলে এল ব্যাণ্ডেজটা। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক অপরূপ সুন্দরী তরুণীর মুখ।

বিস্ময়ে ওরা সবাই বোকা হয়ে গেল। দারোগা বললেন, 'এ কি, শহীদ সাহেব! আপনি না বলেছিলেন, মিসেস আকরাম বুড়ো মানুষ?'

সিভিল সার্জন সবিস্ময়ে তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শহীদ ও কামাল তরুণীকে চিনতে পারছে। কিন্তু ব্যাণ্ডেজের মধ্যে থেকে এই তরুণী মুখ কেউ আশা করেনি। সুতরাং সকলেই বিস্মিত হয়েছে। ওরা মুখ খোলবার আগেই তরুণী বলল, 'আমি, আমি ডালিয়া। আমাকে ব্যাণ্ডেজ পরিয়ে এখানে আটকে রেখেছে ওই যে, ওই শয়তানটা।' ডক্টর এলাহীকে দেখিয়ে দিল সে। তরুণীর ঠোঁট কাঁপছিল কিন্তু চেহারায় প্রকাশ পেল তীব্র ঘৃণা।

উঠে বসল ডালিয়া। তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

শহীদ বলল, 'লুকিয়ে রাখার কি চমৎকার ব্যবস্থা! ইস, আগে যদি এতটুকু সন্দেহ হত!'

'আপনি, আপনিই তো শহীদ সাহেব?'

মাথা নাড়ল শহীদ।

'আপনি এসে পড়েছিলেন বলেই আমি মুক্তি পেলাম,' অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল ডালিয়া।

'কিন্তু আপনার মা? তিনি কোথায়?'

'ওঁকে। ওঁকে শয়তানটা মেরে ফেলেছে। বাবাকেও মেরেছে। মাকেও মেরেছে,' আঁচলে চোখের পানি মুছে বলল ডালিয়া।

'আপনি যা বলছেন তা ঠিক তো?'

মাথা নেড়ে ডালিয়া বলল, 'মা ওকে ধরে ফেলেছিলেন। তাই মাকে চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল কায়সার। ধাক্কা দিয়ে ওঁকে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপর নিয়ে এসেছিল এখানে; যাতে করে কোনদিন ওঁর কথা কেউ শুনতে না পারে।'

'আপনাকে এখানে আনল কি করে?'

'আপনাকে যেদিন ফোন করেছিলাম সেই রাতেই আমি কায়সারের চেম্বারে

গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকজন গুণ্ডা ছিল। আমাকে ওরা ওখানেই আটকে ফেলে এখানে নিয়ে আসে। তারপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। উহ্, সে যেন এক দুঃস্বপ্ন!' দু'হাতে মুখ ঢাকল ডালিয়া।

'আপনি কি আগেই ডাক্তারকে সন্দেহ করেছিলেন?'

মাথা তুলে ডালিয়া বলল, 'হ্যাঁ, করেছিলাম। কিন্তু ওকে তা বুঝতে দিইনি। আপনাকে এই জন্যেই অনুরোধ করেছিলাম। কিভাবে কায়সার জেনেছিল তা বলতে পারব না। তবে ও দুজন লোককে আপনাকে খুন করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিল। আমি পরে ভেবেছিলাম, হয়ত সত্যি আপনাকে ওরা খুন করেছে। ভেবেছিলাম, আমি একেবারেই অসহায়। ওর কবল থেকে কোনদিনই মুক্তি পাব না আর।'

একজন কনস্টেবল এসে বারান্দা থেকে দারোগা সাহেবকে ডাক দিল। তিনি বেরিয়ে গেলেন। শহীদ তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। দারোগা সাহেব বারান্দা থেকেই বললেন, 'আমি নিচে যাচ্ছি। আপনারা আসুন।'

ড. রেজা ডাকলেন, 'শহীদ।'

'অ্যাঁ,' যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হল শহীদের।

'এখন কি আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন?'

'না, তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই এখন। পরে করলেও চলবে।'

'তাহলে আমরা চলে যাই বরং, ওঁর এখন বিশ্রামের দরকার। অনেক ঝড় বয়ে গেছে ওঁর উপর দিয়ে। ওঁকে তো এখানে রাখা চলবে না।'

'নিশ্চয়ই। দাঁড়া, রিভলভারটা নিয়ে যাই। বাই দ্য ওয়ে, মিস ডালিয়া, রিভলভারটা কোথায় পেলেন আপনি? ওটা কার?'

'ওটা ওরই। কায়সার সেদিন ডেস্কের দেরাজে রেখে গিয়েছিল। বোধ হয় আমাকে আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করতে। প্রলুব্ধ হইনি এমন নয়। কিন্তু আত্মহত্যা করার মত সাহস হয়নি। তবু বালিশের তলায় রেখেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম ওর চোখে হত্যার নেশা তখন আমি নিজের অজ্ঞাতেই ওটা বের করে ট্রিগার টিপলাম। কি করে যে ট্রিগার টিপলাম নিজেই বুঝতে পারছি না। এখনও আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ঘটনাটা। উহ্, কিন্তু আমি আর সইতে পারছি নে।'

আবার দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল ডালিয়া।

শহীদ আলগোছে রিভলভারটা একটা রুমালে আবৃত করে পকেটে রাখল।

সিভিল সার্জন বললেন, 'চল্, আমরা যাই। আপনি উঠুন, মিস ডালিয়া। আমরা বাইরে দাঁড়াচ্ছি।'

'না না, আপনারা যাবেন না। আমি একা এক সেকেণ্ডের জন্যেও এই রুমে থাকতে পারব না।'

সিভিল সার্জন বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'দারোগা সাহেব আবার এই সময়

গেলেন কোথায়? লাশটা তো সরানো দরকার।'

ওরা সবাই বেরিয়ে এল।

শহীদ আমতা আমতা করে বলল, 'দারোগা আর ফিরবে না। কনস্টেবলগুলোও না। আমি বুঝতে পারিনি। চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু চিনতে পারিনি। চিনলাম যখন তখন সে বেরিয়ে গেছে।'

'কি বলছিস তুই?' সিভিল সার্জন বললেন।

'ওরে, লোকটা নকল দারোগা। আসল দারোগা নয়।'

'বলিস কি!' সিভিল সার্জন প্রায় আর্তকণ্ঠে বললেন, 'কারা তাহলে ওরা?'

ম্লান হাসি হেসে শহীদ বললেন, 'কুয়াশা এসেছিল-সদলবলে।'

কামাল উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তাই তো, আমারও মনে হচ্ছিল খুব চেনা।'

'আহা, আগে বলিসনি কেন?'

'বুঝতে পারলে তো বলব?'

'আশ্চর্য, এতগুলো লোককে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! কিন্তু কুয়াশা এল কি করে? আমরা যে এখানে আসব তা জানল কি করে?'

'কি করে বলব বল?'

উর্দি-পরা ছোকরা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সে একটা সালাম ঠুকে বলল, 'শহীদ সাহেব কে? তাঁর একটা চিঠি আছে, দারোগা সাহেব দিয়েছেন।'

'আমিই শহীদ। দাও চিঠিটা।'

শহীদ চিঠিটা পড়ে বলল, 'কামাল, ধারে-কাছে কোথাও নদীতে নোঙর করা লঞ্চ দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। ওই তো, যেখানে পুলিসের সাথে কুয়াশার জিপ দাঁড়িয়েছিল সেখানেই তো নদীতে ছোট একটা লঞ্চ আছে।'

'জলদি চল্। সেখানে আসল দারোগা সদলবলে বন্দি হয়ে আছে।'

দশ

গাড়িতে উঠে ড. রেজা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কে লিখেছে চিঠিটা? নিশ্চয়ই কুয়াশা, দেখি চিঠিটা?'

শহীদ তার হাতে দিল চিঠিটা।

পড়া শেষ করে ড. রেজা বললেন, 'তাহলে এখানেই ছিল ড. এলাহীর বে-আইনী মাদক দ্রব্যের ভাণ্ডার। কুয়াশা তো সমস্তটাই নষ্ট করে দেবে। যাক, কাজটা ভালই করেছে কুয়াশা। কিন্তু পরের কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

কামাল বলল, 'কি লিখেছে?'

'লিখেছে, প্রকৃত সত্য যেন উদঘাটিত হয়। এ কথার মানে কি? তুই কিছু

বুঝলি, শহীদ?'

'কিছুটা বুঝলাম বটে। কাল জানতে পারবি। দশটার দিকে মি. সিম্পসনের কামরায় আয়।'

পরের দিন বেলা দশটায় মি. সিম্পসনের কামরায় হাজির হল শহীদ, কামাল, সিভিল সার্জন ড. রেজা, মিস ডালিয়া ও বেলাল সিদ্দিকী।

সকালেই শহীদ ডালিয়াকে মি. সিম্পসনের অফিসে যেতে অনুরোধ করেছিল। আর কামালকে পাঠিয়েছিল বেলালকে ডেকে আনবার জন্যে।

মিস ডালিয়া সত্যি সুন্দরী। তবে একটু রোগা মনে হচ্ছিল তাকে। সম্ভবত গত কয়েক দিনের মানসিক নির্যাতনই তার কারণ। কমলা রং-এর একটা কাঞ্জিভরম পরেছে ডালিয়া। তার সঙ্গে ম্যাচ করেছে স্লিভলেস ব্লাউজ।

পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর মি. সিম্পসন বললেন, 'মিস ডালিয়া, আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন থাকায় আপনাকে বাধ্য হয়েই ডেকেছি।' ড্রয়ার থেকে একটা ·32 বের করে টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন, 'এটা আপনি চিনতে পারেন?'

ডালিয়া বলল, 'হ্যাঁ, ওটা আমি স্যানাটোরিয়ামে আমার রুমের ডেস্ক থেকে সরিয়েছিলাম। কায়সার রেখেছিল সেখানে। সম্ভবত আমার মনে আত্মহত্যার প্রেরণা সৃষ্টির জন্যে।'

'ধন্যবাদ।'

শহীদ বলল, 'মিস ডালিয়া, নিপুণভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছিলেন বলেই সব কুল রক্ষা পেল।'

ডালিয়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কেমন যেন ম্যাজিকের মতই ঘটে গেল, শহীদ সাহেব। আসলে লক্ষ্যভেদ তো দূরের কথা এর আগে রিভলভার স্পর্শও করিনি আমি। হয়ত কাজটা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তখন নিজেকে সংযত করতে পারিনি। কি করে যে ঘটে গেল ঘটনাটা!'

মি. সিম্পসন গম্ভীর মুখে শহীদকে বললেন, 'তোমার ওই মন্তব্যের আসল অর্থটা কি, বল তো?'

শহীদ হেসে বলল, 'ড. কায়সার অনেক কুকাণ্ড করেছে, কিন্তু এমন চতুর লোক ছিল সে যে, আইন তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারত না। তাছাড়া ফকির আকরামের কেসে তো তাকে ফাঁসানো যেতই না।'

মি. সিম্পসন ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, 'তুমি কি বলছ এসব? ড. কায়সার এলাহী আকরাম সাহেবের গলায় ওষুধ লাগাবার বা পরীক্ষা করার ছুতোয় তাঁর মুখে রিভলভার ঢুকিয়ে গুলি করেছে একথা তো তুমি প্রমাণই করেছ। তারপর একথা বলার মানে কি?'

শহীদ বলল, 'আমার ধারণা আগে তাই ছিল।'

রূমের সকলের বিস্মিত দৃষ্টি শহীদের দিকে নিবদ্ধ হল।

'তার মানে?'

'অর্থাৎ এখন তোর ধারণা পাল্টেছে? কিন্তু কি করে সম্ভব? কি যে উল্টোপাল্টা বকিস তুই!' বিরক্তি প্রকাশ করলেন ডাক্তার।

শহীদ মৃদু হেসে একটা সিগারেট ধরাল।

ড. রেজা অধৈর্য হয়ে বললেন, 'তাহলে কে করেছে গুলিটা?'

বেলালের মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে শহীদ বলল, 'আকরাম সাহেবের স্ত্রীও হতে পারে মেয়েও হতে পারে, অতি বিশ্বাসী কোন বন্ধু বা চাকরও হতে পারে। অর্থাৎ তাঁর গলায় স্প্রে করার সুযোগ যার যার ছিল তাদের যে কেউ এটা করতে পারে।'

ডালিয়া এতক্ষণ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে শহীদের কথা শুনছিল। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা। সে সক্রোধে বলল, 'আমার মাকে আমি জানি। সৎমা হলেও আমি বলব, এমন মানুষ তিনি ছিলেন না। আমি একথা কিছুতেই মানব না।'

মাথা নেড়ে শহীদ বলল, 'আপনার মা নন মিস ডালিয়া, আপনি! আপনিই আপনার বাবাকে হত্যা করেছেন। তাঁর গলায় স্প্রে করার অজুহাতে তাঁর মুখের মধ্যে রিভলভার ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপেছেন। বেলাল সিদ্দিকী সাহেব বলুন, আমি সত্যি কথা বলছি কিনা?'

বেলাল মাথা নিচু করল।

'আপনি, আপনি পাগল হয়ে গেছেন, শহীদ সাহেব। উন্মাদের মত কথা বলছেন। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আদালতে যাব, আপনার এই মন্তব্যের জন্যে আপনার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করব!' চিৎকার করতে লাগল ডালিয়া।

অবজ্ঞার হাসি হাসল শহীদ।

সে বলল, 'আপনি যদি আকরাম সাহেবকে হত্যা না করে থাকেন তাহলে হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরের ঘটনা জানলেন কি করে? মনে আছে, গত রাতে আপনি স্যানাটোরিয়ামে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, আপনার মাকে কায়সার সিঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল? কিন্তু যেভাবে আপনি ঘটনাটা ব্যক্ত করলেন তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ড. কায়সার নয় আপনিই আপনার মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আপনার মা অসুস্থ ছিলেন। বাসায় তখন কোন লোক ছিল না। শুধু আপনি ছিলেন আপনার বাবার স্টাডি-রূমে। হয়ত বুঝতে পারেননি, অসুস্থ মহিলা গুলির আওয়াজ শুনে অত দ্রুত ছুটে আসতে পারেন। সুতরাং তাঁকে আসতে দেখে সিঁড়ির মাথাতেই তাকে আঘাত করেন এবং ধাক্কা মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দেন।'

'আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার কারও নেই!' চিৎকার করে উঠল ডালিয়া।

'চুপ করুন আপনি। চিৎকার করবেন না।' মৃদু ধমক দিলেন মি. সিম্পসন, 'আপনাকে গ্রেফতার করা হল, মিস ডালিয়া।'

'কোন্ অপরাধে?' খেঁকিয়ে উঠল ডালিয়া। ভীষণ বীভৎস দেখাচ্ছে এখন তাকে।

'আপাতত তিনটে খুনের অভিযোগে,' শহীদ বলল। 'ফকির আকরাম, ড. কায়সার এলাহী ও মাহদী বিল্লাহ এই তিনজনকে খুন করেছেন আপনি।'

রুমসুদ্ধ সবাই চমকে উঠল। এমন কি বেলাল সিদ্দিকীরও চোখে-মুখে বিস্ময়।

মি. সিম্পসন বললেন, 'মাহদী বিল্লাহ, মানে বিল্লীর কথা বলছ, শহীদ? তাকে উনি খুন করেছেন মানে? সে তো কুয়াশা।'

মৃদু মাথা নেড়ে শহীদ বলল, 'ডাক্তার, তুমি তো বিল্লীর ময়না তদন্ত করেছ। সে .32-এর গুলিতে মারা গেছে না?'

'হ্যাঁ।'

মি. সিম্পসনের টেবিলের উপর রাখা .32-টা দেখিয়ে শহীদ বলল, 'এটা সেই .32। এটা দিয়েই উনি বিল্লীকে হত্যা করেছেন।'

'আমি, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না। চললাম আমি।' দরজার দিকে এগোতে লাগল ডালিয়া।

'আরে, গেল যে চলে!' ড. রেজা ব্যস্ত হয়ে বললেন।

'যাবে আর কোথায়? ওকে এক্ষুণি অ্যারেস্ট করা হবে। আমি আগেই ইশারা করে দিয়েছি।'

দরজার বাইরে থেকে চিৎকার ও ধস্তাধস্তির শব্দ এল পরমুহূর্তেই। একটু পরে একজন কনস্টেবল উঁকি দিয়ে বলল, 'লক-আপে পাঠাব, স্যার?'

'পাঠাও।'

চলে গেল কনস্টেবলটা।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। নীরবে সিগারেট টানতে লাগল সবাই।

নীরবতা ভঙ্গ করল বেলাল সিদ্দিকী।

সে বলল, 'চাচাজীকে ডালিয়াই খুন করেছে।'

'আপনি জানলেন কি করে?' ড. রেজা প্রশ্ন করলেন।

'ডালিয়া ডোপ নিত। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমার কাছে সবটাই স্বীকার করেছে সে।'

'আর আপনি সে ডোপ ড. এলাহীর কাছ থেকে এনে ডালিয়াকে দিতেন।'

বেলাল ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'আমার উপায় ছিল না, এমনভাবে আমাকে ধরত। তাছাড়া আমি ওর কাছে অনেকভাবে ঋণী।'

শহীদ বলল, 'জানি, আপনার অপরাধ নেই। ড. এলাহীই ডালিয়াকে ডোপ নেয়া শিখিয়েছে। পরে কোন অজ্ঞাত কারণে ডালিয়াকে ডোপ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল সে।'

ড. রেজা বললেন, 'ইয়ে, মানে···সমস্তটা ব্যাপার আমার কাছে কেমন যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছে। কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

কামাল বলল, 'আমারও সেই অবস্থা।'

'তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলতে হয়,' শহীদ বলল।

'হ্যাঁ বাবা, ঝেড়ে কাশ।'

শহীদ বলতে শুরু করল, 'ড. এলাহী ছিলেন ডালিয়াদের পারিবারিক ডাক্তার। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। আকরাম সাহেব তাঁকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের খারাপ দিকটা তাঁর জানা ছিল না। অন্যদিকে ডালিয়া ছোটবেলা থেকেই বখে যাওয়া মেয়ে। বেলাল সিদ্দিকীও তা স্বীকার করবেন। বেলাল যথাযথই ভালবাসত ডালিয়াকে তার স্বভাব-চরিত্র জেনে-শুনেও। তাকে শোধরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। উল্টে তাকে ডালিয়ার জন্যে ডোপ জোগাতে হয়েছে। ডালিয়া ভালবাসত একটা ক্লেদাক্ত উত্তেজনাময় জীবন। মাঝে মাঝে তাই সে নিরুদ্দেশও হত।' শহীদ থামল।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'কিন্তু মেয়েকে বাবা চিনতেন। অথচ একমাত্র মেয়ে। সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাই কায়সারের মত মজবুত একটা লোকের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেন। তিনি অবশ্য জানতেন না যে, ড. এলাহীও তাঁর মেয়ের ক্লেদাক্ত জীবনের অন্যতম সঙ্গী। ড. এলাহী বিয়েতে রাজি হন। তাঁর লক্ষ্য ছিল অবশ্য আকরাম সাহেবের বিপুল অর্থ। ডালিয়াকে হাতের মুঠোয় পেলে তাকে পরে শুধরে নেওয়া যাবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু ডালিয়া ডাক্তারকে চিনত ভাল করেই। স্বামী হিসেবে ড. এলাহীকে তার পছন্দ হয়নি। তা সে অবশ্য কখনও প্রকাশ করেনি। সে-ও চেয়েছিল বাপের টাকা। কিন্তু ডাক্তারের হাতের মুঠোয় ঢুকতে সে রাজি ছিল না কিছুতেই। এদিকে আকরাম সাহেব বিয়ের জন্যে খুবই চাপ দিচ্ছিলেন। ফলে একদিন বাড়িতে লোকজনের অনুপস্থিতিতে বাপের গলায় ওষুধ দেবার ছুতো করে তাঁর মুখে রিভলভার ঢুকিয়ে দেয়। গুলির আওয়াজ শুনে মিসেস আকরাম দৌড়ে আসতেই তাঁকে দরজার সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ডালিয়া। পরে তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দেয়। কিন্তু দুজনকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব বিবেচনা করে শেষপর্যন্ত সে ড. এলাহীকেই ডেকে পাঠায়।'

'তারপর?'

'ড. এলাহী হত্যাকাণ্ডটাকে আত্মহত্যার মত করে সাজিয়ে ফেলে।'

'তার স্বার্থ কি? সে ডালিয়াকে ধরিয়ে দিল না কেন?'

'ব্ল্যাকমেইলিং।'

'ড. এলাহী ডালিয়াকে ব্ল্যাকমেইল করত?'

'নিয়মিতভাবে। এবং তাতে অতিষ্ঠ হয়েই ডালিয়া চমৎকার একটা চাল চালে। সে তার বাবার হত্যাকাণ্ডটাকে হত্যাকাণ্ড বলেই চালাবার এবং হত্যার দায়টা ড. এলাহীর উপর চাপাবার মতলব আঁটে।'

'খাসা মতলব!'

'হ্যাঁ, নিজের দিক থেকে সে নিশ্চিত ছিল। সে তার বাবাকে খুন করতে পারে একথা কেউই বিশ্বাস করবে না, সে তা জানত। একমাত্র সাক্ষী মিসেস আকরামও মারা গেছেন তখন। সুতরাং সে নিজে থেকে যদি এই ব্যাপারে কাউকে তদন্ত করার অনুরোধ করে তাহলে সন্দেহটা ডাক্তারের উপরেই গড়াবে। আর হয়েছিলও তাই। আমি ড. এলাহীকে সন্দেহ করেছিলাম বরাবর। কিন্তু এতেও নিশ্চিত ছিল না ডালিয়া। সন্দেহটা শতকরা একশ' ভাগ ডাক্তারের ঘাড়ে চাপাবার জন্যে সে ড. এলাহীর স্যানাটোরিয়ামেই আত্মগোপন করে। স্বভাবতই আমরা ভাবলাম, ড. এলাহী তাকে সরিয়ে ফেলেছে। তবে স্যানাটোরিয়ামে রোগিনী হিসেবে যে ডালিয়াকে দেখব সেটা আমিও আশা করিনি। কিন্তু আমরা সেখানেই তাকে আবিষ্কার করি, ডালিয়া মনে-প্রাণে এটাই চেয়েছিল। অন্যদিকে সে বিল্লীর দলকে লেলিয়ে দিল আমার বিরুদ্ধে। তার উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় দুটো। প্রথমত আমার জেদ বাড়িয়ে দেওয়া, অবশ্য যদি আমি বেঁচে যাই। দ্বিতীয়ত ড. এলাহীর উপর সন্দেহ যাতে ঘনীভূত হয়। ড. এলাহীর সঙ্গে বিল্লীর যোগাযোগ আছে, আর খোঁজ করলেই আমার পক্ষে যে তা জানা সম্ভব, ডালিয়া তা বুঝতে পেরেছিল। ফলে ডালিয়া অনুমান করেছিল, আমার এই ধারণা হবে যে, ড. এলাহীই বিল্লীকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে-ই কালপ্রিট।

'পরশু রাতে আমি বিল্লীর আড্ডায় হানা দিলাম। তাকে বাগেও আনলাম। (কুয়াশার উপস্থিতি চেপে গেল শহীদ।) সে যখন বাধ্য হয়েই ব্যাপারটা খুলে বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় আমার পিছন থেকে কে একজন গুলি করল বিল্লীকে। আমি তাকে দেখতে পাইনি। তখন ভেবেছিলাম, লোকটা ড. এলাহী।'

'কিন্তু ডালিয়া ওকে গুলি করতে গেল কেন?' কামাল প্রশ্ন করল।

'বিল্লী সত্যি কথা বলে ফেললে ডালিয়ার ভালমানুষী ঘুচে যেত বলে। ড. এলাহীকেও সে একই কারণে গুলি করেছে।'

ড. রেজা হাঁ করে শহীদের কথাগুলো গিলছিল।

সে এতক্ষণে বলল, 'কিন্তু ড. এলাহী তাকে স্যানাটোরিয়ামে জায়গা দিল কেন?'

'তোর মত শিশুর মুখেই এ প্রশ্ন শোভা পায়,' বলল শহীদ।

—০—

কুয়াশা ৩০

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৭১

এক

'Stand by to jump!'

অ্যারোপ্লেনের ইন্টারকম থেকে ঘোষিত হল সাবধান বাণী। কন্ট্রোল ককপিটের পিছনের মৃদু আলোকিত কেবিনে দুই ব্যক্তির চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান এবং অপরজন ওরই প্রিয় বন্ধু এবং সহকারী কামাল আহমেদ।

'We're all set!'

শহীদ দ্রুত কণ্ঠে মন্তব্য করল। কামাল সম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে শেষবার দেখে নিল প্যারাশুটের বাঁধনগুলো। ইন্টারকমের মাধ্যমে ভেসে এল পাইলটের সন্তুষ্ট কণ্ঠস্বরঃ বাইরে গাঢ় অন্ধকার! গুড লাক।

শহীদ বলে উঠল, 'থ্যাঙ্কস। অল সেট, গো।'

ওয়ার্নিং লাইটের দিকে দৃষ্টি শহীদের। লাল টকটকে আলো। ওদের নামার নির্দিষ্ট স্থানের উপর প্লেন পৌঁছুলেই ওই রেড ওয়ার্নিং লাইট গ্রীন হয়ে যাবে।

নিচের গাঢ় অন্ধকারে শুয়ে আছে সীমান্ত প্রদেশ। কান্দাহার, ঘোরাক, মুশাকাল্লা ছাড়িয়ে যাবে প্লেন। আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সরকার-বিহীন অশাসিত ভূখণ্ডে নামতে হবে ওদেরকে। জায়গাটা 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড' হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু বহু যাযাবর সেখানে বাস করে।

পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনীর কয়েকজন সদস্য প্যারাশুট নিয়ে কয়েক দিন আগে নেমেছে। কোন খবর পাওয়া যায়নি আর তাদের। মি. সিম্পসন মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বড় অফিসার তিনি। কিন্তু টপ-সিক্রেট পর্যায়ের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্মও তাঁকে দেখতে হয়। এটা তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব। এই অতিরিক্ত দায়িত্বই এবার তাঁর মাথা-ব্যথার সৃষ্টি করেছিল। কয়েকজন গুপ্তচর স্রেফ বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না তাঁর। কথায় কথায় শহীদকে ব্যাপারটা গোপনে জানিয়েছিলেন তিনি। শহীদ প্রাইভেট ডিটেক্টিভ হলেও দেশকে সে ভালবাসে। দেশেরই সুদূর এক প্রান্তে একটা ভয়ঙ্কর বেআইনী অপরাধী দল তাদের ক্ষমতা ক্রমশ বিস্তার করে দেশের পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জরুরি কর্তব্য হল শত্রুকে ধ্বংস করা। সুতরাং মি. সিম্পসনের অনুরোধ রক্ষা না করার প্রশ্নই ওঠেনি।

তথ্য যা পাওয়া গেছে তা ভয়াবহ এবং মারাত্মক। পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ নির্দিষ্ট এক অঞ্চলে যে জায়গাটা 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড' বলে চিহ্নিত, সেখানে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন গুপ্তচর স্থায়ীভাবে অবস্থান করছিল বহুদিন ধরে। হঠাৎ তার কাছ থেকে কোন খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে না। চীন সরকারের মাধ্যমে জানা গেছে যে ওই 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডের' চতুর্দিকে ইলেকট্রিফায়েড তারের ব্যারিয়ার ইত্যাদি লাগানো হচ্ছে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এই রহস্যময় ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। শহীদ ও কামালকে যোগাযোগ করতে হবে 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডের' গড়ে ওঠা নতুন শহরের দক্ষিণের পাহাড়বাসী পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের গুপ্তচরের সঙ্গে। 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড' গত চার বছর থেকে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। তারা নিজেদেরকে পাকিস্তানীও বলে না, অন্য কোন দেশের নাগরিক বলেও মনে করে না।

শহীদ কামালের উদ্দেশ্যে বলে উঠল আনমনে, 'কামাল, "নো ম্যানস ল্যাণ্ডে" আমাদের লোক হয়ত কিছু জানে সীমান্ত এলাকায় কি ঘটছে না ঘটছে। এই কথা বললেন মি. সিম্পসন।'

কামাল বলে উঠল, 'মি. সিম্পসন আমাদেরকে ঠিক পাহাড়ের কাছাকাছি নামবার ব্যবস্থা করেছেন, তাই না? যেখানে আমাদের লোকটা থাকে?'

শহীদ উত্তর দিতে পারল না। ওয়ার্নিং লাইটের দিকে স্থির ছিল ওর দৃষ্টি। দেখা গেল লাল আলো সবুজে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।'

'গ্রীন লাইট্ অন!'

একজন এয়ার ক্রু কেবিনের মেঝে থেকে একটা ঢাকনি তুলে গর্তের মুখটা উন্মোচন করল। শহীদের দুকানের পাশে আর্তনাদ করতে লাগল বাতাস। পলকের জন্যে দেখে নিল ও কামাল ওকে অনুসরণ করার জন্যে তৈরি আছে কিনা। তারপর গর্তের দিকে ঝুঁকে পড়ল ও একটু, এবার ঝাঁপ দেয়া যেতে পারে।

আচমকা শহীদের একটা হাত দ্রুতবেগে কামালের উইণ্ডচীটারে গিয়ে স্পর্শ করল। শহীদের হাতের পিনটা ঢুকে গেল উইণ্ডচীটারে। পরমুহূর্তে এয়ার-ক্রুর উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে হাত নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ও রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্যে।

কামালও শহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্লেনটা অনেক দূর সরে চলে গেল ওদের কাছ থেকে। প্লেনের এঞ্জিনের গর্জন ধ্বনি ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে যেতে নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

প্যারাশুট খুলে যেতে উপর দিকে একবার তাকাল শহীদ। নিমিষের জন্যে ও দেখতে পেল কামালের প্যারাশুটটা বড় হয়ে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। নিচের দিকে তাকাল শহীদ। মুহূর্তের মধ্যে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। দুশ্চিন্তার রেখা দেখা গেল কপালে।

নিচের মেঘপুঞ্জ হতে ফুটে বের হচ্ছে অদ্ভুত কমলা রঙের আভা। যেন

মেঘরাশির নিচে বন ভূমিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলার ফলে ওরকম দেখাচ্ছে। হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। ব্যাপার কি? জঙ্গলের কাছে তো নামার কথা নয় ওদের। পাহাড়ী গাছগুলোতে আগুন ধরে গেছে নাকি? সেই আগুনের দিকেই দ্রুত নেমে যাচ্ছে তারা?

মেঘ চারদিক দিয়ে গাঢ় কুয়াশার মত ঘিরে রেখেছে শহীদকে। দৃষ্টিসীমার বাইরে এখন কামাল। প্রায় নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে শহীদ। যতই ও নামছে মেঘের ভিতর দিয়ে ততই কমলা রঙের আভা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

অকস্মাৎ মেঘের রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে এল শহীদ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল নিচের দিকে। মেঘের গায়ে যে কমলা রঙের আলোর আভা পড়েছিল তা আগুনের নয়, মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল শহীদ। কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা দূর হতেই আরেকটা দুশ্চিন্তা মাথায় চেপে বসল নাছোড়বান্দার মত। নিচের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শহীদ। আগুন না, নিচে জ্বলছে শত শত স্ট্রীট ল্যাম্প। ওরা দুজন তাহলে নামছে মাঝারি ধরনের একটা শহরের উপর। পাইলট নিশ্চয় ভুল করে ফেলেছে। ভাবল শহীদ। পাকিস্তানী গুপ্তচর সরফরাজ খানের পাহাড়ী কেবিনের কাছাকাছি নামার কথা ছিল ওদের। অথচ তথাকথিত 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডের' অপেক্ষাকৃত সবচেয়ে বড় শহরে নামাবার ব্যবস্থা করেছে পাইলট ওদেরকে।

শহরের আলোকিত রাস্তাগুলো জনশূন্য দেখাচ্ছে। মধ্যরাত্রি বেশ অনেক আগে পেরিয়ে গেছে। শহরের অধিবাসীরা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শহীদ ভাবল, হয়ত নিরাপদে ল্যাণ্ড করা যেতেও পারে সেক্ষেত্রে। কিন্তু ধরা পড়বার ভয় শতকরা নব্বইভাগ। কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বে তারা।

বিরাট বড় একটা বাগান দেখা যাচ্ছে নিচে। পা দুটো নেড়ে সিধে করে নিল শহীদ। সোজা বাগানের দিকে নামছে ও। উপর পানে মুখ তুলল একবার। কামাল কোথায়! কামালকে দেখা যাচ্ছে না!

নিচের বাগানের মাটি ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। পা দুটো মুড়ে ফেলল শহীদ মাটি স্পর্শ করতেই। ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে গেল খানিক দূর ঘাসের উপর দিয়ে। তাল সামলে মুহূর্ত মাত্র দেরি করল না ও, উঠে দাঁড়াল। দ্রুত হাতে মুক্ত করল ও প্যারাশুটের বাঁধন থেকে নিজেকে। একটা বাণ্ডিল করে ফেলল প্যারাশুটটাকে। ধীর অথচ সতর্ক পদক্ষেপে সারভর্তি একটা ড্রামের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঢাকনি খুলে বাণ্ডিলটাকে কবর দিয়ে আবার ঢাকনি চাপা দিল যথাযথ। কামাল কোথায়? এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রশ্ন করল ও নিজেকে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই মাটিতে নেমেছে ও। রিস্টওয়াচের চাবিটা ঘুরিয়ে কান পাতল শহীদ। মৃদু কিরকির কিরকির ধ্বনি বের হতে শুরু করল হাতঘড়িটার ভিতর থেকে। দুর্ভাবনা দূর হল শহীদের। কামালের উইণ্ডচীটারে যে পিনটা গেঁথে

দিয়েছিল শহীদ, সেটা কাছাকাছি কোথাও থাকলেই শুধু এই ধ্বনিট্র্যান্সমিট হওয়া সম্ভব। বাগান থেকে বেরিয়ে স্বল্পালোকিত রাস্তায় নেমে এল শহীদ। যান্ত্রিক ধ্বনিটা দ্রুত এবং জোরাল হয়ে বের হচ্ছে এবার ঘড়ির ভিতর থেকে। তারমানে কামালের দিকেই এগিয়ে চলেছে শহীদ। রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে পৌঁছুল ও। লোকজনের ছায়াও নেই কোনদিকে। বাঁ দিকে একটা মসজিদ। স্ট্রীট ল্যাম্পগুলো আলোকিত করে রেখেছে চারধার। শহীদের মাইক্রোট্র্যান্সমিটারটা আরও দ্রুত বেজে চলেছে। তারমানে কামাল আশপাশেই কোথাও আছে।

এদিক ওদিক তাকাল শহীদ। অকস্মাৎ ওর চোখ পড়ল মসজিদের উপর। বিমূঢ় হয়ে পড়ল ও মুহূর্তের জন্যে। মসজিদের চূড়ায় আটকে গেছে কামালের প্যারাশুট। কামাল অসহায় ভাবে ঝুলছে গম্বুজের গায়ে গা ঠেকিয়ে। হঠাৎ চমকে উঠল শহীদ। গাড়ির শব্দ আসছে। এত রাতে গাড়ি কিসের? এখানে আইন নেই, আদালত নেই—সুতরাং পুলিস বিভাগও নেই। আফগানিস্তান, চীন, ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে বা দেশত্যাগ করে শত শত নরনারী অব্যবহৃত ভূখণ্ডে আবাসভূমি গড়ে তুলেছে। চোরাচালানীর স্বর্গ এই অঞ্চল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের হাজার হাজার মূল্যবান জিনিসপত্র এখানে অবাধে কেনাবেচা হয়। কোন আইন নেই, কোন শৃংখলা নেই। এখানে জোর যার মুল্লুক তার।

বেশি কথা ভাবার সময় নেই শহীদের। দ্রুত লুকিয়ে পড়ল ও দুটো বাড়ির মধ্যবর্তী নোংরা একটা গলিতে। গলিটা আলোকিত। সম্মুখের ল্যাম্পপোস্টে উঠে বাতির কাচ ভেঙে ফেলল শহীদ গ্লাভসপরা হাতের এক ঘুসিতে। ভুল হয়ে গেল একটা। কাচ ভাঙার শব্দ হল বেশ একটু। দ্রুত নেমে পড়ল ও। গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ও বুঝতে পারল, রাস্তায় ভাঙা কাচ পড়ার শব্দ গাড়ির আরোহীরা নিশ্চয় শুনেছে। গলিতে না ঢুকে দৌড়ুতে শুরু করল ও। খানিকদূর যেতেই আলোর বন্যা পিছন থেকে গ্রাস করল ওকে। পিছন ফিরে তাকিয়ে শহীদ দেখল একটা জীপ গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে মোড় নিয়ে ছুটে আসছে তার পিছন পিছন। দ্রুত মোড় ঘুরে চওড়া একটা রাস্তায় পৌঁছুল ও। রাস্তার একধারে বাড়িঘর। অন্যধারে খাল। খালের পাড়ে বড় বড় গাছ। কি গাছ দেখার সময় নেই হাতে। শহীদ দ্রুতবেগে উঠে পড়ল একটা গাছের উপর।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জীপ গাড়িটা গাছের নিচ দিয়ে নাকবরাবর ছুটে চলে গেল। শহীদ কালবিলম্ব না করে নেমে পড়ল রাস্তায়। তারপর ছুটল আবার চৌমাথার মসজিদের পানে। কামাল এখনও ঝুলছে অসহায়ভাবে গম্বুজের গায়ে গা লাগিয়ে।

শহীদ মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। হাত পনেরো উঁচুতে ঝুলছে কামাল। কোমরের পকেট থেকে শক্ত দড়ি বের করল ও। ফাঁস তৈরি করল একটা। তারপর সেটা কৌশলে ছুঁড়ে দিল গম্বুজের দিকে। প্রথমবারের চেষ্টাতেই

ফাঁসটা আটকে গেল গম্বুজের মাথায়। দড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল ও। প্যারাশুটটা আটকে গেছে প্যাঁচ খেয়ে। ছুরি বের করে কাটতে শুরু করল শহীদ। খানিকক্ষণ পরই প্যারাশুটটা গম্বুজ মুক্ত হল। ধীরে ধীরে ঢিলে করতে লাগল শহীদ প্যারাশুটটার দড়ি। ধীরে ধীরে মসজিদের দ্বিতলের বারান্দায় পা পৌঁছুল কামালের। কামাল খুলে ফেলতে লাগল বাঁধনগুলো। ইতিমধ্যে দড়ি বেয়ে নেমে এল শহীদ। একমিনিটের মধ্যেই রাস্তায় নেমে এল ওরা দুজন দ্রুতপায়ে। ওদের পিছনে একটা বাড়ি। বাড়ির বাইরে সামান্য একটু জায়গা নিয়ে ফুলের গাছ। অদূরেই মসজিদটা। কামাল হঠাৎ বলে উঠল, 'শহীদ! গাড়িটা আবার ফিরে আসছে!'

এদিক ওদিক তাকাল শহীদ। মসজিদটা দেখা যাচ্ছে। গম্বুজের মাথা থেকে এখনও ঝুলছে প্যারাশুটটা। কামাল দৌড়ুল। দৌড়ুবার শব্দে ঘুরে তাকিয়ে দেখল পিছন দিককার বাড়িটার সামনের বাগানে আত্মগোপন করছে কামাল। আপাতত আত্মগোপনের এটাই সর্বোত্তম স্থান। শহীদও নিচু বেড়ার দেয়াল টপকে প্রবেশ করল বাগানের ভিতর। পরের মুহূর্তেই রাস্তার চৌমাথায় দেখা গেল জীপ গাড়িটাকে। ফিরে এসেছে ওটা আবার। গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা সরু গলির সামনে। এই গলিতেই প্রথমে আত্মগোপন করার কথা ভেবেছিল শহীদ প্রথমবার, যখন গাড়ির শব্দ শুনতে পায় ও। গলিটা থেকে ওরা এখন মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাত দূরে রয়েছে। গাড়ির ভিতর থেকে উর্দু ভাষায় কে যেন কথা বলে উঠল। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়, 'আশ্চর্য! স্ট্রীটল্যাম্পের কাচ ভেঙে ফেলেছে দেখছি!'

জীপটা থেকে চারজন লোক নামল। ওদের প্রত্যেকের কোমরে পিস্তল ঝুলছে। বিরাট লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা চারজনের। টর্চ জ্বেলে রাস্তার এদিক-ওদিক অনুসন্ধান চালাতে শুরু করল লোকগুলো। একজনের টর্চের আলো গিয়ে পড়ল মসজিদের উপর দিকে। অমনি সে চিৎকার করে উঠল, 'প্যারাশুট! আরে, একি! সাবধান, ছত্রী গুপ্তচর নেমেছে!'

দ্বিতীয় একজন বলে উঠল, 'এই, সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দাও। হয়ত একজনই নামেনি, ওরা কয়েকজনও হতে পারে। শহরের বাইরে যাতে কোনভাবেই যেতে না পারে তার ব্যবস্থা কর। পেট্রল কারগুলোতে খবর পাঠাও, সব রাস্তা ব্লক করে দিতে বল।

লোকগুলোর কথাবার্তা শুনতে শুনতে শক্ত-কঠিন হয়ে উঠল শহীদ ও কামালের মুখাবয়ব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ওদের। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মেম্বার সরফরাজ খানের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ওরা এসেছে। শহরে আটকে গেলে ধরা পড়ে যাবে ওরা।

চারজন লোক দ্রুতপায়ে মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উপর পানে

তাকিয়ে গম্বুজের সাথে জড়ানো প্যারাশুটটা পর্যবেক্ষণ করছে ওরা জীপ গাড়ির দিকে পিছন ফিরে।

শহীদ আচমকা নিঃশব্দে লাফ দিয়ে বাগানের বেড়া টপকে অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল, 'আয়, কামাল!'

জুতো আগেই খুলে ফেলেছিল ওরা দৌড়ুবার সময়। শুধু মোজা পায়ে রয়েছে বলে ওদের দৌড়ুবার শব্দ লোক চারজন শুনতে পেল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জীপ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে লাফ দিয়ে চড়ে বসল শহীদ। পরমুহূর্তে ওর পাশে দেখা গেল কামালকে। গাড়ি ছেড়ে দিল শহীদ। অকস্মাৎ গাড়িটা সশব্দে চলতে শুরু করে দিয়েছে দেখে চারজন লোকই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল। পাঁচ সেকেণ্ড পরই গাড়ির পিছন পিছন দৌড়ুতে শুরু করল ওরা। এবং কোমর থেকে পিস্তল বের করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু শহীদ তখন জীপ নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

দুটো মোড় নিতেই কামাল সামনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল প্রায়, 'সামনে বন্ধ! সামনে রাস্তা বন্ধ!'

শহীদ উত্তর দিল না। কেবল শক্ত হয়ে উঠল ওর মুখমণ্ডল। একটা সুইচ অন করল ও। সামনের বামপার থেকে বেজে উঠল সাইরেন। রাস্তা ব্লক করে যে জীপ গাড়িটা আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়েছিল সেটা মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার একপাশে সরে গেল। বিদ্যুৎবেগে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। শহীদকে চিন্তিত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। আধুনিক রেডিও ফিট করা এই জীপগুলো কাদের? কারা টহল দিয়ে ফিরছে এই সরকারবিহীন শহরে? তবে কি ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং অর্থশালী কোন অপরাধী দল গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলে?

ফাঁকা রাস্তা পাওয়াতে শহর থেকে বেরিয়ে আসতে দেরি হল না ওদের। কিন্তু দুজন গুপ্তচর জীপ গাড়ি করে পালাচ্ছে এ খবর শত্রুপক্ষের পেট্রল কারগুলোয় পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?

'সকাল হয়ে আসছে। কতদূর আর?' কামাল বলে উঠল।

পাহাড়ী এলাকার ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ি। প্রভাত রশ্মি পুব দিগন্তে ফুটতে শুরু করছে। মোড় নিল শহীদ। পরমুহূর্তে ব্রেক কষল ও আচমকা। অদূরবর্তী পরের মোড়েই রাস্তা ব্লক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পেট্রল কার। বনেটের উপর, ওদের দিকে মুখ করে, একটা রাইফেল তাক করা। শহীদ চিৎকার করে উঠল, 'নেমে পড়!'

পরমুহূর্তে রাইফেলের গর্জনে পাহাড়ী এলাকার নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল। কামালের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল পর পর দুটো বুলেট। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে রাস্তা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী ঝোপগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দুজন। শক্ত, ঢালু পাথুরে জমির উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটেছে ওরা উপরপানে। পিছনে পদশব্দ

হচ্ছে। ধাওয়া করছে শত্রুপক্ষ।

ধাতব কোন বস্তুর সংঘর্ষজনিত শব্দ কানে ঢুকল শহীদের। বহু উপর থেকে এল শব্দটা। সেদিকপানেই ছুটল শহীদ। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ও দেখল উপর-দিকে একটা রোপওয়ে। স্থানে স্থানে কাঠের পোস্ট আর পাথরের স্তূপ, মজবুত তারের সরলরেখা দেখা যাচ্ছে, ক্রমশ দূরবর্তী পাহাড়ের বাঁকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সব। শহীদ ক্ষুদ্র একটা কম্পাস বের করে দিক নির্ণয় করে নিয়ে বলল, 'ওই রোপওয়ে সোজা চলে গেছে সরফরাজের কেবিন ছাড়িয়ে।'

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে রোপওয়ের নিচে একটা স্টীলের খাম্বার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। রোপওয়েকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে অসংখ্য স্টীলের খাম্বার সাথে যুক্ত মজবুত তার। শহীদ খাম্বা ধরে উঠতে শুরু করল উপর দিকে। কামাল অনুসরণ করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারগুলো ছাড়িয়ে গেল ওরা। শহীদ দেখল একটা বক্স প্রায় কাছে এসে পড়েছে। বক্সটা খালি। কিন্তু বক্সের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। ছাদে চড়লে ভারসাম্য রক্ষা করা মুশকিল। ও বলল, 'ওটা নাগালের মধ্যে এলেই ডানদিক ঘেঁষে ধরে ফেলবি কামাল, আমি বাঁ দিকটা ধরে ঝুলব। ...রেডি!'

একই সঙ্গে নুয়ে পড়ল দুজন। সাফল্যের সঙ্গে বক্সের মাথার দুদিকের রেলিং ধরে ফেলল ওরা। রোপওয়ে নিজস্ব গতিতে গাছপালা, পাহাড়ী খাদ, ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদির উপর দিয়ে এগিয়ে চলছে। ক্রমশ গাছপালার সংখ্যা কমে আসতে লাগল। খানিকপরই দৃষ্টিগোচর হল সরু একটা পাহাড়ী পথ। শহীদ হঠাৎ সাবধান করে দিয়ে বলল কামালকে, 'রাস্তার উপর মটরসাইকেল আর সাইডকার দেখা যাচ্ছে, কামাল! মেশিনগান ওদের হাতে! সাবধান, শত্রুপক্ষ ওরা!'

মটরসাইকেল সাইডকারের দিকে সোজা রোপওয়ে এগিয়ে চলল। শত্রুপক্ষ মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কিন্তু কাছাকাছি পৌছুতেই সাইডকারের চালক মুখ তুলে তাকাল উপরদিকে। শিউরে উঠল শহীদ এবং কামাল। লোকটা বিনকিউলার লাগিয়ে ওদেরকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে। এক-এক করে পাঁচ সেকেণ্ড কাটল। বিনকিউলার নামিয়ে লোকটা হাত দিল মেশিনগানে। পরমুহূর্তে ঠা ঠা ঠা শব্দ উঠল মেশিনগানের। কিন্তু স্টার্ট দেয়া মটরসাইকেলের উপর বসে লক্ষ্যস্থির রাখতে পারল না লোকটা। গুলিগুলো ওদের দুজনার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। সামনেই একটা স্টীলের খাম্বা। শহীদ ইঙ্গিত করল কামালকে। রোপওয়ে এগিয়ে চলেছে। শত্রুপক্ষের মাথার উপর পৌছুনো মানে নির্ঘাৎ মৃত্যু। খাম্বাটা নাগালের মধ্যে আসতেই ঝাঁপ দিয়ে ধরে ফেলল ওরা সেটাকে। পিছন ফিরে তাকাল শহীদ। পিছন দিক দিয়ে এবার কোন বক্স আসছে না, আসছে অসংখ্য বাঁশ। কামালকে ইঙ্গিত করে খাম্বার আরও খানিক উপরে উঠে গেল শহীদ। ওদের দুজনার সামনেই স্টীলের খাম্বাটা দেয়ালের কাজ দিচ্ছে। গুলি আসছে বৃষ্টির ফোঁটার মত। কিন্তু

ওদের দুহাত তফাৎ দিয়ে চলে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

অবশেষে বাঁশগুলো নাগালের মধ্যে এসে পড়ল। বাঁশগুলো বাঁধা রয়েছে রোপওয়ের তারে। সঙ্গে লোহার আঙটা দিয়ে। আঙটায় একটা তালা ঝুলছে। খাম্বা থেকে নুয়ে পড়ে লোহার চওড়া আঙটার মাথার উপর উঠে দাঁড়াল ওরা। পায়ের নিচে বাঁশ। শত্রুপক্ষের মাথার উপর দিয়ে যাবার সময় বিপদের আশঙ্কা এখন অল্প। কিন্তু খানিকদূর এগোবার পরই দৃষ্টির বাইরে আর লুকিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যা করার তা আগেই করতে হবে। ইতিমধ্যে একাধিক শত্রু গুলি ছুঁড়ছে উন্মত্তের মত।

ঘাম ফুটে উঠেছে শহীদের কপালে। লোহার চওড়া আঙটার উপর বসে পড়ল ও। কামাল ওর কাঁধে ভর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করল। লোহার আঙটার নিচে তালার মুখে হাত দিয়ে তালাটা দেখে নিল শহীদ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শত্রুপক্ষের মাথার উপর পৌঁছে গেল রোপওয়ে। যে ক্ষুদ্র শিকলে তালাটা ঝুলছে তার উপর দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রচণ্ড ঘুসি মারল শহীদ। হাতের ব্যথায় মাথাটা ঘুরে উঠল শহীদের। কয়েক সেকেণ্ড চোখ বন্ধ করে বসে রইল ও। তারপর শোনা গেল শব্দ। তালা খুলে যেতেই লোহার বেস্টনীর মুখ খুলে গিয়ে শত শত বাঁশ সশব্দে উপর থেকে পড়তে লাগল রাস্তার উপর। চোখ মেলে তাকাল শহীদ। শত্রুপক্ষের দুজন লোকই বাঁশের ধাক্কা খেয়ে রাস্তার উপর গড়িয়ে পড়েছে। কোন নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না তাদের। বাঁশগুলো উল্টে দিয়েছে সাইডকারটাকেও। পরবর্তী স্টীলের খাম্বা ধরে রোপওয়ে ছেড়ে নিচে নেমে এল ওরা। রাস্তা ধরে ছুটল। সাইডকারের কাছে পৌঁছে গেল ওরা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। দুজনে মিলে সাইডকারটাকে দাঁড় করাল। এঞ্জিন চলছে এখনও। আহত লোক দুজনার মধ্যে একজন মাথা ঘষছে রাস্তার কাঁকরের উপর। মোটরসাইকেলে চেপে বসল শহীদ। কামাল বসল পাশে। ছুটিয়ে নিয়ে চলল শহীদ সাইড-কারটাকে। কামালের উদ্দেশ্যে ও বলল, 'এই পাহাড়ী পথটাই সরফরাজের কেবিন ছুঁয়ে গেছে।' সাইডকারের গর্জনকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠে কামাল বলল, 'বলা যায় না সে কেবিনে আছে কিনা। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে যে খবর তাকে দেয়া হয়েছে তাতে সে জানে গতরাতে পৌঁছুব আমরা তার কাছে।'

কামাল তীক্ষ্ণ চোখে পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সাইডকারের মেশিনগানে হাত ওর। সদা প্রস্তুত। ওরা বুঝতে পারছে ইতিমধ্যে পাহাড়ী অঞ্চলের প্রতিটি শত্রুপক্ষীয় অনুচর খবর পেয়ে গেছে দুজন পাকিস্তানী গুপ্তচর 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে' অনুপ্রবেশ করেছে। পায়ে চলা এবড়োখেবড়ো একটা সরু পথের মুখে মোটরসাইকেল দাঁড় করাল শহীদ। এদিক ওদিক দেখে নিল ও। তারপর সেই পথ দিয়ে চলল গাড়ি চালিয়ে। খানিকদূর যেতেই ওরা দেখল পথটা ক্রমশ উপর দিকে উঠে গেছে।

ক্রমশ পাহাড়ের উপর উঠল ওরা। তারপর নামতে শুরু করল আবার। নিচে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে সাইডকারটাকে রেখে গাছপালার ভিতর দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল ওরা। খানিকদূর এসে থমকে দাঁড়াল শহীদ। গাছের ফাঁক দিয়ে অদূরেই দেখা যাচ্ছে একটা কেবিন ঘর। সন্ধানী চোখে খানিকক্ষণ দেখল ওরা কেবিনটাকে। কেবিনের বাইরে একজন লোক অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে রাস্তার দিকে। শহীদ কামালের উদ্দেশ্যে বলল, 'ঠিক আছে। ও-ই আমাদের লোক—সরফরাজ খান। আমরা আসছি কিনা দেখছে ও।'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাত তুলে তিনটে আঙুল দেখাল শহীদ। সরফরাজ খান উত্তরে পাঁচটা আঙুল দেখাল। এবার শহীদের একটা আঙুল দেখাবার কথা—তাহলেই ওদেরকে নিজেদের লোক বলে চিনে নিতে পারবে সরফরাজ খান। আঙুল দেখাল শহীদ। সরফরাজ খান ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল, 'ব্যাপার কি! বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি। আপনাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম প্রায়। গত তিনবারে আমাদের তিনজন লোক ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে, 'আশঙ্কা করছিলাম আপনাদের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে, স্যার।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনার কাছ থেকে ব্রাঞ্চ কোন খবর পায়নি কেন?' আমাদের তিনজন লোক যে নিহত হয়েছে এখবর ব্রাঞ্চের কেউ এখনও জানে না, অথচ আপনি জেনেও খবর পাঠাননি—কারণ?

সরফরাজ খান ব্যাখ্যা করে বলল, 'ব্রাঞ্চ থেকে প্রতিদিন প্রতিটি খবর পেয়ে আসছি আমি, স্যার! সব খবরই আমি রিসিভ করেছি। ব্রাঞ্চ যে তিনজন লোককে 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে' পাঠিয়েছে তাদের খবর চাওয়া হচ্ছে আমার কাছ থেকে, তা-ও শুনেছি বইকি। কিন্তু খবর রিসিভ করেও উত্তর দিতে পারিনি। কেননা, আমার চেয়ে শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার যন্ত্র শত্রুপক্ষের কাছে রয়েছে। আমি খবর পাঠালেই আমার অবস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ত, স্যার।'

শহীদ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'সেক্ষেত্রে ঠিকই করেছেন আপনি খবর না পাঠিয়ে।'

সরফরাজ খান জানতে চাইল, 'আপনাদের গতরাতে পৌঁছুবার কথা। রাস্তায় বিপদ-আপদ দেখা দিয়েছিল নাকি?'

শহীদ যা যা ঘটেছে বলে গেল সব। শুনতে শুনতে সরফরাজ খানের মুখাবয়ব কঠিন হয়ে উঠল। শহীদের কথা শেষ হতেই গম্ভীর গলায় সে বলল, 'তাহলে ই-আলী পিছনে লেগেছিল আপনাদের। এই ই-আলীই আমাদের শত্রু। "নো ম্যানস ল্যাণ্ডের" সর্বত্র এই ভয়ঙ্কর শয়তান তার প্রভাব বিস্তার করেছে। লোকটা আসলে একজন ইহুদি। কিন্তু ছদ্মনাম নিয়ে এলাহি কাণ্ড শুরু করে দিয়েছে সে। বিদেশী একটা ক্ষমতাবান ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সাহায্য করছে ওকে সবরকমে। তাতেই ই-

আলী ভয়ানক উদ্ধত এবং নির্মম হয়ে উঠেছে। "নো ম্যানস ল্যাণ্ডের" প্রতিটি অধিবাসী তার শক্তির আওতায়। রীতিমত আধা-সেনাবাহিনী গড়ে তুলছে সে এ অঞ্চলে।'

শহীদ অস্ফুটে বলল, 'পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে? কিন্তু "নো ম্যানস ল্যাণ্ডের" চতুর্দিকে ব্যারিকেড তৈরি করছে কেন? বিদেশী টুরিস্টদেরকেই বা ভাগিয়ে দিচ্ছে কেন? উদ্দেশ্য কি তার, খান? সব কথা জেনে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যেই এসেছি আমরা।'

প্রাক্তন এয়ারফোর্স পাইলট এবং বর্তমানের সিক্রেট এজেন্ট সরফরাজ খান শহীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অসাধারণ এবং ভীতিপ্রদ উচ্চাশা ই-আলীর। শুধু মাত্র "নো ম্যানস ল্যাণ্ডের" অধিকর্তা হবার প্ল্যান নিয়ে আসেনি সে, তার আশা পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ড থেকে যতটা সম্ভব জায়গা দখল করে ছোটখাট একটা রাষ্ট্রের অধিনায়ক হওয়া। বিদেশী প্রভুরা তাকে এই অদ্ভুত ষড়যন্ত্রে উৎসাহিত করে তুলেছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই ই-আলী গুপ্তচর পাঠিয়েছে। এর কারণ···।'

হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন শোনবার চেষ্টা করল সরফরাজ। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে পাহাড়ের দিক থেকে শব্দ আসছে যেন!'

কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল সরফরাজ। শহীদ ও কামালও তার সঙ্গে বাইরে বের হয়ে এল। খানিকক্ষণ কান পেতে শোনার পর ও বলে উঠল, 'হুঁ, ব্যাপার কিছু একটা ঘটছে। বিশেষ একটা খবর সংগ্রহ করেছি আমি, স্যার। ই-আলী তার সকল গুপ্তচরকে ডেকে পাঠিয়েছে গোপন বেতারে খবর পাঠিয়ে। 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডের' এয়ারপোর্টে আজ যে-কোন সময় সকলে ল্যাণ্ড করবে। আগামীকাল গুপ্তবৈঠকের ব্যবস্থা করেছে ই-আলী তার অনুচরদেরকে নিয়ে। এই গোপন বৈঠকে সে বিশেষ নির্দেশ দেবে তার এজেন্টদেরকে।'

চরম উত্তেজিত কণ্ঠে শহীদ প্রশ্ন করল, 'কি রকম নির্দেশ দেবে ই-আলী? আর কোথায় বসবে এই গুপ্ত-বৈঠক?'

'আমি জানি কোথায় মিলিত হবে ওরা, স্যার। গুপ্ত বৈঠক বসবে···!'

অকস্মাৎ থেমে গেল সরফরাজ খান। নুয়ে পড়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ইতিমধ্যে কেবিনের ভিতর ফিরে এসেছিল ওরা। শহীদও সরফরাজের দেখাদেখি জানালা পথে তাকাল। অকস্মাৎ ক্রমশ উচ্চকিত এবং গতিসম্পন্ন একটা বাতাস-চেরা শব্দ শুনতে পেল ও। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল মালভূমির কোথাও কিছু বিস্ফোরিত হবার ফলে। শহীদ ধাক্কা মারল সবেগে কামালকে। কামাল পড়ে গেল মাটিতে। সরফরাজকে ধাক্কা দেবার আগেই সে শুয়ে পড়ল ওদের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে সরে গিয়ে। শহীদ নিজেও কেবিনের মেঝেতে শুয়ে পড়ল হাত দিয়ে মাথা ঢেকে।

দ্বিতীয়বারও সেই একই ধরনের শব্দ শোনা গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরই প্রচণ্ড

বেগে নড়ে উঠল কেবিনঘরটা। শহীদ গাছের আড়াল দিয়ে যে বস্তুটাকে প্রথমে ছুটে আসতে দেখেছিল সেটা যে একটা মর্টারবম্ব তা ওর বুঝতে দেরি হয়নি। দ্বিতীয় মর্টার বম্বটা সোজা উড়ে এসে আঘাত হেনেছে কেবিনের মাথায়। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল শহীদের। দশ সেকেণ্ড পর মাথা তুলে তাকাল। কামালকে মাথা ঝাড়তে দেখল ও ঘনঘন। উঠে দাঁড়াল শহীদ। কেবিনের ছাদের একটা অংশ উড়ে গেছে। বাঁশের ছাদ ধসে পড়েছে সরফরাজ খানের মাথায়। নুয়ে পড়ে নিঃসাড় শরীরটা দেখল শহীদ সরফরাজের। কামাল ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। সরফরাজকে পরীক্ষা করে শহীদ নিরাশ ভঙ্গিতে বলল, 'জ্ঞান হারিয়েছে সরফরাজ। কয়েক ঘন্টা লাগতে পারে ওর জ্ঞান ফিরে পেতে, কয়েকদিন লাগলেও আশ্চর্য হব না—আঘাত সামান্য নয়। এদিকে ও যে গুপ্ত-বৈঠকের কথা বলেছিল তা আগামীকাল হতে যাচ্ছে···।'

কথাগুলো বলতে বলতে সদ্যভাঙা দরজার কাছে গিয়ে চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাল শহীদ। তারপর প্রসঙ্গ বদলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে! ই-আলীর অনুচররা মালভূমির আরও কাছে সরে আসছে মর্টারবম মেরে কেবিনটাকে ধুলোয় পরিণত করার জন্যে। ওরা হত্যা করতে আসছে, কামাল!'

দুই

শত্রুরা মালভূমির নিচে। ভেঙে পড়া দরজাটা ওদেরকে আড়াল করে রেখেছে শত্রুপক্ষের দৃষ্টিপথ থেকে। বিধ্বস্ত প্রায় কেবিনের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। ক্রমশ-উচ্চ বনভূমির দিকে তাকাল ও। তারপর হাঁটুর নিচে বাঁধা একটা নাইলনের কেস বের করল দ্রুত হাতে। ধাতব পদার্থ মিশ্রিত একটা টিউব এবং কমপ্রেশড এয়ার সিলিণ্ডার দুটো ফিট করল ও কেসটা থেকে বের করে। সিলিণ্ডারের মাথায় একটা পিন গেঁথে দিল ও এবার। তারপর সতর্কভাবে লক্ষ্যস্থির করে শহীদ নিরুদ্ধ বায়ু ছেড়ে দিল। বায়ুর প্রচণ্ড চাপে পিনটা অসম্ভব বেগে ছুটে চলে গেল বনভূমির দিকে।

কামাল শহীদের পাশে এসে দাঁড়াল।

শহীদ একটা ফাউন্টেনপেন বের করে ঠোঁটের কাছে ধরল। কামাল দেখল শহীদ কলমটার মাথার কাছে ঠোঁট ঠেকিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলে চলেছে। ও জানে কলমটা একটা শক্তিশালী মাইক্রো-ট্র্যান্সমিটার। শহীদ মৃদুস্বরে কলমটার কাছে ঠোঁট নামিয়ে যা বলল হুবহু সেই কথাগুলোই অসম্ভব উচ্চ কণ্ঠে শোনা গেল। বনভূমির দিকে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতি পিনটা থেকে ট্র্যান্সমিট হচ্ছে, 'প্রাণপণে দৌড়া, কামাল! এই বনভূমি ধরেই পালাতে হবে আমাদেরকে! ওরা ততক্ষণ কেবিনটায়

খোঁজাখুঁজি করুক আমাদেরকে—আমরা ইতিমধ্যে পগার পার হয়ে যাই!

কথাগুলো শহীদ বিশুদ্ধ উর্দুতে উচ্চারণ করল। শত্রুপক্ষ নিঃসন্দেহে শুনেছে কথাগুলো। শহীদের চালাকী ধরা না পড়লে শত্রুপক্ষ কেবিনের নিচ দিয়ে বনভূমির দিকে ছুটবে ওদেরকে ধরার জন্যে।

ঠিক তাই হল। কথাগুলো শুনে শত্রুপক্ষ মনে করল শহীদরা পালাচ্ছে বনভূমির ভিতর দিয়ে। তারা কেবিনের দিকে না এসে নিচে দিয়েই ছুটে চলে গেল জঙ্গলের দিকে। কেবিনের ভিতর শহীদ ও কামাল তখন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে চরম উত্তেজনায় শ্বাস বন্ধ করে।

শত্রুরা সকলে বনভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে শহীদ দ্রুত সরফরাজ খানের অচেতন দেহটা নিজের কাঁধে তুলে নিল। প্রায় ছুটতে লাগল ওরা কেবিন থেকে বের হয়ে এসে। মিনিট পাঁচেক পরই ওরা পৌঁছে গেল লুকিয়ে রেখে যাওয়া সাইডকারের কাছে।

সাইডকারে সরফরাজ খানকে তুলে ওরাও চেপে বসল। শহীদ বলল, 'সরফরাজকে এই মুহূর্তে ডাক্তার দেখানো দরকার। বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, তবু শহরে ঢুকতে হবে আমাদেরকে। আসার সময় হাসপাতালের সাইনবোর্ড দেখে এসেছি আমি।'

'হাসপাতালের সাইনবোর্ড! এখানে হাসপাতাল এল কোথা থেকে?'

শহীদ বলল, 'ই-আলী এই অঞ্চলের জনসাধারণের মন জয় করার জন্যে বেশ কিছুদিন আগে একটা হাসপাতাল তৈরি করেছে। তখন সে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। ই-আলী তখন দানশীল জনদরদী হিসেবে পরিচিত ছিল। শুধু হাসপাতালই নয়, ফোন, ইলেকট্রিসিটি, আধুনিক যানবাহন—এসবের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে সে।'

সাইডকার প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছে। কামাল মেশিনগানের উপর হাত রেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। শহরে প্রবেশ করল ওরা। কেউ কোনরকম বাধা সৃষ্টি করল না। হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢুকল সাইডকার। শহীদ বারান্দার সামনে গিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল।

স্ট্রেচারে করে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল সরফরাজ খানকে। একজন মধ্যবয়স্ক ডাক্তার পরীক্ষা করল তাকে। রুম থেকে বেরিয়ে শহীদের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বলল, 'মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে কয়েকদিন। তাছাড়া ঠিক কখন যে জ্ঞান ফিরবে তা-ও নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। দুদিনও লাগতে পারে।'

ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে শহীদ কামালকে বলল, 'সরফরাজের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে ই-আলী আগামী কাল কোথায় তার গোপন-বৈঠক শুরু

করতে যাচ্ছে।'

কামাল বলল, 'আমাদের দুর্ভাগ্য, সরফরাজ বলতে যাচ্ছিল কোথায় বসবে এ গোপন-বৈঠক, ঠিক এমন সময় শত্রুরা আক্রমণ চালিয়ে বসল।'

শহীদের মুখাবয়ব উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ। ও বলল, 'একটা কথা! সরফরাজ বলেছিল ই-আলীর এজেন্টরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করবে। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের কাজ শুরু করা যেতে পারে, কামাল। ই-আলী অনুচরদেরকে অনুসরণ করতে পারলে গোপন-বৈঠকের ঠিকানা জানা যাবে সহজেই।'

শহীদের কথা শেষ হতে কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল। শহীদ হঠাৎ চাপা কণ্ঠে সাবধান করে দিল ওকে, 'চুপ!'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল ওরা দুজন। কামাল ভেবে বিস্মিত হল সাইডকার না নিয়ে শহীদ কেন বাইরে বের হয়ে এল। নিশ্চয় কোন কারণ আছে, কামাল ভাবল।

শহীদ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাতঘড়িটা উঁচু করে ধরল। ঘড়ির সঙ্গে ফিট করা রয়েছে ছোট্ট একটা আয়না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা নামিয়ে নিল শহীদ। কামালকে ও মৃদুস্বরে বলল, 'কামাল! যা ভেবেছিলাম তাই। হাসাপাতাল থেকেই একজন লোক অনুসরণ করছে আমাদেরকে। কামাল, সামনের মোড়ের কাছে গিয়ে আমাদের "ধোঁকা-বোকা" কৌশলটা শুরু করতে হবে।'

কামালের ঠোঁটে অস্পষ্ট একটু হাসির রেখা দেখা গেল। মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

খানিক পরই মোড় ঘুরল ওরা। মোড় ঘুরেই শহীদ একটা বাড়ির দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কামাল আগের মতই হেঁটে চলল। একজন লোকের পিছনে হাঁটছে ও। পিছন থেকে মনে হবে কামাল শহীদের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে। মোড় ঘুরে অনুসরণকারী এতটুকু সন্দেহ করবে না যে শহীদ অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তাই-ই হল। অনুসরণকারী লোকটা মোড় ঘুরে কামালকে অনুসরণ করে চলল। কামাল তখনও তার সামনের পথিকের পিছু পিছু হাঁটছে, যেন কথা বলছে সে মাথা নেড়ে নেড়ে।

শহীদকে ছাড়িয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল অনুসরণকারী। এদিকে কামাল একটা পাবলিক বুদ ছাড়িয়ে গেছে। অনুসরণকারী তাকে বিনা সন্দেহে অনুসরণ করে চলেছে। শহীদ পাবলিক বুদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দ্রুত প্রবেশ করল বুদে। ক্রাডলের নিচে পয়সা ফেলবার ছিদ্রে ধাতুর তৈরি একটা গোল চাকতি ফেলল শহীদ। ফোন করল না কোথাও। পরমুহূর্তে পাবলিক বুদ থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। এদিকে সে বুদ থেকে বেরিয়ে

আসতেই কামাল হঠাৎ পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কামালকে দেখে অনুসরণকারী লোকটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল। বোকার মত তাকিয়ে রইল সে কামালের দিকে। তাকে যে বোকা বানানো হয়েছে তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পা চালাল সে। পাবলিক বুদের কাছে এসে পড়ল দ্রুত পায়ে। বুদের ভিতর ঢুকে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করে সে বলল, 'পাঁচ নাম্বার চাবি বলছি। খানিকক্ষণ আগে একজন আহত লোককে একটা সাইডকারে করে নিয়ে এসে দুজন লোক হাসপাতালে রেখে গেছে। লোক দুজনকে ফলো করছিলাম আমি। একজন ধোঁকা দিয়ে সটকে পড়েছে। অন্যজন তাকে খুঁজছে। আমার সন্দেহ, প্যারাশুটে করে যে দুজন স্পাই ল্যাণ্ড করেছে এরা…।'

শহীদ বুথের ভিতর যে ধাতব চাকতিটা রেখে এসেছে তা থেকে ট্র্যান্সমিট হচ্ছে লোকটার প্রতিটি কথা শহীদের হাতঘড়িতে। হাতঘড়িটা কানের কাছে ধরে লোকটার কথাগুলো শুনল শহীদ। সব কথা শোনার ধৈর্য হল না ওর। কামাল ইতিমধ্যে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ও বলল, 'হাসপাতাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছি আমরা, কামাল। ই-আলীর লোক সরফরাজ খানকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে পালাবে। ওকে বাঁচাতে হলে তার আগেই পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে। সরফরাজ ধরা পড়া মানেই ওর মৃত্যু অবধারিত।'

রাস্তায় বেশ ভিড় যানবাহনের। কিন্তু কোন্‌টা কোন্‌দিকে যাবে কে জানে। লোকজনের পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলল ওরা হাসপাতালের দিকে।

মিনিট সাতেক লাগল ওদের হাসপাতালের ভিতর এসে পৌঁছুতে। গাড়ি-বারান্দায় একটা অ্যাম্বুলেন্সকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কামাল চাপা কণ্ঠে বলল, 'ই-আলী দেখছি সময় নষ্ট করেনি!'

শহীদ বলল, 'যদি এই অ্যাম্বুলেন্সটা সরফরাজকেই নিতে এসে থাকে, তাহলে ঠিকই বলেছিস তুই।'

অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দরজাটা খোলা। ভিতরে কেউ নেই। রিশেপশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করে শহীদ জানতে পারল সরফরাজকে রাখা হয়েছে টপ-ফ্লোরের প্রাইভেট ওয়ার্ডে। ক্লার্কটা আরও জানাল যে সরফরাজকে অন্য এক হাসপাতালে বদলি করা হচ্ছে। শহীদ লিফটের দিকে দ্রুত এগোল। কামাল পিছু নিল ওর। দুটো লিফটের একটা উপরে গেছে। দ্বিতীয়টায় ঢুকল ওরা। উপরে উঠে প্রাইভেট ওয়ার্ডের কেবিনগুলোয় উঁকি মেরে দেখতে শুরু করল ওরা। হাতের কাছে নার্স বা ডাক্তার কাউকেই পাওয়া গেল না। কেবিনগুলো পরীক্ষা করে বিচলিত হয়ে উঠল শহীদ। কোন কেবিনেই সরফরাজ নেই। হঠাৎ শহীদের মনে পড়ে গেল একটা কথা। ওরা যখন লিফট নিয়ে উপরে উঠছিল তখন উপর থেকে নামছিল প্রথম লিফটা।

দ্রুত করিডরের রেলিঙের কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকাল শহীদ। চমকে

উঠল ও। সরফরাজ খানকে স্ট্রেচারে করে ওঠানো হচ্ছে অপেক্ষারত অ্যাম্বুলেন্সে। ছুটতে শুরু করল শহীদ। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে পড়িমরি করে নামতে লাগল ও পাঁচতলা থেকে। লিফট দুটোই নিচে চলে গেছে।

পাঁচতলা থেকে দোতলায় নামতেই অ্যাম্বুলেন্সের স্টার্ট দেবার শব্দ কানে ঢুকল শহীদের। নিচে নেমে গাড়িটাকে আটকানো যাবে না তা ও বুঝতে পারল। অথচ সরফরাজকে এই মুহূর্তে মুক্ত করতে না পারলে চিরজীবনের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে ওকে জীবিত ফিরে পাবার আশা। বারান্দার রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়ল শহীদ লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে। অ্যাম্বুলেন্স মৃদু গতিতে চলতে শুরু করেছে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল শহীদ। পিছন না ফিরেই কামালের উদ্দেশ্যে 'আয়' বলে রেলিং টপকে হাত খানেক চওড়া কার্নিসে লাফিয়ে পড়ল ও। কামালও অনুসরণ করল ওকে। পরমুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সটাকে দেখা গেল ওদের নিচে, মাত্র দুহাত নিচে অ্যাম্বুলেন্সের ছাদ। বিপদকে অগ্রাহ্য করে আবার লাফ দিল শহীদ। পরমুহূর্তে কামালও লাফ দিল। দুজনই সময় মত পড়ল অ্যাম্বুলেন্সের মসৃণ ছাদে। গড়িয়ে পড়া থেকে কোনমতে নিজেদের রক্ষা করল শহীদ ও কামাল। গাড়িটা তখন হাসপাতালের গেটের বাইরে বের হয়ে সবেগে ছুটে চলেছে। পিছন থেকে শোনা যাচ্ছে হৈ-হৈ শব্দ। কিছু লোক অ্যাম্বুলেন্সের ছাদে ওদেরকে দেখতে পেয়ে তুমুলভাবে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু ড্রাইভার খেয়াল দিল না সেদিকে। শহীদ ও কামাল গাড়ির ছাদের উপর লাফিয়ে পড়াতে যে শব্দটুকু হয়েছিল তা ঢাকা পড়ে গেছে সাইরেনের তীক্ষ্ণশব্দে। সাইরেন বাজিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে তীর বেগে ছুটে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স। কামাল ছিটকে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে শক্ত করে ধরে আছে শহীদের একটা হাত। শহর ত্যাগ করে পাহাড়ী এলাকার নির্জন রাস্তায় গিয়ে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স। খানিকদূর যেতেই রাস্তার দুপাশে গভীর খাদ দেখা গেল। গতি কম হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সের। ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠছে গাড়ি। হঠাৎ চাপা কণ্ঠ শোনা গেল শহীদের, 'দেখ!'

সামনেই একটা ড্র-ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ব্রিজের ওপারে বৃহদাকার এবং সুউচ্চ একটি প্রাচীন দুর্গ। দুর্গের প্রবেশ পথে সশস্ত্র সেন্ট্রিরা পাহারা দিচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে যাচ্ছে ড্র-ব্রিজের দিকে।

লাফ মেরে গাড়ির ছাদ থেকে নেমে পড়ল শহীদ রাস্তার ধারে। একই সঙ্গে কামালও নামল। শহীদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'দুর্গটা নিশ্চয়ই ই-আলীর আস্তানা। শয়তানটা যে কী ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তাঁর প্রমাণ প্রতি পদে পাচ্ছি। সারা পৃথিবী থেকে ই-আলীর যে এজেন্টরা আসছে তারা নিশ্চয় এখানেই মিলিত হবে গুপ্তবৈঠকে।'

কামাল প্রশ্ন করল, 'কিন্তু এতগুলো সেন্ট্রিকে কাবু করে বা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, শহীদ!'

উত্তেজিত দেখাল কামালকে। শহীদ বলল, 'ঢুকতে আমাদেরকে অবশ্যই হবে দুর্গের ভিতরে। গোপন বৈঠক একটা কারণ, তারচেয়ে বড় কারণ সরফরাজকে রক্ষা করা। এয়ারপোর্টই পথ দেখাবে আমাদেরকে। আজ-ই ই-আলীর এজেন্টরা ল্যাণ্ড করবে। চল, এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, কি করা যায়। ই-আলীর এজেন্টদের সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।'

মাইল তিনেক রাস্তা দৌড়ে অতিক্রম করল ওরা। তারপর পাওয়া গেল একটা ট্যাক্সি। কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা এয়ারপোর্টে। লাউঞ্জের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কামাল জিজ্ঞেস করল, 'ই-আলীর সিক্রেট এজেন্টদেরকে কিভাবে চিনব আমরা?'

শহীদও সে কথা ভাবছিল। বাইরের দিকে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের যানবাহন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রতিটি গাড়ি দেখল শহীদ। লম্বা একটা মিনি-বাসের উপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর। মিনি-বাসের ড্রাইভারের পাশে একজন সশস্ত্র সেন্ট্রি বসে রয়েছে। কামালকে উদ্দেশ্য করে শহীদ বলল, 'আমার ধারণা ওই মিনি-বাসটা অপেক্ষা করছে সিক্রেট এজেন্টদের জন্যে। বিভিন্ন প্লেনে আসবে ওরা, নজর রাখা যাক কারা চড়ে ওতে, ই-আলীর এজেন্টদের বিশেষ কোন চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় আছে।'

প্লেন ওঠানামা করছে খানিক পরপরই। যারা আসছে তারা সবাই এই এলাকার স্বাধীন অধিবাসী বিদেশী আসা বন্ধ করে দিয়েছে তথাকথিত 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে' ই-আলী তার ক্ষমতা বিস্তার করার পর। মিনিবাসে বেশ কয়েকজন লোক চড়েছে। শহীদ একসময় বলে উঠল, 'আমরা লাউঞ্জে আসার পর মিনি-বাসে পাঁচজন চড়েছে। পাঁচজনই নিজেদের বাঁ হাতে পরেছে দস্তানা, কিন্তু ডান হাতেরটা না পরে মুঠোর মধ্যে ধরা। এটাই বোধহয় ই-আলীর এজেন্টদের পরিচিতি চিহ্ন।'

কথা বলতে বলতে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে একটা প্যাসেজ ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। টারম্যাক থেকে লাউঞ্জে যেতে হলে এই প্যাসেজ ধরে এগোতে হবে। প্যাসেজের সর্বশেষ প্রান্তের দরজাটা খোলা। দরজার গায়ে লেখা—'মেইনটেন্যানস স্টোর'। শহীদ কামালের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল। তারপর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। রুমটা ছোট। বালতি, ঝাঁটা, নানারকম পরিষ্কারক সরঞ্জাম ভিতরে। উজ্জ্বল মুখে রুম থেকে বেরিয়ে দরজাটা আবার ভিড়িয়ে দিল শহীদ।

দুজনে টারম্যাকে গিয়ে দাঁড়াল। প্লেন নামল একটা। প্যাসেঞ্জাররা প্যাসেজ ধরে লাউঞ্জের দিকে পা বাড়াল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল শহীদের চোখের দৃষ্টি। দুজন প্যাসেঞ্জার এক হাতে একটি দস্তানা পরে অন্য হাতে আর একটি ধরে রয়েছে।

কোনও সন্দেহ নেই, দুজনাই ই-আলীর এজেন্ট।

শহীদ কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে লোক দুজনার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত ইঙ্গিত করল অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে সরে আসতে। লোক দুজন কি করতে হবে বুঝতে না পেরে সরে দাঁড়াল এক পাশে। অন্যান্য সবাই প্যাসেজ ধরে কিছুটা এগিয়ে যেতেই শহীদ লোক দুজনার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলল, 'আমাকে অনুসরণ কর। দুর্গে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি রয়েছে ওদিকে। মহামান্য ই-আলী অপেক্ষা করছেন সেখানে।'

শহীদের বক্তব্য এবং গম্ভীর কণ্ঠ শুনে অবিশ্বাস করতে পারল না ওকে লোক দুজন। বিনাবাক্যে অনুসরণ করল তারা। প্যাসেজের সর্বশেষ প্রান্তের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কামাল। লোক দুজন সেখানে পৌঁছুতেই সে এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজাটা। শহীদ আচমকা লোক দুজনকে সজোরে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল রুমের ভিতর। কামাল বন্ধ করে দিল রুমের দরজা। লোক দুজন মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পরমুহূর্তে তাল সামলে পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল ওরা। কিন্তু শহীদ ও কামাল ইতিমধ্যেই নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ফেলেছে। লোক দুজন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল শহীদের আদেশে। এবার দ্রুত কাজ শুরু করল ওরা। বন্দী এজেন্ট দুজনার রেনকোট, দস্তানা এবং টুপিগুলো খুলে নেয়া হল। দ্রুত পরে নিল ওরা রেনকোট আর হ্যাট। দস্তানা পরল ওরা বাঁ হাতে, ডান হাতে একটা করে দস্তানা ধরল। এজেন্ট দুজনকে ভাল করে বেঁধে বালতিগুলোর আড়ালে ফেলে রাখা হল। কামাল বলল, 'এখন কি করব আমরা?'

শহীদ বলল, 'আমরা দুজন এখন ই-আলীর সিক্রেট এজেন্ট। এই লোকগুলোর পরিবর্তে মিনিবাসে গিয়ে বসব আমরা। চল, লাউঞ্জে যাবার পর কি হয় দেখা যাক।'

হ্যাট নামিয়ে কপাল অবধি ঢেকে মাথা হেঁট করে লাউঞ্জে ঢুকল ওরা। ঢোকার পরপরই একজন বেঁটে এবং মোটা লোক ওদের দিকে এগিয়ে এল। ওদের হাতের দস্তানাগুলো দেখে নিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল তাকে অনুসরণ করার জন্যে।

বেঁটে এবং মোটা লোকটাকে অনুসরণ করে ওরা মিনিবাসে গিয়ে উঠল। বাসটা ইতিমধ্যে ভরে উঠেছে প্রায়। প্রত্যেকেরই পোশাক-আশাক শহীদ ও কামালের মত। কেউ কথা বলছে না কারও সঙ্গে। এতে করে সুবিধেই হল ওদের। বাস ছেড়ে দিল খানিক পর।

অবশেষে শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ী খাদের পাশ ঘেঁষে মিনিবাসটা পৌঁছুল ড্র-ব্রিজের কাছে। ধীর হয়ে গেল বাসের গতি। ব্রিজের উপর দাঁড়াল একবার। সেন্ট্রিরা ড্রাইভারের পাস চেক করল। সবশেষে এসে দাঁড়াল মিনি-বাসটা দুর্গের সুউচ্চ কদাকার দেয়ালগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা উঠনে।

তীক্ষ্ণস্বরে নির্দেশ এল, 'অতিথিরা নেমে পড়ুন। দয়া করে আমাকে অনুসরণ করুন সবাই। মহামান্য ই-আলী আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

সকলে নামতে শুরু করল বাস থেকে। সবশেষে নামল শহীদ ও কামাল। কামাল তাকিয়ে ছিল সতর্ক চোখে শহীদের দিকে। কিন্তু শহীদ তাকিয়ে ছিল যে লোকটা সবাইকে ই-আলীর কাছে নিয়ে যাবে তার দিকে। লোকটাও পলকহীন চোখে চেয়ে আছে শহীদের দিকে। তার চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়। বিস্ফারিত চোখের পাতা। শহীদকে চিনতে পারছে সে। ক্রমশ হাঁ হয়ে যাচ্ছে তার মুখ। এই লোকটাই হাসপাতাল থেকে শহীদ ও কামালকে অনুসরণ করে বোকা বনেছিল।

বিস্মিত ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে লোকটার। পাশের কয়েকজন সশস্ত্র সেন্ট্রির দিকে উত্তেজিতভাবে ঘুরে তাকাল সে। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠে শহীদ সম্পর্কে কিছু বলতে গেল।

আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শহীদ ও কামাল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী শয়তান ই-আলীর দুর্গে বন্দী হয়ে পড়বে।

তিন

সকলের শেষে বাস থেকে নেমেছিল শহীদ ও কামাল। অন্যান্য যাত্রী ইতিমধ্যে দুর্গের দরজা অতিক্রম করতে শুরু করেছে। ই-আলীর এজেন্টটা চেঁচিয়ে ওঠার আগেই ভয়ানকভাবে গর্জন করে উঠল শহীদ। তড়াক করে লাফ দিয়ে লোকটার মুখের উপর প্রচণ্ড বেগে ঘুসি বসিয়ে দিল ও একটা। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে, শহীদ নাটকীয়ভাবে চিৎকার করে উঠল, 'একজন গুপ্তচর!'

লোকটা ভূপাতিত হতেই শহীদ আবার কঠিন কণ্ঠে সেন্ট্রিদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'গ্রেফতার কর ওকে!'

কথাটা বলে পিছিয়ে এল শহীদ, যেন গ্রেফতার করার জন্যে জায়গা করে দিল সেন্ট্রিদেরকে। কামালকে ইঙ্গিত করে দুর্গের দরজার দিকে এগিয়ে চলল ও এবার দৃঢ় পদক্ষেপে। ই-আলীর এজেন্টরা দুর্গের একজন গার্ডকে অনুসরণ করে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। সকলের পিছন পিছন এগোতে লাগল শহীদ ও কামাল। শহীদ সর্বশেষ ব্যক্তির রেনকোটের পিছন দিকের বেল্টে আলতোভাবে একটা ক্ষুদ্র পিন গেঁথে দিল। সিঁড়ির ধাপগুলো উতরে চওড়া মত ফাঁকা একটা জায়গায় উঠে আসতে কামালের উদ্দেশ্যে শহীদ নিঃশব্দে আবার ইঙ্গিত করল। একদিকের করিডরে চলে এল ওরা সকলের অজান্তে। এজেন্টরা গার্ডকে অনুসরণ করে চলেছে। তারা কিছুই বুঝতে পারল না।

শহীদ করিডরে দাঁড়িয়ে পড়ে কামালকে বলল, 'যে লোকটাকে ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিলাম সে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, কামাল! সেন্ট্রিদেরকে পরিচয়পত্র

দেখিয়ে ব্যাপারটা ঘোলাটে করে তুলেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জানালা দিয়ে দেখেছি ওরা উত্তেজিতভাবে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে।'

এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল। করিডরের সর্বশেষ প্রান্তে উপরে ওঠার সিঁড়ি। ছুটে গিয়ে একসঙ্গে দুটো করে ধাপ টপকাতে শুরু করল শহীদ। কামালও পিছু নিল শহীদের, নিঃশব্দে। আচমকা কামালের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। উপরতলা থেকে নেমে আসছে ছুটন্ত পদশব্দ। নিচের তলার শব্দও দ্রুত হয়ে উঠছে ক্রমশ। শহীদ চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'উপর-নিচ দুদিক থেকেই গার্ডরা ছুটে আসছে আমাদের খোঁজে।'

সিঁড়ির মাঝখানের দেয়ালে গরাদহীন জানালা একটা। শহীদ উঁকি মেরে দেখল বাইরে। সময় নষ্ট না করে জানালার উপর চড়ে বসল ও। বহু নিচে দেখা যাচ্ছে দুর্গের উঠনটা। দেড়খানা সিঁড়ি ভেঙেছে ওরা, কিন্তু উঁচুতে উঠেছে প্রায় চারতলার সমান। দেয়ালকে ঘিরে সরু একটা কার্নিস দেখা যাচ্ছে পাথরের। অসংখ্য জানালার নিচে দিয়ে বেশ খানিকদূর অবধি দেখা যাচ্ছে কার্নিসটা। কিন্তু অস্বাভাবিক সরু।

কিন্তু ইতস্তত বা চিন্তা করার সময় নেই। জানালা গলে সেই সরু কার্নিসে নেমে পড়ল শহীদ। খানিক এগিয়ে গেল ও কামালকে জায়গা করে দেবার জন্যে। জানালার গরাদ নেই, কিন্তু পাল্লা আছে। বেশ খানিকটা দূরে সরে এল ওরা। পিছন ফিরে দেখল। জানালার পাল্লা খোলা থাকায় মুখ বের করে ওদেরকে কেউ দেখতে পাবে না কার্নিসে। কার্নিসের বাইরে শরীরের খানিকটা করে অংশ বেরিয়ে পড়েছে। শুয়ে-শুয়ে এক ইঞ্চি করে-করে এগোচ্ছে ওরা। বহু নিচে ই-আলীর সশস্ত্র সেন্ট্রিরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এতটুকু অন্যমনস্ক হলে ভারসাম্য হারিয়ে একেবারে নিচের উঠনে গিয়ে পড়ে মরতে হবে। এতটুকু শব্দ হলে সেন্ট্রিরা চোখ তুলে তাকিয়েই দেখে ফেলবে ওদেরকে। শহীদ অতি সাবধানে ঘাড় ঘুরিয়ে কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কামাল, গোলাগুলি চালাবার ফোঁকরওয়ালা ওই দেয়ালের ওপরে উঠতেই হবে আমাদেরকে ধরা পড়বার আগে।'

'বুঝলাম, কিন্তু এই কার্নিস থেকে তা সম্ভব নয়।'

কামালের কথা শেষ হতেই শোনা গেল একটা জানালার পাল্লা খোলার শব্দ। জানালাটা অদূরেই। ওরা বুঝতে পারল কেউ জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার শ্বাসের শব্দও কানে ঢুকল ওদের। পরমুহূর্তে শোনা গেল পদশব্দ। জানালা দিয়ে যতটুকু কার্নিস দেখা যায় তার মধ্যে কাউকে দেখতে না পেয়ে লোকটা ফিরে গেল আবার। উজ্জ্বল হয়ে উঠল শহীদের মুখ। কামাল বলল, 'কি ভাবছিস?'

শহীদ বলল, 'আমরা পিছু হটে ওই জানালার কাছে যাব এবার। লোকটা নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে গেছে।'

আবার অতি সন্তর্পণে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পিছুতে লাগল ওরা। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা রয়েছে উঠনের সেন্ট্রিদের চোখ তুলে তাকাবার। 'অবশেষে জানালার ফ্রেমের উপর দাঁড়িয়ে ব্যাটলমেন্টের উপর উঠে যাবার চেষ্টা করব। তুই আমার পা দুটো ধরে থাকবি।'

আতঙ্কে কেঁপে উঠল কামালের বুক। মারাত্মক বেপরোয়া ধরনের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে শহীদ। দুর্গের এত উঁচু থেকে একবার হাত ফস্কে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। শহীদ কিন্তু অত কথা ভাবছে না। জানালার ফ্রেমের নিচের কাঠের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে ও। কালো রঙের বিশাল দেয়ালের পিঠ ওর মুখের সামনে। শূন্যের দিকে ওর পিঠ। কজার উপর পা দিয়ে ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে চাইছে ও। কামাল দুরু দুরু বুকে তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে মাথা বের করে। শহীদের পা দুটো দুহাত দিয়ে বেষ্টন করে আগলে রেখেছে ও, যাতে করে পা ফস্কে গেলেও নিচে পড়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারা যায়।

শহীদ আরও উপরে উঠে গেল। হাত দুটো পৌঁছে গেছে ওর ব্যাটলমেন্টের ফোকরগুলোয়। ধীরে ধীরে উঠছে ও। পায়ের উপর শরীরের ভার এখন নেই বললেই চলে। সম্পূর্ণ শরীরটা ঝুলে রয়েছে দেয়ালের গায়ে। কামাল জানালার উপর উঠে দাঁড়িয়ে শহীদের জুতোর নিচে হাত ঠেকিয়ে রেখেছে আলতোভাবে। কিন্তু কামাল এরপর আর নাগাল পেল না শহীদের পায়ের। শহীদের পা দুটো তখন ব্যাটলমেন্টের ফোকরগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে। ফোকরের মধ্যে পা ঢুকিয়ে উপরের দিকে উঠে চলেছে ও। ব্যাটলমেন্টের কিনারা ধরে ফেলল ও এবার। নিচু কণ্ঠ শোনা গেল ওর, 'আমি উঠে যাচ্ছি, কামাল। তুইও জানালার উপর দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে একটু একটু করে অতি সাবধানে উঠতে শুরু কর। তোর হাত দুটো ধরতে পারলেই টেনে তুলে নেব আমি তোকে।'

কামাল দেখল শহীদের শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রাচীরের উপর। বড় করে দম নিয়ে জানালার কজায় পা রেখে শহীদের অনুকরণে, উপর দিকে উঠতে শুরু করল কামাল। শহীদকে সাহায্য করার জন্যে কামাল নিচের দিকে ছিল। নিচের দিক থেকে সাহায্য পাওয়াটাই দরকার। কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

কামাল ধীরে ধীরে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু একটু পরই শহীদের গলা পাওয়া গেল, 'আমি অনেকটা নেমে এসেছি, কামাল। নে, আমার পা'টা ধর ভাল করে।'

কামাল হাঁপ ছাড়ল একটা। শহীদের ঝুলিয়ে দেয়া পা ধরে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই উপরে উঠে পড়ল দুজন।

ত্রিশমিনিট ধরে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর ব্যাটলমেন্টের উপর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিল শহীদ সেন্ট্রিদের মধ্যে কোনরকম উত্তেজনা দেখা যায় কি না। না, সেন্ট্রিরা ওদেরকে দেখেনি উপরে ওঠার সময়। হঠাৎ শহীদ হাতঘড়িটা কানের ওপর চেপে ধরল। কামালের উদ্দেশ্যে ও বলল, 'যে পিনটা

একজন সিক্রেট এজেন্টের বেল্টে গেঁথে দিয়েছিলাম সেটা থেকে সঙ্কেত পাচ্ছি।'

শহীদের হাতঘড়ির মাইক্রো-রিসিভার থেকে কির কির কির করে শব্দ হচ্ছে। সমতল ছাদময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করল শহীদ গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনতে শুনতে। ব্যাটেলমেন্টের ছাদের সুদূর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কামালের উদ্দেশ্যে বলল, 'শব্দের কমা-বাড়া অনুভব করে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি সেই এজেন্টটা ঠিক আমাদের নিচে রয়েছে।'

কামাল বলল, 'তারমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আসা এজেন্টদেরকে নিয়ে ই-আলী গোপন বৈঠকে বসেছে!'

শহীদ সন্তর্পণে গোলা চালাবার একটা ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে তাকাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা বের করে কামালের উদ্দেশ্যে বলল, 'ভাগ্যটা ভাল আমাদের। এত উঁচুতে বাইরের আক্রমণের কোনরকম আশঙ্কা নেই মনে করে রূমের একটা জানালার কবাট সামান্য একটু খুলে রেখেছে ওরা।'

শহীদ দ্রুত হাতে সরু নাইলনের সুতোয় ক্ষুদ্রাকৃতি বোতামের মত একটা মাইক্রো-মাইক্রোফোন বেঁধে ঝুলিয়ে দিল গোলা চালাবার ফোঁকর দিয়ে। সুতো ঢিল করতে করতে যন্ত্রটাকে জানালার কাছ বরাবর পাঠাল ও। জানালার কাছে গিয়ে সেটা ঝুলতে লাগল নিঃশব্দে। শহীদ হাতঘড়ির মাইক্রো-রিসিভারটা কানের কাছে ধরল। কামাল কান বাড়িয়ে সরে এল কাছে। ওরা দুজনেই মাইক্রো-রিসিভারের মাধ্যমে শুনতে পেলঃ...এবং পাকিস্তান সীমান্তের এই ম্যাপের এই এই পয়েন্টে আক্রমণের সূচনা করব আমরা জিরো প্লাস টু আওয়ারে। জিরো প্লাস সিক্স আওয়ারে আমি, মহা শক্তিশালী ই-আলী, স্বয়ং আক্রমণে অংশগ্রহণ করব। জিরো আওয়ার থেকে শুরু করে এক সপ্তাহের মধ্যে এ অঞ্চলের ভূখণ্ডে নতুন একটি দেশ জন্ম লাভ করবে। বদলে যাবে এই উপমহাদেশের মানচিত্র। এবং...।

বহুলোকের আনন্দ ধ্বনি শোনা গেল। তারপর আবার ই-আলীর কর্কশ এবং উদ্ধত কণ্ঠস্বর শুনল ওরা, '...এবং সেই নতুন স্বাধীন দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হব আমি। কিন্তু একটি দেশ স্বাধীন হলেই সেই স্বাধীনতা টিকে থাকে না, স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রয়োজন। বৃহৎ একটি বন্ধুরাষ্ট্র আমাদেরকে সমর্থন করবে। কিন্তু আপনারা বিভিন্ন দেশের সরকারী মহলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে কসুর করবেন না। স্বীকৃতি লাভ করার জন্যে নানারকম লোভ দেখিয়ে স্বীকৃতি এবং সমর্থন আদায় করতেই হবে আমাদেরকে। সে ব্যাপারে আলাপ করার জন্যেই আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। এবং যদি স্বাধীনতা লাভ করেও একাধিক দেশের সমর্থন আমরা না পাই এবং তার ফলে যদি আমাদেরকে অর্জিত স্বাধীনতা হারাতে হয় তাহলে সেইসব দেশের প্রতি কঠোর আঘাত হানব আমরা। আপনারা যেসব দেশে কাজ করছেন. বর্তমানে সে সব

দেশে দল গঠন সম্পূর্ণ করেছেন···।'

আবার শোনা গেল হর্ষধ্বনি। এরপর একজন সিক্রেট এজেন্ট বলে উঠল, 'মহামান্য ই-আলী, দুজন গুপ্তচর সম্পর্কে কি যেন শুনছি আমরা···?'

ই-আলীর উত্তর শুনতে পেল শহীদ ও কামাল, 'ফাঁদ পাতা হয়েছে তাদেরকে এখানে ধরে আনার জন্যে। ওদের একজনকে হাসপাতাল থেকে আমার হেডকোয়ার্টারে আনা হয়েছে। বাকি দুজন তাকে উদ্ধার করার জন্যে এই দুর্গেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। ধরা পড়বে, সন্দেহ নেই। ধরা পড়েলেই সব ক'টার গর্দান একসাথে নেয়া হবে।'

কথাগুলো বলে হাঃ হাঃ করে খানিকক্ষণ নিষ্ঠুরভাবে হাসল ই-আলী।

অকস্মাৎ শহীদের হাতঘড়ির মাইক্রো-রিসিভার থেকে হ্যাশ্‌শ্‌ ধরনের অদ্ভুত একটা শব্দ উঠল, অনেকটা বাতাসের মত। তারপর আর কোন কিছু শোনা গেল না। চমকে উঠল শহীদ। কামালের উদ্দেশ্যে ও বলল, ট্র্যান্সমীটিং মাইক্রোফোনটা দেখে ফেলেছে ওরা। ছিঁড়ে নিয়েছে ওটা কেউ।'

গোলা ছোঁড়ার ফোঁকর দিয়ে উঁকি মেরে ওরা দেখল নাইলনের সুতোটা ঝুলছে, আসল জিনসিটা নেই জানালার কাছে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। চোখে মুখে আশঙ্কা ফুটে উঠেছে ওর। দুর্গের নিচের দিক থেকে পাথরের ধাপ বিশিষ্ট একটা সিঁড়ি ছাদ পর্যন্ত উঠে এসেছে। সিঁড়ির দুধারে নিচু দেয়াল। ছাদের মধ্যবর্তী জায়গায় কয়েকটি প্রাচীন ছোট ছোট ধূম্রনালী, ওগুলোর মাঝখানে একটা বড় চিমনী। শহীদ রেনকোটটা খুলে বড় চিমনীর গায়ে ঝুলিয়ে দিল। সিঁড়ি বেয়ে কেউ উঠলে রেনকোটটার পিছন দিকটা দেখতে পাবে সে। এমন ভাবে রেনকোটটাকে ঝুলিয়ে দিল শহীদ, যাতে মনে হয় একজন মানুষ ওখানে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছে। কামালকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ির একদিকের নিচু দেয়ালের পাশে বসে পড়ল শহীদ। এমন সময় শোনা গেল দ্রুত পদশব্দ। সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে উঠে আসছে কয়েকজন লোক।

সশস্ত্র সেন্ট্রিরা উঠে এল ছাদের উপর। শহীদের বুদ্ধিটা সফল হতে দেখা গেল। চিমনির উপর লটকানো রেনকোটটার দিকে অনর্গল গুলি চালাতে চালাতে এগিয়ে গেল লোকগুলো।

এদিকে নিচু দেয়াল টপকে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে পড়ল শহীদ। কামাল ওকে অনুসরণ করল। ছাদের উপর তখনও চেঁচামেচি আর গুলির শব্দ হচ্ছে। চওড়া একটা প্যাসেজ ধরে ছুটছে ওরা। ওদের পদশব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে গুলির শব্দে। হঠাৎ কামালের হাত ধরে থমকে দাঁড়াল শহীদ। প্যাসেজের দিকে মুখ করে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, পাল্লা দুটো সামান্য একটু খোলা। পা টিপে টিপে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে তাকাল শহীদ। এক পলকের দৃষ্টিতেই শহীদ বুঝতে পারল শয়তান ই-আলীর হেড কোয়ার্টারের হৃদয়-কক্ষের ভিতরটা দেখছে ও।

রুমটার মাঝখানে বিরাট একটা ডেস্ক। ডেস্কের সর্বত্র যন্ত্রপাতি এবং অসংখ্য সুইচ। টেলিভিশন স্ক্রীন, মাইক্রোফোনও দেখা গেল, প্রায় আধ ডজন টেলিফোনও রয়েছে। রুমের এক কোনায় একটা জানালা। দুর্গের ছাদের উপর থেকে এই জানালার সামনেই মাইক্রো-ট্র্যান্সমিটারটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল শহীদ। জানালাটার সামনে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। ই-আলীর সিক্রেট এজেন্ট ওরা। এজেন্টদের মাঝখানে একজন বলিষ্ঠ, লম্বা, স্বাস্থ্যবান পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার বিশাল হাতের থাবায় কিছু একটা রয়েছে। শহীদ অনুমান করল জিনিসটা তাদেরই মাইক্রো-ট্র্যান্সমিটার।

হঠাৎ একটা ম্যাপ দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল শহীদ। রুমের দেয়ালে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। ম্যাপের বিভিন্ন জায়গায় লাল ফ্ল্যাগ আঁকা। কামালের কানের কাছে মুখ নামিয়ে শহীদ নিচু স্বরে বলল, 'ওই ওয়ার্ল্ড ম্যাপের লাল ফ্ল্যাগ দাগানো দেশগুলোয় শয়তান ই-আলীর এজেন্টরা দল করেছে বলে মনে হয়। যতদূর মনে হয় আমার, পাকিস্তানকে আক্রমণ করে যে ভূখণ্ড অধিকার করে একটা দেশের জন্ম দেবে বলে আশা করছে শয়তানটা সেই দেশকে যেসব দেশ স্বীকৃতি দেবে না সে সব দেশে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করবে এজেন্টদেরকে দিয়ে।'

কথাগুলো বলে শহীদ দ্রুত পকেট থেকে বের করল সিগারেট লাইটারের মত দেখতে ছোট্ট একটা ক্যামেরা। চোখের কাছে ক্যামেরাটা তুলেই বোতাম টিপে দিল ও।

অস্পষ্ট একটা শব্দ হল কি হল না, ই-আলী ঘাড় তুলে সোজাসুজি দরজার দিকে তাকাল। লাইটারক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলা হয়ে গেছে তখন শহীদের।

শহীদ দেখল ই-আলী অকস্মাৎ তার অনুচরদের মাঝখান থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পলকের মধ্যে কয়েকজন এজেন্টকে সরিয়ে দিয়ে ঝড়ের মত হুড়মুড় করে ডেস্কের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ই-আলী। ডেস্কের একটা সুইচের উপর প্রকাণ্ড হাতের থাবা দিয়ে চাপ দিল সে।

শহীদ ও কামাল ইতিমধ্যে চওড়া প্যাসেজ ধরে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছে।

দড়াম! দড়াম! দড়াম! দড়াম!

চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল ওরা। প্রতিটি দরজা জানালার পাল্লা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। প্যাসেজের দুই প্রান্তের দরজার পাল্লাও বন্ধ। তার উপর স্টীলের শাটার ফেলে দেয়া হয়েছে। কামাল আতঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা করে বলল, 'আমাদের পালাবার পথ চারদিক দিয়েই বন্ধ।'

কামাল মিথ্যে বলেনি। প্যাসেজের একটা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পাথরের দেয়াল নামিয়ে। দ্বিতীয় এবং শেষ মুখটা বন্ধ করা হয়েছে স্টীলের শাটার ফেলে। দরজাগুলোও ওইভাবে বন্ধ।

শহীদ কেঁপে উঠল। চমকে উঠে একই সময় কামাল আতঙ্কে চিৎকার করে

উঠল। পৃথিবীটা নড়ছে যেন!

'শহীদ, দেখ!'

মেঝের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল কামাল। শহীদ দেখল ওরা যে পাথরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে সেটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে দেয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পাথরের মেঝেটা। প্যাসেজের মেঝে পাথরের দেয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার ফলে বিপরীত দিকে গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে একটা। ক্রমশই বড় হচ্ছে সেই অন্ধকার, তলহীন গহ্বর। শহীদ বুঝতে পারল এই গভীর গহ্বরের নিচে শয়তান ই-আলীর দুর্গের বন্দীশালা অবস্থিত। বলা যায় না, গহ্বরটা মৃত্যুগুহাও হতে পারে। হয়ত বাঘ, সিংহ, কেউটে সাপ ইত্যাদি আছে গহ্বরের নিচে।

আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই প্যাসেজের সম্পূর্ণ মেঝেটা ক্রমশ মিলিয়ে যাবে পাথরের দেয়ালের আড়ালে। গাঢ় কালো রঙের মৃত্যু-গহ্বর গ্রাস করবে ওদের দুজনকে।

চার

'জলদি, কামাল! একদিকের দেয়ালের গায়ে পা দুটো তুলে আটকে নে, কোমর থেকে ওপরের অংশটা অন্য দিকের দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে সেঁটে থাক!'

শহীদ ইতিমধ্যেই অদৃশ্যমান অবশিষ্টাংশ মেঝে থেকে পা দুটো তুলে একদিকের দেয়ালের গায়ে স্থাপন করেছে, শরীরটা সেঁটে রয়েছে ওর বিপরীত দিকের দেয়ালে। পাথরের মেঝেটা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে কামাল শহীদের অনুকরণে দুই দেয়ালের মাঝখানে নিজের শরীরটা স্থাপন করে ব্রিজের মত হয়ে হাঁপাতে লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকাল। অন্ধকার গহ্বরটা হাঁ করে রয়েছে ওদেরকে গিলে ফেলবার অপেক্ষায়। তল দেখতে পেল না কামাল। শহীদের উদ্দেশে চাপা কণ্ঠে বলল ও, 'বেশিক্ষণ এমন কষ্টকর অবস্থায় টিকতে পারব না, শহীদ!'

শহীদ আচমকা মুখ হাঁ করে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার করে উঠল একটা। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম আতঙ্কভরা সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার ক্রমশ নিস্তব্ধতায় মিলিয়ে গেল। যেন কোন মানুষ শূন্য হতে নিচের দিকে পড়ে যেতে যেতে শেষ আর্তচিৎকার করে উঠল।

আশঙ্কায় জর্জরিত হতে হতে শহীদ অপেক্ষা করে রইল। তার চালাকি কি সফল হবে? শয়তান ই-আলী কি ওই আর্তচিৎকার শুনে বিশ্বাস করবে যে গহ্বরের ভিতর পড়ে গেছে তার শত্রু?

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শহীদ ও কামালের মুখ। পাথরের মেঝে আবার

সরে আসছে দ্রুত দেয়ালের আড়াল থেকে। গহ্বরটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

মেঝেতে পা রাখল ওরা। মাংসপেশীগুলো কাঁপছে থরথর করে। বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করল ওরা। শহীদ পা ঝাড়া দিল। স্টীলের শাটারগুলো উঠে যাচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে ই-আলী দরজা খুলে প্যাসেজে হাজির হতে পারে সদলবলে। কামালকে ইশারা করে প্যাসেজ ধরে দৌড়ুতে শুরু করল শহীদ। ওদের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে ছাদের উপর থেকে সশস্ত্র সেন্ট্রিরা। রেইনকোটে গুলিবিদ্ধ করে বোকা বনে মাথায় রক্ত চেপে গেছে ওদের।

প্যাসেজের দেয়ালে ইলেকট্রিসিটির তার দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। প্যাসেজটা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত। কোমর থেকে দাঁতযুক্ত একটা কাটার বের করে মুহূর্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক তারগুলো কেটে দিল শহীদ। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল প্যাসেজটা। আবার দৌড়ুতে শরু করল ও। কামাল ওর কাছে কাছেই রয়েছে।

প্যাসেজটা যেন সীমাহীন। বহুক্ষণ দৌড়ুবার পর অবশেষে একটা দরজা দেখা গেল বাইরের দিকের দেয়ালের গায়ে। শহীদ হাতল ঘুরিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে সবেগে প্রবেশ করল রুমের ভিতর। ছোট এবং গোলাকার রুম এটা। রুমটার চতুর্দিকে জানালা। একটা জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে শহীদ বলল, 'এটা একটা কার্টন টাওয়ার। কামাল, নিচে দেখ!'

কার্টন টাওয়ারটা দুর্গের এক প্রান্তের প্রাচীরের গা ঘেঁষে অবস্থিত। কামাল নিচের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। ছোট, ঘেরা একটা উঠনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্স। এই অ্যাম্বুলেন্সে করেই সরফরাজ খানকে দুর্গে নিয়ে আসা হয়েছে, কামাল পরিষ্কার বুঝতে পারল। শহীদ দ্রুত অনুমান করল, ত্রিশ ফুটের মত নিচে উঠনটা ওদের কাছে থেকে।

হঠাৎ জানালা থেকে মাথা বের করে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে ওর। প্যাসেজ ধরে কয়েকজন লোকের দ্রুত পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল না তারা। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল পদশব্দ। শহীদ ফিসফিস করে বলে উঠল, 'ই-আলীর গার্ডরা পাতালপুরীর বন্দীশালায় নামার জন্যে ছুটে গেল বোধহয়। শয়তানরা ধরে নিয়েছে লাশ পাওয়া যাবে ওখানে আমাদের! ই-আলী নিশ্চয় আমার ক্যামেরাটা হাতে পেতে চায়।'

কামাল কপালের ঘাম আঙুল দিয়ে একপাশে সরাতে সরাতে বলল, 'কিন্তু আমাদের লাশ না পেয়ে কুকুরের মত হিংস্র হয়ে উঠবে ওরা এবার। এরপর নিশ্চয় গোটা দুর্গটাকে চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতেও কসুর করবে না আমাদের খোঁজে।'

'সুতরাং এই টাওয়ারে লুকিয়ে থাকতে পারি না আমরা, অথচ বেরিয়ে যাবারও উপায় নেই। উপায় শুধু করা যায়…।'

কথা অসমাপ্ত রেখে শহীদ দরজা খুলে সন্তর্পণে উঁকি মারল প্যাসেজে। কেউ

নেই দেখল ও। বেরিয়ে এল প্যাসেজে। বৈদ্যুতিক তারটা যেখানে ছিঁড়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াল ও। তারের ছেঁড়া শেষাংশের একদিকটা ধরে ঝুলে পড়ল সে। পিনগুলো বাটাম থেকে উঠে আসার ফলে মোটা তারটা অনেকটা খুলে গেল। আন্দাজ মত তার হস্তগত হতে শহীদ অতি সাবধানে কাটল অপর প্রান্তটা। তার নিয়ে ফিরে এল কার্টন টাওয়ারে। জানালা দিয়ে লম্বা এবং মোটা তারটা নিচে নামিয়ে দিল ও। জানালার পানি গলবার ফোকরের সঙ্গে তারটা বাঁধল মজবুত করে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে কামাল দেখল তারের শেষাংশ কাঁকর বিছানো উঠনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে প্রায়। শহীদ নির্দেশ দিল, 'নামতে শুরু কর কামাল। হাত ঢিল করবি না, পিছলে যাবে তাহলে। এক হাত এক হাত করে নামবি।'

কামাল নামতে শুরু করল মোটা তার বেয়ে। শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ওর নামা। কামাল নিচে পৌঁছে যেতেই শহীদ নামতে শুরু করল। দ্রুত নেমে এল ও প্রাচীর ঘেরা কাঁকরময় ক্ষুদ্র উঠনে। অ্যাম্বুলেন্সের কাছে গিয়ে ওরা দেখল সেটা খালি। তারমানে সরফরাজ খানকে দুর্গের কোন স্থানে বন্দী করে রাখা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে। শহীদ ভাবল সরফরাজ যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ আশা করা যেতে পারে তার কাছ থেকে শয়তান ই-আলীর সাংঘাতিক প্ল্যানের বিশদ বিবরণ পাবার। শয়তান ই-আলী জিরো আওয়ারে আক্রমণ চালাবে পাকিস্তানের উপর। কিন্তু তার আক্রমণের ধাঁচ কি রকম হবে তা জানা যায়নি। হয়ত সরফরাজ সে কথা জানে। সরফরাজকে মুক্ত করে সময় মত তিনজন পালাতে না পারলে মিশনটা ওদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পালানো সম্ভব হলেই কেবল ই-আলীর ষড়যন্ত্রকে বানচাল করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এবং ই-আলীর ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে না পারলে শুধু পাকিস্তানই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিপদের সম্মুখীন হবে।

উঠনের একদিকের দেয়ালে একটা দরজা। দরজা পরীক্ষা করে শহীদ দেখল ভিতর থেকে বন্ধ ওটা। কামালকে ইঙ্গিত করতেই কামাল তৈরি হয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে দুজনে ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারল দরজার গায়ে। ভিতরের খিল ভেঙে খুলে গেল পাল্লা দুটো। হুড়মুড় করে রুমের ভিতর ঢুকে দরজাটা ভিজিয়ে শিকল তুলে দিল শহীদ। কামাল বলল, 'দুর্গের কিচেন রুম এটা।'

শহীদ হাত বাড়িয়ে অপরদিকের একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'দরজাটা খুলে দেখা যাক, পাতালের দিকে নামার রাস্তা পাওয়া যায় কি না। পাতালপুরীর বন্দীশালায় সরফরাজকে বন্দী করে রাখতে পারে ওরা। খোঁজ করে দেখতে হবে।'

পা টিপে টিপে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দুজন। ধীরে ধীরে শহীদ দরজাটা খুলল। দরজার পাশেই দুটো রাবারের ডাস্টবিন। দুটোই আনাজের খোসায় ভর্তি। হঠাৎ নিচের দিক থেকে চিৎকার ভেসে এল একজন মানুষের, 'গুপ্তচর দুজন বন্দীশালায় নেই। পাতালপুরীর কারাগার তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি আমরা—নেই!

কুকুর দুটো মহামান্য ই-আলীর ফাঁদ এড়িয়ে গেছে! মহামান্য ই-আলীকে সাবধান করে দাও!'

পরমুহূর্তে ইন্টারন্যাল টেলিফোনে চিৎকার করে খবর পাঠানো হচ্ছে ই-আলীর কাছে, শুনতে পেল ওরা। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। কিচেন রুমের ছাদের দিকে তাকিয়ে ও দেখল একটা লাউডস্পীকার। লাউডস্পীকার থেকে গর্জে উঠল শক্তিশালী একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'ই-আলী সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কথা বলছে।'

'নার্ভ-কন্ট্রোলের সুইচ অন কর! আমি আবার বলছি, নার্ভ-কন্ট্রোলের সুইচ অন কর! প্রস্তুত হও কাউন্টডাউনের জন্যে। শুরু হচ্ছে। টেন—নাইন—এইট—।'

অবশেষে শোনা গেল, 'টু—ওয়ান—জিরো!'

কামাল একটা আর্তচিৎকার বহু কষ্টে দমন করল। ওর চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে শহীদের দিকে চেয়ে রয়েছে। কাঁপছে ও। শহীদের পা থেকে মাথা অবধি ভয়ঙ্কর ভাবে থরথর করে কাঁপছে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে শরীরের কাঁপুনি। কামালের কষ্ট হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ করতে। গলা বুজে আসছে ওর। ওর মাথাটা এত জোরে জোরে কাঁপছে যে চোখ দুটো শহীদের দিকে ধরে রাখতে পারছে না কোনমতে।

শহীদ অসহায়ভাবে চেষ্টা করছে কাঁপুনির হাত থেকে মুক্ত হতে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছে ওর। টলতে টলতে রাবারের দুটো ডাস্টবিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাঁপা হাতে উল্টে দিল দুটো ডাস্টবিনই। আনাজের খোসাগুলো পড়ে গেল পাথরের মেঝেতে। বহুকষ্টে কামালের কাছে নিয়ে গেল শহীদ রাবারের একটা ডাস্টবিন। প্রায় অচেতন কামালের দেহটা ডাস্টবিনটার ভিতর ঢুকিয়ে দিল ও।

শহীদ স্বয়ং অচেতন হয়ে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। চোখের দৃষ্টি স্থির রাখতে পারছে না। শূন্য লাংসে বাতাস ভরে নিতেও যেন অক্ষম হয়ে পড়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট শক্তিটুকু নিংড়ে কাজে লাগাল ও। হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতে রাবারের ডাস্টবিনের কাছে সরে এল ও। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। ডাস্টবিনটা টেনে মাথাটা তুলে ধীরে ধীরে শরীরটাও ঢোকাতে শুরু করল ও।

রাবারের ডাস্টবিন দুটো ছিল বলে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হল ওদের। শয়তান ই-আলীর নার্ভ-মেশিনের ভয়ঙ্কর প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পাবার আর কোন পথ ছিল না। ই-আলীর অনুচররা অ্যান্টি-নার্ভ ভাইব্রেটরের সুইচ অন করে সাবধান হয়েছে আগেই নিশ্চয়, শহীদ ভাবল।

মিনিট খানেক পর ধীরে ধীরে রাবারের ডাস্টবিনের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল শহীদ। কোন অসুবিধে বোধ করল না ও নতুন করে। কামালকে ডাস্টবিন মুক্ত করে ও বলল, 'শয়তানটা অফ করে দিয়েছে নার্ভ-মেশিন। ভেবেছে, নিশ্চয় যা ফল ফলবার যথাযথ ফলেছে। ওর আবিষ্কৃত যন্ত্র আমাদেরকে ভাইব্রেট

করে মেরে ফেলেছে বলে নিশ্চিত ধারণা না হয়ে থাকলে এখনও মেশিন চালু থাকত। সত্যিসত্যি কয়েক মুহূর্তের বেশি কেউ টিকে থাকতে পারে না এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

কিচেন রুমের দরজা ত্যাগ করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল ওরা। কিছুদূর যেতেই পাওয়া গেল পাথরের ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি। পাতালপুরীর কারাগারের দিকে নেমে গেছে সিঁড়িটা। নিচে নেমে এল ওরা। তারপরই থমকে দাঁড়াল। অদূরবর্তী কোন লাউডস্পীকার থেকে শোনা গেল ই-আলীর কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'দুজন গুপ্তচর এখন মৃত। ওদের লাশ খুঁজে বের কর। একজনের কাছে মাইক্রো-ক্যামেরা আছে, সিগারেট লাইটারের মত দেখতে সেটা। উদ্ধার করে নিয়ে এস। এটা জরুরি আদেশ।'

আবার দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল ওরা। শহীদ অনুসন্ধানী চোখে দেখছিল বৈদ্যুতিক তার কোন্ কোন্ দেয়ালের উপর দিয়ে কোন্ কোন্ দিকে গেছে। সরফরাজ খানকে যদি কোন কারাগার কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়, তাহলে সে কক্ষে আলো থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ওর। 'কী হোল' দিয়ে শত্রুরা যাতে সরফরাজের প্রতিমুহূর্তের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে সেজন্যে কারাগার কক্ষ আলোকিত না করে উপায় নেই। দুপাশের রুমগুলোয় আলো জ্বলছে না। প্যাসেজটা আরও অসংখ্য প্যাসেজের সন্ধান দিচ্ছে। অন্ধকার প্যাসেজগুলোর দিকে মনোযোগ দিল না শহীদ। যে প্যাসেজগুলোর দেয়ালে বৈদ্যুতিক তার দেখা যাচ্ছে। সেগুলো ধরে এগোতে লাগল ও। আলোকিত প্যাসেজের দুধারে কারা-কক্ষ। দরজাগুলো খোলা কোন কোনটার। ভিতর থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। কত নিরীহ বন্দী এইসব কারা-কক্ষে প্রাণ দিয়েছে কে জানে! শহীদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বন্ধ দরজার পাশে থাক থাক কাঠের বাক্স দেখছে ও। বন্ধ রুমটার ভিতর যে মোটা বৈদ্যুতিক তার প্রবেশ করেছে সেগুলো পাওয়ার-কেবল। কামালের উদ্দেশ্যে ও চাপা কণ্ঠে বলল, 'রুমটার ভিতর বিশেষ কোন ব্যাপার আছে। পাওয়ার-কেবল কেন তা না হলে?'

কোন শব্দ না করে সন্তর্পণে দরজার হাতলটা ঘোরাল শহীদ। আশ্চর্য হয়ে কামাল দেখল দরজাটা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা দুটো।

শক্ত হয়ে উঠল ওদের শরীর।

রুমের মাঝখানে দুটো লোহার বেডের একটিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়েছে একজন লোককে।

চমকে উঠল শহীদ।

লোকটাকে চিনতে পেরে উত্তেজিত হয়ে পড়ল ও। লোকটা সরফরাজ খান ব্যতীত আর কেউ নয়। সরফরাজ খানের উপর ঝুঁকে পড়ছে মেডিক্যাল মাস্ক পরা দুজন লোক। ওরা সম্ভবত ডাক্তার। একজনের হাতে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ।

সরফরাজকে ইঞ্জেকশন দিয়েছে সে সবেমাত্র। সে দ্বিতীয়জনের উদ্দেশ্যে বলল, 'এই যে, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে গুপ্তচরটা। পেটের কথা সব খোলসা করে বলবে এবার ও। এখনও খুব দুর্বল বটে, কিন্তু এই 'সাচ্চা দাওয়াই'য়ের বদলৌতে কথা বলতে বাধ্য হবে ব্যাটা। মহামান্য ই-আলীর আশঙ্কা, এ ব্যাটা তাঁর প্ল্যানের কথা, জিরো আওয়ারের কথা সব জানে।

কামাল রাগ সামলাতে না পেরে খোলা দরজা পথে পা বাড়িয়ে দিল। শহীদ ওকে বাধা দেবার আগেই ও লাফ দিল দরজার কাছ থেকে সিরিঞ্জ ধরা মাস্ক পরিহিত ডাক্তারকে লক্ষ্য করে। লাফ দেবার ভঙ্গিতেই অত্যাশ্চর্য ভাবে স্থির হয়ে গেল কামাল। পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেল সে এক সেকেণ্ডেরও অল্প সময়ের মধ্যে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, দ্বিতীয় পা টা দৌড়ুবার ভঙ্গিতে উপরে ওঠান, দুটো পা-ই অনড় হয়ে গেছে। চোখের পাতাও নড়ছে না ওর। সম্পূর্ণ নিঃসাড় হয়ে গেছে কামাল। কেউ যেন ওর দেহ থেকে প্রাণ কেড়ে নিয়ে পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তিতে পরিণত করেছে ওকে জাদুবলে।

শহীদ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে ডোর পোস্টের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত শক্তিশালী কোন র‍্যাডিয়েশন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কামাল।

'দুজন গুপ্তচরের একজন ফাঁদে পড়েছে! গার্জিয়ান রে কাবু করে ফেলেছে একজন গুপ্তচরকে!'

একজন মাস্ক পরিহিত ডাক্তার ঘাড় ফিরিয়ে কামালকে দেখেই চিৎকার করে উঠল। শহীদ সরে এসেছে দরজার আড়ালে। দ্বিতীয় ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এই গুপ্তচরই হয়ত ছবি তুলেছে মহামান্য ই-আলীর অপারেশন রুমের। ক্যামেরাটা হয়ত এর কাছেই আছে। কোন না কোনভাবে মহামান্য ই-আলীর নার্ভ-বিধ্বংসী ভাইব্রেটর ব্যর্থ করে দিয়ে বেঁচে আছে এতক্ষণ লোকটা।'

শহীদ শুনতে পেল একটা সুইচ অফ করবার শব্দ। দরজার পাল্লার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ও দেখল কামালকে ধরে রুমের ভিতর নিয়ে গেল ডাক্তার দুজন।

দরজার কজার নিচের ফাঁক দিয়ে রুমের ভিতর তাকাল শহীদ। দেখল একজন ডাক্তার পিস্তল হাতে নিয়ে গার্ড দিচ্ছে কামালকে। এবং সরফরাজের পাশের লোহার বেডে কামালকে শুইয়ে দিয়ে হাত-পা বাঁধছে দ্বিতীয়জন। এরপর দ্রুত হাতে কামালকে সার্চ করা হল। একমুহূর্ত পর দ্বিতীয় ডাক্তারটি পিছিয়ে এসে ইন্টারকম রিসিভার তুলে উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'মহামন্য ই-আলী! আমরা দুজন গুপ্তচরের একজনকে বন্দী করে ফেলেছি। আপনার ভাইব্রেটর মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছে লোকটা। অন্যজনও সম্ভবত মৃত্যুবরণ করেনি। হুকুম করুন, মহামান্য ই-আলী।'

শয়তান ই-আলীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল কোন লাউডস্পীকার হতে, 'মাস্ক পরে নাও! আমি আবার বলছি—সবাই মাস্ক পরে নাও! এখুনি! তৈরি হও! এইবার সে

মৃত্যুবরণ করবেই করবে। Vapour controls খুলে দেয়া হচ্ছে সবগুলো Vapour on—now!'

কাছাকাছি কোথাও থেকে মৃদু হিস হিস শব্দ উঠল। শহীদ অস্বস্তিভরে প্যাসেজের উপর-নিচে তাকাল। কোথাও কিছু দেখা গেল না, হিস হিস ধ্বনি ক্রমশ জোরাল এবং উচ্চকিত হয়ে উঠছে। ভয়ঙ্কর কাশি পাচ্ছে ওর। কিন্তু সামলে রাখছে ও প্রাণপণ প্রয়াসে। এতটুকু শব্দ হলে ধরা পড়তে হবে নির্ঘাৎ। চোখ দুটো ওর ভীষণভাবে জ্বালা করতে শুরু করল। গলা ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। শ্বাস নিতে পারছে না। অসহ্য কষ্টে হাঁপিয়ে উঠেছে ও। বিপদের রূপটা বুঝতে বাকি রইল না শহীদের। শয়তান ই-আলী তাকে হত্যা করার জন্যে অদৃশ্য গ্যাস ছেড়েছে।

শহীদ বুঝতে পারল ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছে ও। এবং মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। অক্সিজেন মাস্ক ছাড়া শয়তান ই-আলীর ভেপারের আক্রমণ থেকে প্রাণ রক্ষা করা এক কথায় অসম্ভব।

ভেপার!

শব্দটা বারবার স্মরণ করল ও অচেতন হয়ে পড়তে পড়তে। চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ভেপার—বাতাসের চেয়েও হালকা—ভেপার—গ্যাস—চারদিক ভেসে যাচ্ছে—ভেপার—উপরে—বাতাসের চেয়েও—ভেপার!

মেঝের উপর নেতিয়ে পড়ে গেল শহীদ। দেহের সর্বশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ইচ্ছাশক্তি কাটিয়ে সচেতন থাকার চেষ্টা করছে ও। শরীরটাকে নাড়াতে নাড়াতে মুখটা ঘষছে ও ঠাণ্ডা মেঝেতে। আচমকা এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল ওর শূন্য লাংসে, দেহের নষ্ট শক্তি ফিরে এল খানিকটা।

ইচ্ছাশক্তি খাটাবার ফলে প্রাণ রক্ষা পেল শহীদের এ যাত্রা। পাথরের মেঝের নিচে প্রবাহিত হচ্ছে ময়লা পানির ড্রেন। শহীদ মুখ ঘষছিল ড্রেনের ঢাকনির উপর, ফলে ঢাকনিটা সরে যেতে বাতাস ঢুকতে পেরেছে।

খানিকক্ষণ পর শহীদ বুঝতে পারল ভেপার প্রয়োগ বন্ধ হয়েছে এতক্ষণে। মেঝের উপর হামাগুড়ি দিতে দিতে খোলা দরজাটার কাছে গিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। উঁকি মেরে তাকাল রুমের ভিতর। তারপর ডোর-পোস্টে একটা আঙুল দ্রুততার সঙ্গে স্পর্শ করে দেখল, কিছুই ঘটল না। তারমানে উত্তেজিত অবস্থায় গার্জিয়ান রে-র সুইচ অন করতে ভুলে গেছে ডাক্তার দুজন। শহীদ দেখল একজন ডাক্তারের হাতে নতুন একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। সরফরাজ খানের উপর ঝুঁকে পড়েছে সে। ইঞ্জেকশন দিতে উদ্যত। শহীদ উরুর কাছ থেকে একটা নাইলনের কেস বের করল। কেসের ভিতর থেকে ছোট একটা গ্লাস বল বের করে রুমের একদিকের দেয়ালের ফিউজ বক্সের দিকে অব্যর্থভাবে ছুঁড়ে মারল সেটা। গ্লাস বল ফিউজ বক্সে গিয়ে লাগতে লাল আগুনের শিখা দেখা দিয়েই ফেটে গেল সেটা।

দুজন ডাক্তারই চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল একজন, 'ফিউজ

বক্স সর্ট সার্কিট করেছে। সুইচ অফ করে দাও, তা না হলে আগুন ধরে যাবে।'

ফিউজ বক্সের দিকে ছুটে গেল দুজনাই। শহীদ এই ফাঁকে রুমের ভিতর ঢুকে কামালের বেডের নিচে আত্মগোপন করল। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি বের করল ও। হাত দুটো বেডের উপর তুলে দিয়ে কামালের হাত-পায়ের বাঁধন কাটতে মিনিটখানেক সময় লাগল ওর। ফিস ফিস করে বলে উঠল ও, 'কামাল, তুই মুক্ত।'

ডাক্তার দুজন ফিরে এল সরফরাজ খানের বেডের কাছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কামাল বেডের উপর থেকে লাফ মেরে পড়ল একজনের ঘাড়ে। শহীদও কালবিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্বিতীয়জনের উপর। কি হতে কি হল, কিছুই বুঝে উঠতে পারল না ডাক্তার দুজন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শহীদ ও কামালের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারাল তারা। শহীদ সরফরাজকে মুক্ত করল পরক্ষণেই তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে। ঠিক এমন সময় বাইরের প্যাসেজে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল।

শহীদ চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। রুমের ওপাশের দেয়ালের গায়ে কাঠের ফ্রেমের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ছুটে গেল শহীদ। দরজাটা খুলে ফেলল ও। পাল্লা দুটো সরে যেতেই প্রশস্ত, অব্যবহৃত কাবার্ড, অর্থাৎ একটা দেয়াল-আলমারি দেখা গেল। শহীদ কামালকে বলল, 'সরফরাজকে এর ভিতরে তুলে দে, জলদি!'

কামাল সরফরাজকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এসে কাবার্ডের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। কাবার্ডের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অচেতন ডাক্তার দুজনের কাছে ফিরে এল ওরা। শহীদ বলল, 'আমি যা করি তাই কর, কামাল!'

কথাটা বলেই শহীদ একজন ডাক্তারের মেডিক্যাল মাস্কটা খুলে নিজে পরে নিল। সাদা অ্যাপ্রনটাও খুলে নিয়ে পরল শহীদ। কামাল অনুকরণ করল শহীদকে দ্বিতীয়জনের মাস্ক এবং অ্যাপ্রন পরে নিয়ে। এরপর দুটো অক্সিজেন মাস্ক দেয়াল থেকে নামিয়ে ডাক্তার দুজনের মুখে লাগিয়ে দিল দ্রুত হাতে। নিজেদের পোশাকগুলো অচেতন লোক দুজনার গায়ে পরানর সময় নেই। লোহার বেডের উপর তুলে দিল শহীদ দুজনকেই। তারপর দরজার দিকে মুখ করে তাকাল। পরক্ষণেই রুমের ভিতর ঢুকতে দেখা গেল ই-আলীকে।

ই-আলী দুইজন সেন্ট্রিকে সঙ্গে নিয়ে রুমের ভিতর ঢুকল। উভয়ের হাতেই একটা করে সাব-মেশিনগান।

ই-আলী এসে দাঁড়াল দুই লোহার বেডের মাঝখানে। দুজন অচেতন লোকের মাস্ক পরিহিত মুখের দিকে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল সে। শহীদ ও কামাল মেডিক্যাল মাস্কের আড়াল থেকে তাকে দেখতে লাগল সতর্ক এবং উত্তেজিতভাবে। ওদের মনে প্রশ্ন—ই-আলী কি করবে এখন?

ই-আলী অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সরাসরি তাকাল শহীদের দিকে। মাস্ক পরার ফলে চোখ দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না ওর আর কামালের। ই-আলী

শহীদের দিকে তাকিয়ে আছে নিমেষহীন দৃষ্টিতে, সে যেন মাস্কের আড়ালে শহীদের মুখের ভাব অনুমান করার চেষ্টা করছে।

' "সাচ্চা দাওয়াই" কি কথা বলিয়েছে ওকে?'

প্রথম বেডের অচেতন দেহটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানতে চাইল ই-আলী কঠিন কণ্ঠে। হার্টবিট দ্রুততর হয়ে উঠল শহীদের। সে কি উত্তর দেবে ই-আলীর প্রশ্নের? উর্দু ও বলতে পারে স্থানীয় অধিবাসীদের মতই, কিন্তু তার গলার স্বর কি অচেনা হিসেবে ধরা পড়ে যাবে? ডাক্তারের গলার স্বরের সাথে ই-আলী অতি পরিচিত হলে ধরা পড়বার আশঙ্কা ষোলো আনা। কিন্তু ইতস্তত করার সময় নেই। উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে দেখে সেন্ট্রিদের চোখে মুখে ফুটে উঠছে সন্দেহ। শহীদ মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে গলা বিকৃত করে উত্তর দিল, 'সাচ্চা দাওয়াই কথা বলায়নি, মাহমান্য ই-আলী। কারণ লোকটা আপনার সিক্রেট প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই জানে না।'

শহীদ দেখল শয়তান ই-আলীর সারা মুখে ফুটে উঠল সন্তুষ্টির ছাপ। কিন্তু পরক্ষণেই হিংস্র কণ্ঠে গর্জন করে বলে উঠল সে, 'এখনও একজন হারামী গুপ্তচর বন্দী হয়নি। আমার ভেপার গ্যাস নিশ্চয় বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে তার! তার লাশ এবং তার সিক্রেট ক্যামেরা অবশ্যই পাওয়া যাবে। সুতরাং—এক্ষেত্রে আমার সিক্রেট প্ল্যান সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কথাগুলো বলে বেডের উপর দুটি দেহের দিকে হিংস্র চোখে তাকাল ই-আলী। তারপরই কর্কশ কণ্ঠে জানাল, 'আমি চাই, এই দুজন শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচরকে হত্যা করা হোক।'

ই-আলী কথা শেষ করে রুমের এদিক ওদিক তাকাল। হাই-ভল্টেজ ইনসিনারেটরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তার। নিষ্ঠুর, শয়তানী ভাব খেলে গেল তার সারা মুখে। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল ভয়ানকভাবে, উঁচু গলায় আদেশ করল সে, 'তোমরা দুই ডাক্তার মিলে দুজন গুপ্তচরকে ইনসিনারেটরে ঢুকিয়ে দাও এবং ধ্বংস কর নিঃশেষে। পুড়িয়ে ছাই করে দাও। এখুনি। আমি নিজের চোখে ওদের পোড়া ছাই দেখব।'

কথাগুলো হিংস্র কণ্ঠে বলে পিছিয়ে এল শয়তান ই-আলী; যেন পথ করে দিল শহীদ ও কামালকে ওরা যাতে অচেতন লোক দুজনকে হাই-ভল্টেজ কারেন্টের সুইচ অন করে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

ই-আলীর পিছনে সশস্ত্র সেন্ট্রিরা শয়তানের হাসি হাসছে। শহীদ ও কামাল যদি ই-আলীর আদেশ অমান্য করে বা পালন করতে দেরি করে তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে তারা।

পাঁচ

দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং বিমূঢ়তার ফলে যথেষ্ট দেরি করে ফেলেছে শহীদ। ই-আলীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে। আর ইতস্তত করা চলে না। যা হবার হবে মনে করে শহীদ মুখ খুলল, বলল, 'কন্ট্রোলস্ চেক করে নিই, মহামান্য ই-আলী।'

কাবার্ডের দিকে এগিয়ে গেল শহীদ ধীরে ধীরে। কাবার্ডের দরজা খুলে দ্রুত ভঙ্গিতে কন্ট্রোল প্যানেল চেক করার নাম করে সরফরাজকে সতর্ক করে দেয়াই শহীদের উদ্দেশ্য।

দরজা খুলে ভিতরে তাকাল শহীদ। পরমুহূর্তে একটা বিস্ময় ধ্বনি গলা চিরে বের হয়ে আসতে চাইল ওর। কাবার্ডের ভিতর সরফরাজ খান নেই।

কোনরকমে মনের বিস্ময় বোধটা চেপে রাখল শহীদ। কন্ট্রোল প্যানেলে কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করে ফিরে এল ও কামালের পাশে। আচমকা ই-আলী তার বিশাল দেহটা টান টান করে কঠিন কণ্ঠে বলল, 'সময় নষ্ট করছ তোমরা। এক মিনিট সময় দিচ্ছি আমি। দুজন গুপ্তচরকে ইনসিনারেটরে ঢুকিয়ে এখুনি হত্যা কর—তা না হলে গুলি করব তোমাদেরকে।'

শহীদ মেডিক্যাল মাস্কের আড়াল থেকে বলে উঠল কামালের উদ্দেশ্যে, 'বেড দুটো ইনসিনারেটরের কাছে নিয়ে এস।'

ইনসিনারেটরের পাশে বেড দুটোকে নিয়ে আসা হল। শহীদ পলকের মধ্যে একবার দেখে নিল ওখান থেকে কাবার্ডের দূরত্বটা। কুঁতকুঁতে চোখে ই-আলী ওর প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। কামাল শহীদের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ই-আলী সন্দেহ করতে শুরু করেছে কিছু একটা।'

কামাল ভুল বলেনি। বেড দুটোয় শায়িত অক্সিজেন মাস্ক পরা অচেতন দেহ দুটোর দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল সে। তারপর আরও কাছ থেকে কিছু পরীক্ষা করার জন্যে পা বাড়াল সেদিকে। পরবর্তী মুহূর্তে সে বেড দুটোর কাছে পৌঁছে যাবে। এবং অচেতন যে-কোন একজন লোকের অক্সিজেন মাস্ক উঠিয়ে দেখলেই সব প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

শহীদ আর সময় নষ্ট করল না। আগেই তার কাটার যন্ত্রটা হাতে নিয়ে রেখেছিল ও। আচমকা বিদ্যুৎবেগে পাওয়ার লাইনের মোটা তারের উপর সেটা বসিয়ে চাপ দিল। কেটে গেল তার। আলগা তারটা হাতে নিয়েই ইনসিনারেটরের স্টীলের দেহে ঘষে দিল সেটা। মাত্র দুই সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। আগুনের শিখা দেখা দিয়েই নিভে গেল—বাতিল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ফিউজ। অন্ধকার হয়ে গেল রুমটা।

শহীদ চাকাওয়ালা একটা বেডকে ধাক্কা মেরে পাঠিয়ে দিল ই-আলী যেদিকে

দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে, দ্বিতীয়টিকে গড়িয়ে দিল ও সবেগে সেন্ট্রিদের দিকে। সংঘর্ষ চিৎকার, গোঙানীতে ভরে উঠল রুমের অন্ধকার পরিবেশ।

কামালের একটা হাত শক্ত করে ধরে শহীদ কাবার্ডের কাছে এসে দাঁড়াল। কামালকে কাবার্ডের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকল সময় নষ্ট না করে। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল ও দেয়াল-আলমারির দরজা। তারপর কামালের উদ্দেশ্যে উত্তেজিত গলায় বলল, 'এর ভিতর থেকে বের হবার গোপন পথ নিশ্চয় একটা আছে কোথাও, তা না হলে সরফরাজ অদৃশ্য হয়ে গেল কী ভাবে!'

কথা বলতে বলতেই পেন্সিল টর্চ জ্বেলে কাবার্ডের দেয়াল পরীক্ষা করতে লেগে গেছে শহীদ। ও ভাবছিল, সরফরাজ নিজের চেষ্টায় গুপ্তপথের সন্ধান নিশ্চয় পায়নি, কেননা ভয়ানক দুর্বল ছিল ও। নিজের অজান্তেই কোন বোতামে গায়ের ধাক্কা লেগে গিয়েছিল সম্ভবত, তার ফলেই চোরা পথ উন্মোচিত হয়, এবং সরফরাজ সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে ধাক্কা লাগতে পারে তার গায়ের সাথে...

শহীদ একমুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করল। সরফরাজকে যেভাবে কামাল শুইয়ে দিয়েছিল কাবার্ডের ভিতর তাতে করে পিছন দিকের দেয়ালে লাগতে পারে শুধু তার শরীরের ধাক্কা। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে কাবার্ডের পিছন দিককার দেয়ালের ইটগুলোর ধাক্কা দিয়ে দেখতে শুরু করল শহীদ।

কামাল কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'রুমের ভিতর আলো জ্বালিয়েছে ওরা।'

পরমুহূর্তে শোনা গেল ই-আলীর গর্জন, 'ভেঙে ফেল ওই কাবার্ডের দরজা! শয়তান দুটো ওর ভিতরই লুকিয়েছে!'

সৌভাগ্যই বলতে হবে, সেই মুহূর্তেই দেয়ালের একটা ইটের উপর শহীদ চাপ দিতেই দেখা গেল দেয়ালটা মাঝখান থেকে দুফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

দেয়ালটা প্রয়োজন মত ফাঁক হতেই কাবার্ডের ভিতর থেকে পা গলিয়ে বের হয়ে এল ওরা। সরু একটা প্যাসেজে নামল হাঁপাতে হাঁপাতে। দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার। ওরা শুনতে পেল কাবার্ডের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে ই-আলীর হিংস্র সেন্ট্রিরা। পরমুহূর্তে দরজাটা ভেঙে পড়ার শব্দ কানে ঢুকল ওদের। একজন লোকের চিৎকার শোনা গেল, 'গুপ্তচর দুজন এর ভিতর ছিল, মহামান্য ই-আলী! এই যে, এটা দেখুন।'

শহীদ কামালের দিকে তাকিয়ে দেখল ওর মুখে মেডিক্যাল মাস্কটা নেই, কাবার্ডের ভিতর ফেলে এসেছে ও। কামালকে দৌড়ুতে বলে শহীদ প্যাসেজ ধরে ছুটতে শুরু করল। খানিক দূর গিয়েই একটা মোড়। মোড় ঘুরতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। প্যাসেজের মেঝেতে সরফরাজ খান চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে দেখা গেল। বাক্যব্যয় না করে ঝুঁকে পড়ে সরফরাজকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার দৌড়ুতে শুরু করল শহীদ। দৌড়ুতে দৌড়ুতে আবার একবার মোড় নিল ওরা।

এবার মোড় নিয়ে খানিক দূর এসেই কামাল বলল, 'পরের মোড়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে, শহীদ।'

শহীদ তা আগেই লক্ষ্য করেছিল। প্যাসেজটা ধরে ছুটতে ছুটতে পিছন ফিরে তাকাল কামাল। তারপর বলল, 'শত্রুরা এদিকেই আসছে, পায়ের শব্দ পাচ্ছি, শহীদ!'

আবার মোড় নিয়ে খানিক দূর গিয়েই নিরাশায় থমকে দাঁড়াল ওরা। সামনে পথ নেই। পনেরো ফুট উঁচু একটা দেয়াল পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিমূঢ় হয়ে পড়ল শহীদ। সামনে পথ বন্ধ। পিছন দিক থেকে সশস্ত্র হিংস্র শত্রুরা ছুটে আসছে।

কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে প্রাণরক্ষা হবে না। শহীদ সরফরাজকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে সরু প্যাসেজের দুই দেয়ালের গায়ে দুই পা দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা শুরু করল। প্রাণ বাঁচানো যেখানে প্রধান সমস্যা, সেখানে মানুষ অনেক অসম্ভব কাজই সমাধান করতে পারে চেষ্টা করলে। উপরে উঠে গেল শহীদ। তারপর, কামালকে হতভম্ব করে দিয়ে বিপরীত দিকে লাফ দিয়ে নেমে গেল সে। কামাল দেখল শহীদ দেয়ালের উপর নেই।

শহীদের এমন অত্যাশ্চর্য আচরণের কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পেল না কামাল। শহীদ কি নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল? এমন বিপদেও নিজের মনের অবাস্তব প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল কামাল। শহীদ নিজের জীবন নিয়ে পালাবে একথা ভাবাও পাপ। অপেক্ষা করতে লাগল কামাল। কিন্তু মনে মনে অধৈর্য না হয়ে উপায় ছিল না ওর। সশস্ত্র সেন্ট্রিদের পদশব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে।

হঠাৎ দেখা গেল শহীদ দেয়ালের উপর উঠে এসেছে আবার। টেনে হিঁচড়ে একটা স্ট্রেচার তুলল ও দেয়ালের উপর। সেটা কামালের দিকে নামিয়ে ধরে ও বলল, 'সরফরাজকে বেঁধে দে, স্ট্রেচারের বেল্ট দিয়ে।'

কামাল ঝটপট বেল্ট দিয়ে বেঁধে স্ট্রেচারটা খাড়া করে ধরল দেয়ালের সঙ্গে। শহীদ যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে স্ট্রেচারের নাগাল পেতেই টেনে তুলে ফেলল সেটাকে দেয়ালের উপর। চওড়া দেয়ালের উপর স্ট্রেচারটা রেখে কামালকে উঠতে সাহায্য করল ও।

কামাল দেয়ালের উপর উঠে দেখল নিচেই একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের ছাদে নামল ওরা প্রথমে স্ট্রেচার নিয়ে। ছাদ থেকে কাঁকর বিছানো উঠনে। উঠন থেকে স্ট্রেচারটা অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর তুলে নিজেরাও ঢুকে পড়ল একে একে। শহীদ বসল ড্রাইভিং সিটে। চলতে শুরু করল অ্যাম্বুলেন্স।

অপেক্ষাকৃত স্বস্তির সঙ্গে শ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকাল শহীদ। বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে তৈরি দুর্গের গেটটার দিকে ছুটে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স। বন্ধ গেট। গতি কম করে ফেলছে শহীদ। এমন সময় শব্দ হল প্রচণ্ড।

অ্যাম্বুলেন্সের উইণ্ডস্ক্রীন ফেটে গেল, সম্পূর্ণ কাচটা হাজার হাজার ফাটা রেখায় ভরে গেল পলকের মধ্যে। অদৃশ্য কোন সেন্ট্রি গুলি করেছে। শহীদ দেখতে পাচ্ছে না কিছু ফাটা কাচের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু কালক্ষেপ করল না শহীদ। উইণ্ডস্ক্রীনের উপর প্রচণ্ড বেগে ঘুসি বসিয়ে দিল ও একটা। কাচ ভেঙে খানিকটা গর্তের সৃষ্টি হল। গেটের এককোনায় একজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়বার গুলি করার জন্যে রাইফেল তুলছে সে।

শহীদ বাড়িয়ে দিল গাড়ির বেগ। নতুন গতি পেয়ে লাফ দিয়ে হু হু করে ছুটে চলল গাড়ি সোজা বন্ধ গেটের দিকে।

সেন্ট্রিটা বিপদ টের পাবার আগেই ধাক্কা খেল, রাইফেলটা গাড়ির সঙ্গে লেগে তার কপালে আঘাত হানল সজোরে। পরমুহূর্তে বন্ধ কাঠের গেটের উপর ধাক্কা মারল অ্যাম্বুলেন্স।

ভারি বনেটটা কাঠের গেট ভেঙে বেরিয়ে এল। দুর্গের পরিখার উপর ব্রিজের দিকে ছুটে চলল এবার গাড়ি। গাড়ির বনেট এবং বাম্পারে কাঠের ও বাঁশের টুকরো দেখে ব্রিজের একজন সেন্ট্রি চিৎকার করে উঠল, 'ব্রিজ বন্ধ করে দাও!'

শহীদ উইণ্ডস্ক্রীনের গর্ত দিয়ে দেখল একজন সেন্ট্রি লাফিয়ে উঠে কাঁকর বিছানো উঠনের উপর দিয়ে দেয়ালের দিকে ছুটল। দেয়ালের গায়ে ব্রিজের লোহার গেট বন্ধ করার সুইচ।

শহীদ ব্রিজের দিক থেকে অ্যাম্বুলেন্সের মুখ ঘুরিয়ে ছুটন্ত সেন্ট্রিটার দিকে দিল। সেন্ট্রিটা সুইচের কাছে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেটা টিপে দেয়ার জন্যে, কিন্তু গাড়ির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখল তাকে লক্ষ্য করেই গাড়িটা সাক্ষাৎ আজরাইলের মত ছুটে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেয়ালের সঙ্গে পিষে চ্যাপ্টা করে দেবে তাকে। মৃত্যু ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সেন্ট্রি। চোখ বন্ধ করেই খিঁচে দৌড় মারল।

শহীদ বন বন করে ঘুরিয়ে দিল হুইল। দেয়ালের গায়ে ধাক্কা লাগতে লাগতেও লাগল না, আধা চক্কর মেরে ব্রিজের দিকে মুখ করল অ্যাম্বুলেন্স। পিছন থেকে সেন্ট্রিদের মেশিনগান গর্জে উঠল। শহীদ গাড়ি সোজা না চালিয়ে আঁকাবাঁকা করে চালাতে লাগল। ড্র-ব্রীজ অতিক্রম করল অ্যাম্বুলেন্স।

পাহাড়ের দিকে মুখ করে ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্স। কামাল ও সরফরাজ স্ট্রেচারের উপর বসে আছে হাতল ধরে। সরফরাজ উঠে বসেছে খানিক আগে। অনেকটা সুস্থবোধ করছে সে। শহীদ বলল, 'পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বর্ডারের দিকে চালাচ্ছি গাড়ি, কামাল।'

কামাল মাথা নেড়ে সায় দিল। রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। উপর দিকে উঠছে গাড়ি সবেগে। শহীদ ভাবছিল, ই-আলী নিশ্চয় চরম এবং শেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তার এলাকা থেকে যাতে ওরা পালিয়ে না যেতে পারে।

সরফরাজকে সে কোনক্রমেই বর্ডার টপকে পালাতে দিতে চাইবে না, এই ভয়ে যে সরফরাজ হয়ত তার সিক্রেট প্ল্যান এবং জিরো আওয়ার সম্পর্কে বহু তথ্য জানে।

কামাল গাড়ির পিছন দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পিছন পিছন কোন গাড়ি আসছে না, শহীদ।'

শহীদ স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সামনের রাস্তার দিকে। চরম গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। ক্রমশ-উঁচু রাস্তাটা হঠাৎ সমান হয়ে গেছে। সমতল রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্স। তারপরই গাড়ি গিয়ে উঠল বিরাট লম্বা একটা ভায়াডাক্টে—উঁচু এবং বহুদূর বিস্তৃত পুল। বহু নিচ দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। শহীদ বলল, 'পাহাড়ের নিচে রেললাইন, ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছি আমরা। কোন গার্ড দেখা যাচ্ছে না। ইরান থেকে এই রেললাইনই আফগানিস্তান অবধি গেছে বলে মনে হয়...।'

হঠাৎ চুপ করল শহীদ। অকস্মাৎ পাহাড়ের পিছন থেকে একটা হেলিকপ্টারের অগ্রভাগ দেখা গেল আকাশে। কপ্টারটা সোজা উড়ে আসছে ব্রিজের দিকে, অ্যাম্বুলেন্সের দিকে মুখ করে। শহীদ চাপা উত্তেজনায় বলে উঠল, 'আক্রমণ করতে আসছে কপ্টারটা, সাবধান!'

শহীদ শুধু আশঙ্কা প্রকাশ করল, কিন্তু কামাল দেখতে পেল কপ্টার থেকে গান-ফায়ারের ঝলক। ও বলে উঠল, 'ভায়াডাক্ট পেরিয়ে যাবার আগেই আমাদেরকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছে ই-আলী রেডিওর মাধ্যমে।'

'আমারও সে বিশ্বাস,' মন্তব্য করল সরফরাজ কাঁপা গলায়। কপ্টারটা নাক নিচু করে তেড়ে এল অ্যাম্বুলেন্সের দিকে। মেশিনগানের গুলি অনর্গল ছুটে আসছে উপর থেকে। কপ্টারটা মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেল। চক্কর মেরে এগিয়ে আসছে আবার। অকস্মাৎ ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ফেলল শহীদ ব্রিজের মাঝখানে।

'নেমে পড়!'

কামাল ও সরফরাজ অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দরজা দিয়ে নেমে পড়ে দৌড়ুল শহীদের দিকে। শহীদ ইতিমধ্যেই গাড়ি থেকে নেমে ব্রিজের এক দিকের রেলিং টপকাচ্ছে।

রেলিং টপকে ব্রিজের নিচে গা-ঢাকা দিল শহীদ। কামাল এবং সরফরাজ পরমুহূর্তে কাঠের ব্রিজের নিচে শহীদের পাশে এসে দাঁড়াল। শহীদ মন্তব্য করল, 'কপ্টারের পাইলট দেখতে পাবে না এখানে আমাদেরকে।'

ওরা আরও ভিতর দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। কামাল স্বস্তির হাসি হেসে বলে উঠল, 'যতক্ষণ গুলি আছে ততক্ষণ মেশিনগান চালাবে ওরা। তারপর ফিরে না গিয়ে উপায় নেই ব্যাটাদের। ওরা থাকতে আমরা বেরুচ্ছি না এখান থেকে।'

শহীদ শুনল কথাগুলো, কিন্তু মন্তব্য করল না কোন। ওর বিস্মিত দৃষ্টি তখন ব্রিজের অদূরবর্তী শূন্যে একজোড়া বুট জুতো পরা পায়ের দিকে নিবদ্ধ। পা দুটো দড়ির সঙ্গে বাঁধা, ধীরে ধীরে আরও নিচে নামতে দেখা যাচ্ছে, পায়ের পর দৃষ্টি সীমার মধ্যে এল প্যান্ট পরিহিত একজন লোকের উরু, কোমর, বুক, মেশিনগান ধরা দুটো হাত এবং সর্বশেষ একটা মাথা। হেলিকপ্টার থেকে দড়ির সিঁড়িতে বেঁধে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ই-আলীর একজন সশস্ত্র অনুচরকে। শহীদ, কামাল এবং সরফরাজকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

ব্রিজের কাছাকাছি আরও সরে এল কপ্টারটা। ফলে ঝুলন্ত মেশিনগানধারীও সরে এল আরও কাছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে শহীদদেরকে। কপ্টারটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মেশিনগানধারী তার মেশিনগান উঠিয়ে লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করছে। সিঁড়িটা এখনও এদিক-ওদিক দুলছে।

হঠাৎ ঠা ঠা ঠা ঠা করে শব্দ শোনা গেল। মেশিনগান চালাচ্ছে ঝুলন্ত লোকটা। লক্ষ্য ব্যর্থ হল তার। ঝুলন্ত সিঁড়িটা দুলছে বলে লক্ষ্য স্থির রাখা সম্ভব হল না। এতক্ষণ দুলছিল সিঁড়িটা, এবার পাক খেতে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

কামাল চঞ্চল হয়ে উঠল, 'একবার ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এর পরের বার কি হবে?'

ঝুলন্ত সিঁড়িটা একবার পাক খেয়ে আবার যথাযথ স্থানে এসে দুলছে। মেশিনগান তুলে ঝুলন্ত লোকটা আবার লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করছে। কপ্টারটা ইতিমধ্যে সরে এসেছে আরও। ফলে ব্রিজের মুখ থেকে ঝুলন্ত লোকটার দূরত্ব মাত্র দুহাত কি আড়াই হাত।

শহীদ পরিষ্কার বুঝতে পারছে এবার আর লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না লোকটার। লুকোবার কোথাও কোন জায়গা নেই। পালাবারও উপায় নেই। তাছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা করার মতও সময় নেই হাতে। অর্থাৎ সম্মুখে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

ঝুলন্ত মেশিনগানধারীর ঠোঁট দুটো নিষ্ঠুর বিজয়ী হাসিতে ফাঁক হয়ে গেল। ফাঁদে ফেলেছে সে তিনজন পাকিস্তানী স্পাইকে।

ছয়

ঝুলন্ত সিঁড়িটা স্থির হয়ে আসছে। ঝুলন্ত মেশিনগানধারী লক্ষ্য স্থির করছে নির্মম হাসিতে ঠোঁট ফাঁক করে। শহীদ সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চেয়ে আছে বুলেট বিঁধে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ব্রিজের কিনারার কাঠের দিকে। অকস্মাৎ বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠল শহীদ। এমনই অসম্ভব বেগে লাফ দিল শহীদ যে কামাল ওর অঙ্গভঙ্গি অনুসরণ করতে পারল না চোখ দিয়ে। চোখের পলকে বুলেট বিঁধে ঝাঁঝরা হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া লম্বা একটা কাঠের টুকরো টেনে তুলে

নিয়েই ঘুরিয়ে মেরে দিল কয়েকহাত দূরে শূন্যে ঝুলন্ত মেশিনগানধারীর চোয়ালে।

প্রচণ্ড ঘা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল মেশিনগানধারী। হাত হতে খসে পড়ল তার মেশিনগান। শহীদ আবার একবার বিদ্যুৎগতিতে নড়ে উঠল। একহাতে ধরে ফেলল ও মেশিনগানটা, অপর হাতে ধরল দোলায়মান সিঁড়ির দড়ি। মেশিনগানটা পিছন দিকে কামালের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে সিঁড়ির দড়ি ছেড়ে দিল শহীদ।

হেলিকপ্টারের পাইলট বুঝতে পারল বিপদটা। সরে গেল সে কপ্টার নিয়ে। ঝুলন্ত লোকটাও ক্রমশ দূরে সরে গেল। ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল কপ্টারের যান্ত্রিক ধ্বনি। শহীদ দ্রুত চিন্তা করছিল। সরফরাজকে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতেই হবে। সে ই-আলীর সিক্রেট প্ল্যানের অনেক তথ্য জানে। তাছাড় শহীদের কাছে রয়েছে ক্যামেরা রেকর্ড—ওয়ার্ল্ড ম্যাপ এবং রহস্যময় লাল ফ্ল্যাগের।

কামাল গর্বিতভাবে হাসল শহীদের দিকে ফিরে। কপ্টারটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওরা ব্রিজের নিচ থেকে বেরিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের কাছে এল। কামাল নিরাশ কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'অ্যাম্বুলেন্সের বারোটা বেজে গেছে বুলেট লেগে—চারটে চাকাই নষ্ট!

কামালের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল শহীদ, 'আবার ব্রিজের নিচে চলে আয়, কামাল! ট্রাক ভর্তি সেন্ট্রি আসছে!'

শহীদের আগেই কামাল এবং সরফরাজ আবার আত্মগোপন করল রেলিং টপকে ব্রিজের নিচে। শহীদ ছুটল অ্যাম্বুলেন্সের কাছ থেকে। ও দেখল পাহাড়ের বাঁক ঘুরে দ্রুতবেগে একটা ভারী ট্রাক সগর্জনে ছুটে আসছে ব্রিজের দিকে ট্রাকের উপর দাঁড়ানো সেন্ট্রিদের হাতের মেশিনগানগুলো দেখা যাচ্ছে। রেলিং টপকাতে শুরু করল শহীদ। এমন সময় গর্জে উঠল একসঙ্গে কয়েকটা মেশিনগান। শহীদ রেলিং ধরে ঝুলে পড়ে নেমে পড়ল ব্রিজের নিচে। মেশিনগানটা ওর হাতেই রয়েছে। মাথাটা তুলে ট্রাকের দিকে উঁচিয়ে ধরল মেশিনগানটা। শুরু করল ফায়ারিং, দাঁতের উপর দাঁত চেপে।

প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতে লাগল মেশিনগানের গর্জন। আধ মিনিটে আড়াইশো গুলি বেরিয়ে গেল। খালি হয়ে গেল মেশিনগান। আর কোন কাজে লাগবে না বুঝতে পেরে সেটাকে নিচের দিকে ফেলে দিল শহীদ। কামাল দেখল মেশিনগানটা সবেগে পড়ে যাচ্ছে নিচের রেল পথের দিকে। পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল 'শহীদ, নিচের রেললাইন দিয়ে একটা রেলগাড়ি আসছে!'

শহীদ ট্রেনটাকে আগেই দেখেছিল। একমহূর্ত কি যেন ভাবল ও। তারপর দ্রুত এবং উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'ব্রিজের সাপোর্ট বেয়ে নামব আমরা জলদি! ট্রেনটা হয়ত সীমান্তের দিকে যাচ্ছে!'

খাঁজ কাটা কাঠের পিলার বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করে দিল ও

কামাল ও সরফরাজ নামতে শুরু করেছে আগেই।

দেখতে দেখতে বহু নিচে নেমে এল ওরা। ট্রেনটা একটা মালগাড়ি। এখনও এসে পৌছয়নি। রেললাইনের পাশেই কাঠের সাপোর্টটা। ওরা তিনজন সেটার উপর অপেক্ষা করছে। লাইনটা হাত তিনেক দূরে। এসে পড়ল ট্রেন। ড্রাইভার লক্ষ্য করেনি ওদেরকে।

শহীদ নিচের দিকে, ট্রেনটার ছাদের উপর তাকাল। ট্রেনের ছাদ ওদের কাছ থেকে দুহাত দূরে, এবং হাত খানেক নিচে। শহীদ বলল, 'কামাল, তোরা নেমে পড় আগে ট্রেনের ছাদে। যেদিকে ছুটছে ট্রেনটা সেদিকে মুখ করে নামবি, নেমে দৌড়ে যাবি খানিকটা। তারপর বসে পড়বি বগির কিনারার কার্নিস ধরে। তোরা নামলেই ওই একই বগির ছাদে আমি নামব।'

নেমে পড়ল কামাল ও সরফরাজ শহীদের পরামর্শ অনুযায়ী, প্রায় একই সময়ে নামল শহীদও।

ট্রেনের ছাদ থেকে একটা বগির দরজার হাতলে পা দিয়ে শহীদ পা দানিতে নামল। তালা মারা রয়েছে দরজায়। পকেট থেকে টুকরো সেলুলয়েড বের করে তালা খুলতে সময় লাগল ওর মিনিট দুয়েক। বগির ভিতর ঢুকল ও। ভিতরে তুলোর বস্তা রয়েছে থাক থাক। কামাল ও সরফরাজকে নেমে আসতে বলল শহীদ। ওরা নেমে এসে ভিড়িয়ে দিল দরজা। ট্রেনটা আফগানিস্তানের সীমান্তের দিকে যাচ্ছে বলে ধারণা শহীদের। আফগানিস্তানে পৌছুতে পারলেও কাজ হবে। পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে ওখান থেকে। একবার যোগাযোগ করতে পারলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ধ্বংস করে দেবে শয়তান ই-আলীর ভয়ঙ্কর প্ল্যান-প্রোগ্রাম। হঠাৎ বাধা পড়ল শহীদের চিন্তায়। ট্রেনের গতি কমে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তাকাল শহীদ। নিরাশাব্যঞ্জক একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

শহীদ দেখল সামনেই একটা প্ল্যাটফর্ম। বহু লোকের ভিড় রয়েছে প্ল্যাটফর্মে। স্টেশনে থেমে পড়বে গাড়ি। স্টেশন চিনতে এতটুকু অসুবিধে হল না শহীদের। তথাকথিত 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডের' 'লাব্বা' স্টেশন এটা। ট্রেনটা সীমান্তের দিকে না গিয়ে ফিরে এসেছে সেই শহরে, যেখানে প্যারাশুট করে রাতে নেমেছিল শহীদ ও কামাল। অর্থাৎ এই রেলগাড়ি শয়তান ই-আলীরই যাতায়াত ব্যবস্থার একটি। প্ল্যাটফর্মে সশস্ত্র সেন্ট্রিদেরকে দেখে শহীদ বুঝতে পারল তাদের খোঁজেই ওরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। থেমে গেল ট্রেন।

তুলোর বস্তার সাজানো থাকের আড়ালে আত্মগোপন করল ওরা। পরমুহূর্তে শহীদ ভাবল ই-আলীর সেন্ট্রিরা নিশ্চয় ট্রেনের প্রতিটি কামরায় তন্ন তন্ন করে খুঁজবে তাদেরকে। দ্রুত চিন্তা করছিল শহীদ। এমন সময় কামরার বাইরে চাঞ্চল্য জেগে উঠল। শহীদদের কামরার দরজার তালা খোলা। দুজন লোক উত্তেজিত

গলায় কারণ নিরূপণ করার চেষ্টা করছে। দরজাটা খুলে গেল। কামরার ভিতর উঠে পড়ল দুজন লোক। দুএক মুহূর্তের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে এবার ওরা।

শহীদ হাতঘড়ির ক্ষুদ্র কন্ট্রোল চাবিটা ঘুরিয়ে ট্র্যান্সমিটারটা চালু করে দিল। পরক্ষণেই শুরু হল--টিক-টাক, টিক-টাক, টিক-টাক শব্দ। বেশ জোরেশোরেই হতে লাগল শব্দগুলো। কামরার ভিতর দণ্ডায়মান লোক দুজন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'পালাও! টাইম বোমা আছে তুলোর বস্তার আড়ালে!'

লাফিয়ে কামরা থেকে নেমে গেল দুজনই! শহীদ সময় নষ্ট না করে দ্রুত বেগে উঠে দাঁড়িয়েই বলে উঠল, 'আমার সঙ্গে আয়, কামাল?'

কামরার অপর দিকের দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল শহীদ। কামাল ও সরফরাজও নামল। তারপরই শোনা গেল গুলির শব্দ। প্ল্যাটফর্ম থেকে একজন সেন্ট্রি ওদেরকে ট্রেনের বিপরীত দিকে নেমে পড়তে দেখে গুলি চালিয়েছে।

ট্রেন থেকে নেমেই পরপর কয়েকটা রেললাইন টপকাতে টপকাতে ছুটে চলল ওরা। ওদের সামনেই একটা ট্রেন, সবেমাত্র চলতে শুরু করেছে সেটা। ট্রেনটার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে নিল শহীদ। কোন কামরার দরজাই খোলা নেই। কামালের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল, 'ট্রেনের পিছনে লোহার আঙটার উপর উঠে পড়তে হবে, কামাল!'

ট্রেনের বন্ধ দরজার সামনের পা-দানিতে উঠবার কোন উপায় ছিল না। কেননা ট্রেন ওদেরকে ছাড়িয়ে চলে গেছে তখন। পিছন পিছন রেললাইন ধরে দৌড়ে কামাল উঠে পড়ল পিছনের লোহার আঙটার উপর। সরফরাজও উঠল তারপর। শহীদ উঠল সকলের শেষে। ট্রেনটা তখন বেশ জোরে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

খানিকদূর যাবার পরই দেখা গেল রেললাইনের পাঁচ-সাত হাত দূর দিয়ে একই দিকে একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে। কামাল রাস্তার পিছন দিকে তাকিয়ে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'শহীদ, পিছন দিকে দেখ!'

পিছন দিকে তাকিয়ে শহীদ দেখল পাকা রাস্তা দিয়ে ভীষণ বেগে ছুটে আসছে একটা মটর গাড়ি। ড্রাইভারের পাশের সিটের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ছাদটা ওঠানো। লোকটার হাতে পিস্তল। ওদের দিকেই কুৎসিত হাসিতে মুখ বিকৃত করে তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে কাছে চলে এল গাড়িটা। লোকটা পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করল ওদের তিনজনের দিকে।

শহীদ ইতিমধ্যেই পকেট থেকে একটা কাচের বল বের করে মুঠো করে ধরেছিল। মটর গাড়ি থেকে গুলি ছোটার আগের মুহূর্তে বলটা হাত ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল ও গাড়ির বনেটের উপর। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল সেটা। পলকের মধ্যে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। কালো ধোঁয়ায় ভরে গেল চারদিক। মটর গাড়ির ড্রাইভার

কিছুই দেখতে পেল না চোখের সামনে। হুইল ঘুরিয়ে ধোঁয়া মুক্ত হতে চাইল সে। ফলে গাড়িটা রাস্তার বিপরীত দিকের ঢালু কিনারায় গিয়ে পৌঁছুল। তারপর অকস্মাৎ ক্রমশ নিম্নমুখী পাথুরে জমির উপর থেকে নামতে শুরু করল, কিছুদূর স্বাভাবিকভাবে নেমে গিয়ে হঠাৎ উল্টে গেল সেটা, উল্টাতে উল্টাতে নেমে চলল আরও নিচের দিকে।

গাড়িটা ধ্বংসের পথে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শহীদ। কিন্তু স্বস্তিটুকু নিমেষে উবে গেল সরফরাজের হাঁপানো, যন্ত্রণাক্ত গলা শুনে, 'আমি আর পারছি না রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে!'

ট্রেনটাকে যেভাবেই হোক দাঁড় করাতে হবে। এক মুহূর্ত চিন্তা করল শহীদ। তারপর দ্রুত রড ধরে ট্রেনের ছাদের উপর উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল ও, কামাল ও সরফরাজের চোখের সামনে থেকে। ছাদের উপর থেকে বগিটার জানালার সামনে ঝুলে পড়ল শহীদ। জানালার কাচ ভাঙল ও পরপর দুটো ঘুসি মেরে। দ্রুত ঢুকে পড়ল ও ভাঙা জানালা দিয়ে খালি কামরার ভিতরে। কামরার দেয়ালে ওয়ার্নিং চেন ধরে সজোরে টান মারল ও। সময় নষ্ট না করে আবার জানালা গলে ট্রেনের ছাদের উপর উঠে পড়ল। ট্রেনের গতি কমতে শুরু করেছে, টের পেল শহীদ। রড ধরে ঝুলে আবার কামালদের কাছে নেমে এল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ট্রেনটা থেমে গেলেই নেমে পড়ব আমরা। দৌড়ে দূরে সরে যেতে হবে আমাদেরকে। আমার পিছন পিছন দৌড়ুবি তোরা, কামাল।'

কথাগুলো বলে বাঁ দিকে তাকাল শহীদ। বেশ খানিকটা দূরে বনভূমি দেখা যাচ্ছে। ট্রেনটা থেমে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল তিনজন। শহীদকে অনুসরণ করে ছুটল ওরা প্রাণপণে।

ট্রেনের গার্ড ট্রেন থেকে নেমে চেন কোন্ কামরা থেকে টানা হয়েছে তা আবিষ্কার করার আগেই বনভূমিতে প্রবেশ করল ওরা তিনজন হাঁপাতে হাঁপাতে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সরফরাজ। বেচারার মাথায় চোট লেগেছিল বলে বেশি ধকল সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে শহীদের উদ্দেশে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার! সময় মত ট্রেন যদি না থামাতেন নির্ঘাৎ নিচে পড়ে যেতাম আমি।'

'এখন ভাল বোধ করছেন তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

শহীদ বলল, 'আলাপ করা যাক, মি. সরফরাজ। আপনার কেবিনে যখন শত্রুপক্ষের মর্টারবম্ব এসে আঘাত করে তখন আপনি বলতে যাচ্ছিলেন ই-আলীর সিক্রেট স্কীম-সম্পর্কে। বলুন দেখি, রহস্যটা কি সিক্রেট স্কীমের?'

লম্বা শ্বাস নিয়ে সরফরাজ খান বলল, 'শয়তান ই-আলী তার এজেন্টদেরকে ডেকে হাজির করেছে প্রত্যেককে একটা করে প্যাকেট দেবার জন্যে। ইতিমধ্যেই

হয়ত ওই এজেন্টরা পৌঁছে গেছে তারা। প্রত্যেক এজেন্টকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যে যে দেশে কাজ করছে সেই সেই দেশের শহরের রেডিও স্টেশনে একটা করে প্যাকেট রেখে আসার।

'প্যাকেটগুলোয় কি আছে?'

সরফরাজ শহীদকে রীতিমত চমকে দিয়ে বলল, 'মাইক্রো হাইড্রোজেন বোমা আছে প্রতিটি প্যাকেটে। বোমাগুলো শুধুমাত্র শয়তান ই-আলীই বিস্ফোরিত করার ক্ষমতা রাখে। জিরো প্লাস টু আওয়ারে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে আক্রমণ চালাবে সে এই মাইক্রো হাইড্রোজেন বোমা দিয়েই। জিরো প্লাস টু আওয়ারেই সুইচ টিপবে সে আর একটা। দুর্গের কন্ট্রোলরুমে সুইচবোর্ড তার। কন্ট্রোলরুম থেকে সুইচ টিপে বিভিন্ন দেশের রেডিও স্টেশন উড়িয়ে দেবে সে। সুইচ টিপেই সে আক্রমণ করবে পাকিস্তানকে। সুইচগুলো ট্র্যান্সমিট করে একটা সিক্রেট হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও কন্ট্রোল বীম। শুধুমাত্র সিক্রেট রেডিও বীমের দ্বারাই হাইড্রোজেন বোমাগুলো ফাটানো সম্ভব। জিরো আওয়ারে পাকিস্তান সীমান্তে এবং বিভিন্ন দেশের রেডিও স্টেশনে বোমাগুলো স্থাপন করবে ই-আলীর এজেন্টরা। জিরো প্লাস টু আওয়ারে দুটো সুইচই টিপবে ই-আলী। দুঘন্টা সময় পাবে এজেন্টরা নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসার জন্যে।'

শহীদের মুখাবয়ব কঠিন হয়ে উঠল, 'কিন্তু এসব ধ্বংসাত্মক কাণ্ড কেন করতে যাচ্ছে ই-আলী? তার এই ভয়ঙ্কর প্ল্যানের পিছনে উদ্দেশ্যটা কি?'

'মাইক্রো-হাইড্রোজেন বোমাগুলো ফাটাবে সে দুনিয়ার ধনী দেশগুলোর শহরে। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে ই-আলী সাবধান করে দেবে ওই সব দেশগুলোকে, তার হুকুম অমান্য করার সাহস যাতে না হয়। হুকুমটা হচ্ছে—মোটা টাকার প্রচুর সোনা দিতে হবে তাকে। পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল করার পর সোনার দরকার হবে তার।'

কামাল বলে উঠল, 'কিন্তু সে-সব দেশ অকারণে ই-আলীর দাবি মেনে না নিয়ে শয়তানটাকে ধ্বংস করার জন্যে বোমারু বিমান পাঠিয়ে আক্রমণ করতে পারে…।'

সরফরাজ মাথা নেড়ে কামালকে বাধা দিয়ে বলল, 'না। এখানেই চমৎকার ফন্দি খাটিয়েছে ই-আলী। কোন দেশই ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না কারা বোমা ফাটাচ্ছে বা কারা বেনামী চিঠি পাঠিয়ে সোনা দাবি করছে।'

শহীদ প্রশ্ন করল; 'তাহলে সোনা কিভাবে সংগ্রহ করবে ই-আলী?'

'ই-আলী প্রত্যেক রাষ্ট্রকে হুকুম করবে নিদিষ্ট পরিমাণ সোনা পানির জাহাজ করে আরব সাগরের নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষারত একটা সাবমেরিনে পৌঁছে দেবার। যদি তার হুকুম অগ্রাহ্য করা হয় বা সাবমেরিনটাকে অনুসরণ বা ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আরও ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে ধ্বংস করে

দেয়া হবে অগ্রাহ্যকারী দেশগুলোকে।'

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'এত সোনা নিয়ে কি করবে ই-আলী?'

'পাকিস্তানের ভূ-খণ্ড দখল করে সে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করবে। সেই রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্যে এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সে চায় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান আর্মি এবং এয়ারফোর্স বাহিনী তৈরি করতে। অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন, ফাইটার প্লেন ইত্যাদি সামরিক সরঞ্জাম কেনার জন্যে শত শত মণ সোনার দরকার তার।'

শহীদের হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। ধিকি ধিকি জ্বলছে ওর চোখের দৃষ্টি। কঠোর কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করল ও, 'শয়তান ই-আলী অবশ্যই ধ্বংস হবে। ই-আলী ধ্বংস হলে তার এজেন্টরাও সেই সঙ্গে অসহায় হয়ে পড়বে। নষ্ট করবার মত সময় নেই আমাদের হাতে। ই-আলীকে চরম শাস্তি দিতে হবে এখুনি।'

শহীদের কথার সঠিক মর্ম উদ্ধার করতে পারল না কামাল এবং সরফরাজ। প্রশ্ন করে অর্থটা জানার ইচ্ছা হচ্ছিল কামালের। কিন্তু তার আগেই শহীদ গভীরভাবে কি যেন শুনতে শুনতে বলে উঠল দ্রুত কণ্ঠে, 'শুনতে পাচ্ছিস, কামাল? হেলিকপ্টার!'

কান পাততেই কামাল এবং সরফরাজ শুনতে পেল হেলিকপ্টারের শব্দটা। সরফরাজ বলল, 'এটা নিশ্চয়ই সেই প্রথম হেলিকপ্টারটা, যেটা আক্রমণ করেছিল ব্রিজের নিচে, আমাদেরকে।'

শহীদ বলল, 'আমি একটা প্ল্যানের কথা ভাবছি, কপ্টারটাকে ই-আলী আমার ক্যামেরাটা সংগ্রহ করার জন্যে চরম আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছে। সেই সুযোগটাই গ্রহণ করব ভাবছি।'

এবারও শহীদের কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারল না ওরা।

ক্রমশ উচ্চকিত হয়ে উঠল কপ্টারের গর্জন। তারপর, হঠাৎ শহীদ বলল, 'কপ্টারটা ঠিক আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছে!'

কিন্তু কপ্টারটাকে দেখতে পাচ্ছিল না ওরা কেউ। মাথার উপর গাছের আড়াল। শহীদ হঠাৎ নড়ে উঠে বলল, 'শোন, কামাল। আমি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে দৌড়ে ওই দিকের জঙ্গলের দিকে ছুটতে শুরু করব। ফাঁকা জায়গাটায় আমাকে দেখতে পেলেই গুলি করবে ওরা। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব ঘাসের ওপর। কপ্টারটা তখন নিচে নামবে ক্যামেরাটা আমার কাছ থেকে উদ্ধার করার জন্যে। ওরা মনে করবে আমি গুলি খেয়ে নিহত হয়েছি। ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে, সত্যি সত্যি গুলি খেতেও পারি আমি। হেলিকপ্টার থেকে একজন আমার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ক্যামেরাটা নেবার জন্যে। ঠিক তখনই তুই এই আগুনে-পটকাটা ফাটাবি।'

শহীদ কামালকে একটা ছোট্ট সিলিণ্ডার দিল পকেট থেকে বের করে। তারপর

আর কোন কথা না বলে গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে ছুটতে লাগল ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে। মাত্র পনেরো বিশ হাত দূরে যেতেই গর্জে উঠল মেশিনগান কপ্টার থেকে, শহীদের উদ্দেশে।

হাত-পা মেলে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল শহীদ ফাঁকা জায়গাটায়। কামাল ও সরফরাজ শক্ত হয়ে উঠল। শহীদ কি সত্যি সত্যি অভিনয় করল পড়ে গিয়ে? নাকি লেগেছে গুলি? শহীদের নিঃসাড় দেহের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরত্ব রেখে কপ্টারটা নেমে পড়ল ফাঁকা জায়গাটার উপর। একজন ইউনিফর্ম পরিহিত লোক নামল কপ্টার থেকে। তার হাতে রিভলভার। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে শহীদের নিঃসাড় দেহটার কাছে।

কামাল চিৎকার করে উঠতে চাইছিল। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ও। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল শহীদের নির্দেশের কথা। উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল ও কথাটা। বিদ্যুৎবেগে আগুনে-পটকাটা জঙ্গলের অন্য এক প্রান্তে ছুঁড়ে দিল ও। বোমা ফাটার মত একটা বিকট শব্দ উঠল। রিভলভারধারী লোকটা তখন শহীদের উপর ঝুঁকে পড়ছে।

বোমার মত শব্দটা হতেই শহীদ তড়াক করে পাশ ফিরেই একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল রিভলভারধারীর নাকের উপর। সঙ্গে সঙ্গে চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা। পড়েই অজ্ঞান। শহীদ ছিটকে পড়া রিভলভারটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই তিন লাফে পৌঁছুল কপ্টারের কাছে। কপ্টারের পাইলট ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়েছিল জঙ্গলের দিকে। বোমার শব্দটা কোথা থেকে কি কারণে হল বোঝার চেষ্টা করছিল সে। শহীদ তার রিভলভার তুলে গর্জে উঠল, 'আউট!'

ড্যাবাচ্যাকা খেয়ে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল পাইলট, তারপর শহীদের কঠিন মূর্তি দেখে বিনাবাক্য ব্যয়ে নেমে পড়ল কপ্টার থেকে। কামাল ও সরফরাজ শহীদের পাশে এসে দাঁড়াল। শহীদ পাইলটকে বেঁধে ফেলেই সরফরাজকে বলল, 'আপনি অভিজ্ঞ পাইলট; কন্ট্রোলের ভার নিন।'

'ইয়েস, স্যার,' বলেই চালকের আসনে উঠে বসল সরফরাজ। শহীদ ও কামালও উঠে বসল কপ্টারে। হাত-পা বাঁধা পাইলটকে ফেলে রেখে কপ্টার আকাশে উঠল। শহীদের নির্দেশে সরফরাজ শহরের বহু উঁচু দিয়ে পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করিয়ে নিয়ে চলল সরফরাজ কপ্টারকে। শহীদ হঠাৎ আঙুল বাড়িয়ে একটা জায়গা দেখাল। সরফরাজ মাথা নেড়ে সায় দিল। অদূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে একটা দুর্গ। প্রচণ্ড শক্তিশালী শয়তান ই-আলীর হেডকোয়ার্টার।

দুর্গের ব্যাটেলমেন্টের ছাদের উপর শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল হেলিকপ্টার। শহীদ দড়ির সিঁড়িটা কপিকল ঘুরিয়ে নামিয়ে দিল ছাদের উপর। কামালের উদ্দেশে দ্রুত কণ্ঠে ও বলল, 'ই-আলীর সন্দেহ হবার কথা নয়। সে হয়ত ভাববে তার লোকেরাই

এখনও খুঁজছে আমাদেরকে। যাক, নেমে যাচ্ছি আমি নিচে। কপ্টার নিয়ে চক্কর মারতে থাকুন, সরফরাজ। কামাল কপিকল নিয়ে তৈরি থাকবি, আমাকে তুলে নেবার জন্যে।'

কথাগুলো বলেই সিঁড়ি বেয়ে ব্যাটলমেন্টের ছাদে নেমে এল শহীদ। এই ছাদেই শহীদ ও কামাল ই-আলীর সেন্ট্রিদেরকে বোকা বানিয়েছিল।

শহীদ পাথরের ধাপবিশিষ্ট দেয়াল ঘেরা সিঁড়ি বেয়ে করিডরে গিয়ে পৌঁছুল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল ই-আলীর বিরাট বড় আকারের কন্ট্রোলরুমের আধখোলা দরজার দিকে। দরজার পাশে এসে ভিতরে উঁকি দিল শহীদ।

ই-আলী তার প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে প্রকাণ্ড ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে। তার ভাটার মত লাল বড় বড় চোখ জোড়া দেয়াল ঘড়ির দিকে নিবদ্ধ। তার একটা হাত সুইচ-বোর্ডের একটি সুইচের উপর আলতোভাবে রাখা। ডেস্কের উপরই ছোট একটা চারকোনা প্যাকেট। ই-আলীর পিছনে একদল ইউনিফর্ম পরা উচ্চপদস্থ অফিসার। তারা ই-আলীর সামরিক বাহিনীর লোক। শহীদ শুনতে পেল ই-আলীর কর্কশ, বাজখাঁই কণ্ঠ, 'জিরো প্লাস টু আওয়ার হতে আর বাকি মাত্র দশ মিনিট। আর দশ মিনিট পর, হে আমার প্রিয় অফিসারগণ, আমি আপনাদের গর্ব করার মত একটা অতুলনীয় কীর্তির সূচনা করব।'

শহীদ দেখল অফিসাররা ঘনঘন অস্বস্তি ভরা এবং শঙ্কিত চোখে তাকাচ্ছে ডেস্কের উপর রাখা ছোট প্যাকেটটার দিকে। একজন অফিসার দ্বিধাভরে বলে উঠল, 'স্যার, এই হাইড্রোজেন বোমাটা সেট করা হয়েছে কিনা তা আপনি ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়েছেন তো?'

হাঃ হাঃ করে সশব্দে হেসে উঠে ই-আলী বলল, 'আমাদের এজেন্টরা প্রায় দুঘন্টা আগে বিভিন্ন দেশের অসংখ্য রেডিও স্টেশনে এবং পাকিস্তান সীমান্তে যে সব মাইক্রো-হাইড্রোজেন বোমা স্থাপন করেছে সেগুলো রেডিও বীমের সাহায্যে বিস্ফোরিত করার জন্যে যে ট্রিগার টেপা হবে তাতে এই প্যাকেটের বোমা বিস্ফোরিত হবে না। আমার পরীক্ষা করাই আছে। এটা বিস্ফোরিত করার জন্যে দরকার শুধুমাত্র একটা শর্ট ওয়েভ বীম।

কথাগুলো বলে গর্বিত ই-আলী ডেস্কের উপর থেকে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। অফিসাররা ভীত এবং আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

শহীদ হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

আট মিনিট বাকি আছে জিরো প্লাস টু হতে। শহীদ দেখল ই-আলী এবং তার অফিসারদের পিছনের দেয়ালে একটা রেডিও কন্ট্রোল প্যানেল। শহীদ দূরত্বটুকু অনুমান করে নিয়ে দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারপর ওর মাইক্রো-ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অন করে ফিস ফিস করে বলে উঠল ক্ষুদ্র যন্ত্রটার কাছে ঠোঁট

নেড়ে, কামাল, ই-আলীর কন্ট্রোলরুমের কাছে কপ্টার নিয়ে এসে শূন্যে দাঁড় করিয়ে রাখতে বল সরফরাজকে। আমি চাই ই-আলী কপ্টারের ঝুলন্ত সিঁড়িটা দেখতে পাক।

সটান হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইল শহীদ। তারপরই ও শুনতে পেল কপ্টারের উচ্চকিত গর্জন। খোলা বড় জানালাটার দিকে ই-আলী বিরক্ত হয়ে তাকাল সেই শব্দ শুনে। তার সঙ্গী অফিসাররাও তাকাল সেদিকে।

শহীদ আধখোলা দরজাটা সন্তর্পণে সম্পূর্ণ খুলে নিঃশব্দ পায়ে রুমের ভিতর ঢুকে পড়ল। আস্তে আস্তে, শুধু পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে সে গা-ঢাকা দিল রেডিও কন্ট্রোল প্যানেলের পিছনে।

জানালা পথ দিয়ে অদূরেই কপ্টার হতে ঝুলন্ত সিঁড়িটা দেখে মহাখাপ্পা হয়ে বলে উঠল ই-আলী, 'বুদ্ধু পাইলটটা কপ্টার নিয়ে এখানে কি করছে?'

ই-আলী এবং তার সঙ্গীরা সকলেই তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। ঘড়িতে এখন সাত মিনিট বাকি জিরো প্লাস টু আওয়ারের।

শহীদ দ্রুত এবং ঠাণ্ডা মাথায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটায় হাত দিল। কয়েকটা পারস্পরিক সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন করে, লীড বদলে দ্রুত সেগুলো অন্য সব তারের সঙ্গে যুক্ত করে দিল শহীদ কন্ট্রোল প্যানেলের। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল ছয় মিনিট বাকি জিরো আওয়ার হতে।

হঠাৎ ই-আলী জানালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। একটা সুইচ টিপল সে। সশব্দে এবং বিদ্যুৎবেগে বন্ধ হয়ে গেল রুমের দরজা।

ধক্ করে উঠল শহীদের বুক। আটকা পড়ে গেল ও রুমের ভিতর দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে। একমাত্র ই-আলীই খুলতে পারে দরজাটা। এবং ই-আলী ও তার সঙ্গীরা সবাই সশস্ত্র। দরজাটা খুলতে চেষ্টা করার প্রশ্নই ওঠে না, গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে শরীর তাহলে।

শহীদের দৃষ্টি গিয়ে আছড়ে পড়ল জানালার দিকে। জানালাটা বন্ধ। কিন্তু জানালার বাইরে ঝুলছে কপ্টারের সিঁড়িটা। সরফরাজ কপ্টারটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এখনও উপরে।

শহীদ প্রস্তুত হয়ে নিল। অকস্মাৎ বিদ্যুৎগতিতে ছুটল ও রুমের মেঝের উপর দিয়ে, ই-আলীর সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মাঝখান দিয়ে কয়েকটা বিদ্যুৎগতি পদক্ষেপের পর ও দুহাতে মুখ ঢেকে ডাইভ দিল বন্ধ জানালার দিকে।

ক্র্যা—বশ!

কাচ ভেঙে শহীদের উড়ন্ত শরীরটা বেরিয়ে গেল বাইরে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে শহীদের। হাত দুটো সামনের দিকে মেলে দিয়েছে ও। বাড়ানো হাত দুটো খপ্ করে কষে ধরল ঝুলন্ত সিঁড়ির দড়ি।

শহীদকে জানালার কাচ ভেঙে বেরিয়ে আসতে দেখে শ্বাস আটকে গেল

কামালের। শহীদ ঝুলন্ত সিঁড়িটা ধরে ফেলেছে দেখে স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কপিকল ঘোরাতে লেগে গেল ও। শহীদ উপর দিকে উঠে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল, 'সরফরাজ, কপ্টার ঘোরান। যত তাড়াতাড়ি পারেন দুর্গের এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে চলুন!'

কথাটা বলেই শহীদ হাতঘড়ি দেখল সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। জিরো প্লাস টু আওয়ার হতে তিন মিনিট বাকি।

বিপুল বেগে আরও উপর দিকে উঠে যেতে যেতে দুর্গের এলাকা অতিক্রম করে যেতে লাগল কপ্টার দূরবর্তী সীমান্ত প্রদেশের দিকে মুখ করে।

জিরো প্লাস টু!

অকস্মাৎ দুর্গের দিক থেকে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। দুর্গ-এলাকা অতিক্রম করে এসেছে কপ্টার। দুর্গ এখন বহু পিছনে। ওরা তিনজন কেঁপে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। ধোঁয়ায় আর আগুনের শিখায় ঢাকা পড়ে গেছে গোটা দুর্গ। দুর্গের মাথার উপর নাচছে নাগিনীর মত ফণা তুলে আগুনের শিখা। শহীদ একটা স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করল। চিৎকার করে বলে উঠল ও, 'অহঙ্কারী ই-আলী খতম হয়ে গেল।'

কামাল ও সরফরাজ ফিরে তাকাল শহীদের দিকে। শহীদ ওদের মনের প্রশ্ন বুঝতে পেরে ব্যাখ্যা করে সংক্ষেপে বলল, 'শয়তান ই-আলীর ডেস্কে একটা মাইক্রো-হাইড্রোজেন বোমা ছিল। আমি শয়তানটার রেডিও প্যানেলের তারের কানেকশন বদলে দিয়ে এসেছিলাম। তাই পাকিস্তান সীমান্তে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওই বোমা ফাটাবার জন্যে সুইচ টিপলে যে রেডিও বীম কাজ করবার কথা সেটা কাজ করেনি। তার বদলে বিস্ফোরিত হয়েছে ওর ডেস্কে রাখা বোমাটা।'

কামাল চিৎকার করে উঠল জয়োল্লাসে, 'তাহলে শয়তান নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে অক্কা পেয়েছে!'

'ঠিক তাই ঘটেছে,' শহীদ বলল। আবার বলল ও, 'সীমান্ত অতিক্রম করে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে ক্যামেরাটা। ছবি ধুয়ে তারা বিভিন্ন দেশ থেকে ই-আলীর এজেন্টদেরকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করবে।'

শেষবার পিছনের ধোঁয়াচ্ছন্ন দুর্গের দিকে তাকাল ওরা। কপ্টার উড়ে চলেছে সীমান্তের দিকে, সগর্জনে।

ভলিউম ১০

কুয়াশা

২৮, ২৯, ৩০

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এবই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০